ব্লাড এণ্ড টীয়ার্স

কুতুবউদ্দিন আজিজ

ব্লাড এন্ড টীয়ার্স

মূল : কুতুবউদ্দিন আজিজ
অনুবাদ : সুশান্ত সাহা

www.pathagar.com

প্রথম বাংলা সংস্করণ : ফেব্রুয়ারি ২০১২

মূল্য : ৩০০.০০ টাকা

Blood and Tears
By Kutubuddin Aziz

www.pathagar.com

গ্রন্থকার সম্পর্কে কিছু কথা

মোহাম্মদ কুতুবউদ্দিন আজিজ বিএ. (অনার্স), এমএ. (মাদ্রাজ) লন্ডনের স্কুল অব ইকনমিকসে ইন্টারন্যাশনাল রিলেশন্সে পড়াশোনা করেছেন। লন্ডনের ফ্লীট স্ট্রীট থেকে সাংবাদিকতায় প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন ইউনাইটেড প্রেস অব পাকিস্তান বা ইউপিপি'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক। ১৯৪৯ সালে তিনি এবং তাঁর পিতা এ বার্তা সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ১৯৫৪ সাল থেকে তিনি আন্তর্জাতিক ও জাতীয় বিষয়ে রেডিও ভাষ্যকার হিসেবে কাজ করেন। ১৯৬৫ সাল থেকে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের দৈনিক ক্রিশ্চিয়ান সায়েন্স মনিটরের পাকিস্তানের বিশেষ প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করেন।

কুতুবউদ্দিন আজিজ হলেন পাকিস্তান নিউজপেপার এডিটরস কাউন্সিলের স্থায়ী কমিটির সদস্য, করাচি সাংবাদিক ইউনিয়নের সাবেক ভাইস-প্রেসিডেন্ট। 'ফরেন পলিসি অব পাকিস্তান: অ্যান এনালাইসিস'-এর সহ-লেখক। এছাড়া তিনি 'মিশন টু ওয়াশিংটন' নামে একটি বইয়ের লেখক। বইটিতে পাকিস্তানকে দ্বিখণ্ডিতকরণে ১৯৭১ সালে যুক্তরাষ্ট্রে ভারতের চক্রান্ত ফাঁস করা হয়েছে। এছাড়া তিনি বহু পররাষ্ট্র নীতি বিষয়ক প্রবন্ধ ও পুস্তিকা লিখেছেন।

কুতুবউদ্দিন আজিজ ১৫ বছর বয়সে দাক্ষিণাত্যের হায়দ্রাবাদ বুলেটিনে সাপ্তাহিক কলাম লিখতেন। হায়দ্রাবাদ বুলেটিন ছিল এ রাজ্যের একটি ইংরেজি দৈনিক। হায়দ্রাবাদে তাঁর পিতা আবদুল আজিজ ভারতীয় বার্তা সংস্থা ইউনাইটেড প্রেস অব ইন্ডিয়ার ব্যুরো ম্যানেজার হিসেবে দায়িত্ব পালন করতেন। তাঁর মা ছিলেন হায়দ্রাবাদ রাজ্যের আইন সভার সদস্য। ১৯২৯ সালে ভারতের উত্তর প্রদেশের লক্ষ্ণৌতে তাঁর জন্ম। সেখানে তাঁর দাদা নবাব আবদুল্লাহ খান ছিলেন উর্দু দৈনিক হামদাম-এর মালিক ও সম্পাদক। কুতুবউদ্দিন আজিজ নয়াদিল্লি, সিমলা ও হায়দ্রাবাদে শিক্ষা লাভ করেন। তিনি সেন্ট জর্জ গ্রামার স্কুল স্টুডেন্টস সোসাইটি এবং হায়দ্রাবাদের নিজাম কলেজ ছাত্র ইউনিয়নের সহ-সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

কুতুবউদ্দিন আজিজ ১৯৪৮ সালে লন্ডনে আন্তর্জাতিক যুব সম্মেলনে যোগদান করেন। তিনি প্যারিস ও নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশন, ১৯৫৫ সালে ইন্দোনেশিয়ার বান্দুংয়ে জোট নিরপেক্ষ শীর্ষ সম্মেলন, ইন্দোনেশিয়ার সাধারণ নির্বাচন, ১৯৫৮ সালে লেবাননের গৃহযুদ্ধ, ১৯৬৪ সালে কঙ্গোর গৃহযুদ্ধ, ইন্দোনেশিয়ার ২০তম স্বাধীনতা বার্ষিকী এবং ইসলামী সম্মেলন সংস্থার (ওআইসি) পররাষ্ট্র ও শীর্ষ সম্মেলনসহ বহু আন্তর্জাতিক সম্মেলনের সংবাদ সংগ্রহ করেন। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট হ্যারি এস. ট্রুম্যান, চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই, জাপানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইউশিদা হাতোয়ামা এবং ফিলিপাইনের সাবেক প্রেসিডেন্ট গার্সিয়ার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন। ১৯৫৬ সালে টেলিফোনে সাবেক সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী বুলগানিনের সাক্ষাৎকারও গ্রহণ করেন।

www.pathagar.com

কুতুবউদ্দিন আজিজ সম্পাদক প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসেবে ১৯৫৬ সালে চীন, ১৯৫৭ সালে লিডার একচেঞ্জ প্রোগ্রামের আওতায় যুক্তরাষ্ট্রসহ ৬০টি দেশ ভ্রমণ করেছেন। তিনি পিএএফ স্টাফ কলেজ, কোয়েটায় আর্মি স্টাফ কলেজ, করাচি বিশ্ববিদ্যালয়, করাচিতে মার্কিন দূতাবাস, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেস ক্লাব এবং আরো বহু দেশে সুধী সমাবেশে বক্তৃতা করেন। ১৯৭১ সালের এপ্রিল থেকে নভেম্বর পর্যন্ত ওয়াশিংটনে পাকিস্তান দূতাবাসে সরকারি দায়িত্ব পালন করেন তিনি। পাকিস্তানের জন্য অসামান্য অবদান রাখায় ১৯৭১ সালে তাঁকে পাকিস্তান সরকার তমগা-ই-পাকিস্তান খেতাবে ভূষিত করে। ১৯৭২ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি তিনি ১৯৭১ সালের যুদ্ধে পাকিস্তানের বিপর্যয়ের কারণ অনুসন্ধানে গঠিত ওয়ার এনকোয়্যারি কমিশনে সাক্ষ্য দেন। পাকিস্তান সরকারের সোশাল ওয়েলফেয়ার ন্যাশনাল কাউন্সিল, সিন্ধু সরকারের সাইন্ড সোশাল ওয়েলফেয়ার কাউন্সিলের সদস্য এবং আরো বহু সংস্থায় সমাজ কল্যাণমূলক দায়িত্ব পালন করেন। তিনি সমাজ কল্যাণ বিষয়ক বহু বই, পুস্তিকা ও নিবন্ধ রচনা করেন। ১৯৫৮ সালে করাচি পৌর কর্পোরেশনের নির্বাচিত সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

www.pathagar.com

পর্যালোচনা

এই প্রথমবার ব্লাড এন্ড টীয়ার্স বইটিতে ১৯৭১ সালের মার্চ-এপ্রিলে সাবেক পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন বিদ্রোহীদের হাতে ৫ লাখের বেশি অবাঙালি ও পাকিস্তানপন্থী বাঙালি হত্যাযজ্ঞের মর্মান্তিক, নৃশংস ও অপ্রকাশিত উপাখ্যানের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। পশ্চিম পাকিস্তানে বসবাসকারী স্থানীয় বাঙালিদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধমূলক হামলা প্রতিরোধ এবং আওয়ামী লীগের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে একটি রাজনৈতিক মীমাংসায় পৌঁছানোর সম্ভাবনা নস্যাৎ না করার উদ্দেশ্যে তদানীন্তন কেন্দ্রীয় সরকার জনগণের কাছে এ দু'টি মাসে সংঘটিত গণহত্যার বিবরণ চাপা দিয়ে রেখেছিল। তবে সকল বাঙালি পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করায় পরবর্তীতে এ ধরনের প্রতিশোধ গ্রহণের বিপদ বিদূরিত হয়। এ বইটিতে ১৭০ জন প্রত্যক্ষদর্শীর বিধ্বস্ত জীবনের বিয়োগান্ত কাহিনীর বিবরণ প্রকাশ করা হয়েছে। ১৯৭৩ সালের শরৎ থেকে ১৯৭৪ সালের বসন্তকাল পর্যন্ত বাংলাদেশ থেকে পাকিস্তানে প্রত্যাবাসিত প্রায় ৫ হাজার পরিবারের মধ্য থেকে এসব প্রত্যক্ষদর্শীকে বাছাই করা হয়। সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের ৫৫টি শহরের বাসিন্দা হলেও এসব প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ এবং এ বইটিতে উদ্ধৃত বিদেশি সাংবাদিকদের প্রেরিত সংবাদে ১১০টি জায়গায় সংঘটিত হত্যাযজ্ঞ স্থান পেয়েছে। এসব জায়গায় নির্দোষ মানুষ হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শীদের মধ্যে রয়েছেন হতভাগ্য পিতামাতা ও অবলা স্ত্রী যারা প্রত্যক্ষভাবে তাদের আপনজনদের করুণ মৃত্যু প্রত্যক্ষ করেছেন। সাক্ষীদের মধ্যে আরো রয়েছে কিশোরী। এসব কিশোরী নিজেদের ইজ্জত হারিয়েছে। বাড এন্ড টীয়ার্সে ১৯৭১ সালের মার্চ-এপ্রিলে বিদ্রোহীদের নৃশংসতার ওপর বেশি আলোকপাত করা হলেও ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পূর্ব পাকিস্তানের পতন পরবর্তী ভারতে প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী বাঙালি মুক্তিবাহিনীর হত্যাযজ্ঞকে এড়িয়ে যাওয়া হয়নি। বহু বাঙালি বিদ্রোহীদের রোষানল থেকে তাদের অবাঙালি বন্ধুদের রক্ষায় সাহস ও বীরত্ব দেখিয়েছেন। বইটিতে তাদের সাহস ও বীরত্বের বর্ণনার ওপরও জোর দেয়া হয়েছে।

www.pathagar.com

অনুবাদকের কথা

১৯৭১ সালের যুদ্ধে বাঙালি, বিহারী, পাকিস্তানী সকলেরই রক্তই ঝড়েছে। পাকিস্তানীরা লড়েছে পাকিস্তানের অখণ্ডতা বজায় রাখার জন্য। বাঙালিরা যুদ্ধ করেছে তাদের দেশ স্বাধীন করার জন্য। এ যুদ্ধে তাই সঙ্গতকারণেই উভয়ের কাছে তাদের স্ব স্ব উদ্দেশ্য সঠিক ও ন্যায়সঙ্গত বলে মনে করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে।

যাহোক, যুদ্ধ মানেই মৃত্যু, ধ্বংসযজ্ঞ। এতে মানবিকতার মৃত্যু ঘটে। জ্বলে উঠে হিংস্রতার আগুন। ১৯৭১-এ তাই ঘটেছে। এ বইটিতে লেখক বিহারী হত্যাকাণ্ডের উপর আলোকপাত করেছেন। আর বাঙালি হত্যাকাণ্ড নিয়ে অসংখ্য বই প্রকাশিত হয়েছে।

ইতিহাস তার নিজ গতিতে ঘটনার বিশ্লেষণ করে। দু'পক্ষের বাড়াবাড়ি, মানবাধিকার বিরোধি তৎপরতার অধ্যায় ঢেকে গিয়ে দু'দেশের সাধারণ মানুষ তাদের ভুল ভ্রান্তি স্বীকার করে নিয়ে সম্মুখ পানে এগিয়ে যাবে সেই কামনাই করছি।

www.pathagar.com

সূচিপত্র

সূচনা ১৩
১৯৭১ সালের মার্চে কেন অবাঙালি হত্যাযজ্ঞের সংবাদ প্রকাশ করা হয়নি। আওয়ামী লীগের সন্ত্রাস থেকে শরণার্থীদের পশ্চিম পাকিস্তানে পলায়ন। ঢাকায় নিউইয়র্ক টাইমসের মহিলা সাংবাদিক বাঙালি জঙ্গিদের হাতে প্রহৃত। পশ্চিম ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ঘৃণ্য প্রচারণা।

প্রথম অধ্যায়: মার্চে ঢাকায় হত্যাযজ্ঞ ২৫
জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিতে জেনারেল ইয়াহিয়ার ঘোষণা সম্প্রচার। আওয়ামী লীগের বিদ্রোহ এবং পূর্ব পাকিস্তানে সমান্তরাল সরকার প্রতিষ্ঠা। মুক্তিপণের জন্য অবাঙালি অপহরণ। লন্ডনের সানডে টাইমসে বলা হয়, ১ লাখ অবাঙালিকে হত্যা করা হয়েছে। জগন্নাথ হলের বধ্যভূমি থেকে জিম্মির পলায়ন। সাংবাদিকের স্ত্রীর মুখে তার স্বামী হত্যাকাণ্ডের বর্ণনা।

দ্বিতীয় অধ্যায়: নারায়ণগঞ্জে সন্ত্রাস ৪৯
সন্ত্রাসীদের অবাধ বিচরণ। ফ্যাব্রিক ফ্যাক্টরিতে হত্যাকাণ্ড। একটি বাসে দু'জন অবাঙালি মেয়েকে ধর্ষণ। ৫শ' বিহারী মহিলা ও শিশুকে প্যারেড।

তৃতীয় অধ্যায়: চট্টগ্রামে কসাইখানা ৫৩
ওয়ারলেস কলোনি, ফিরোজশাহ কলোনি, রৌফাবাদ, হালিশহর, পাহাড়তলী, কালুরঘাট ও দোতলায় অবাঙালি হত্যাযজ্ঞ। 'চট্টগ্রামের কসাই' এম. আর. সিদ্দিকী। কর্ণফুলি নদীতে লাশ নিক্ষেপ নয়তো ভস্মীভূত। ইস্পাহানি জুট মিল এবং আওয়ামী লীগের প্রধান কার্যালয়ে কসাইখানা। বন্দি অবাঙালি মেয়েদের গণধর্ষণের চেম্বার। চট্টগ্রাম হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে বিদেশি পত্রপত্রিকার রিপোর্ট। বন্দরে পাকিস্তানপন্থী বাঙালি হত্যাকাণ্ড। বন্দিদশা থেকে বিহারী মহিলাদের উদ্ধার।

চতুর্থ অধ্যায়: চন্দ্রঘোনা ও রাঙ্গামাটিতে হত্যাযজ্ঞ ৭৯
স্বামী অপহরণ সম্পর্কে বিধবার বর্ণনা। অবাঙালিদের বাড়িঘরে লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ। বন্দি নারী ও শিশু। হত্যার জন্য শিবিরে আটক। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর উদ্ধার অভিযান। পেপার ও রেয়ন মিলে হত্যাযজ্ঞ।

www.pathagar.com

পঞ্চম অধ্যায়: খুলনায় হত্যাকাণ্ড ও অগ্নিসংযোগ ৮৩
টেলিফোন একচেঞ্জ ধ্বংস। অবাঙালি হোটেল ভস্মীভূত। ২৩ মার্চ অবাঙালি বসতিতে হত্যাযজ্ঞ। বিদেশি পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্ট। দৌলতপুর ও খালিশপুরে হত্যাকাণ্ড। নদীর তীরবর্তী বধ্যভূমি এবং জুটমিলে কসাইখানা। চোখ উৎপাটন করে নির্যাতনের নিষ্ঠুর পদ্ধতি। বাগেরহাটের ফুলতলায় হত্যাযজ্ঞ।

ষষ্ঠ অধ্যায়: সাতক্ষীরা ভস্মীভূত ৯৩
বিদ্রোহীদের প্রতি ভারতের সমর্থন। সশস্ত্র অনুপ্রবেশকারী। বন্দি সাব-ডিভিশনাল অফিসারকে রাস্তার মধ্য দিয়ে টানা হ্যাঁচড়া। পাটের জ্বলন্ত গুদামে অবাঙালিদের নিক্ষেপ করে হত্যা। আটক মহিলার কপাল কেটে **'জয় বাংলা'** লিখন। বিদ্রোহীদের ভারতে পলায়ন।

সপ্তম অধ্যায়: দিনাজপুরে নারকীয় তাণ্ডব ৯৭
বাসে অবাঙালিদের পুড়িয়ে হত্যা। ডাক বিভাগের ভ্যানে হামলা। ২৫০ জন পাঠানকে নির্মমভাবে হত্যা। নীলমতিতে হত্যাকাণ্ড। চার শ' বিহারী বন্দি মহিলাকে নগ্ন অবস্থায় প্যারেড। জীবিত মেয়েদের উদ্ধার। পাহাড়পুরে নরহত্যা। কাঞ্চন নদীর তীরে কসাইখানা। নির্যাতনের ঘৃণ্য কৌশল। হত্যাকারীদের মধ্যে হিন্দু জঙ্গি। অবাঙালিদের রক্ষা করায় বাঙালিদের ওপর জুলুম। অন্যান্য শহরে হত্যাযজ্ঞ।

অষ্টম অধ্যায়: পার্বতীপুরে হত্যাযজ্ঞ ১১১
রেলওয়ের অবাঙালি কর্মচারী ও পরিবার নিধন। ঈশ্বরদী থেকে আগত ট্রেনে হত্যাকাণ্ড। এপ্রিলের শুরুতে অবাঙালি গণহত্যা। ডিসেম্বরে মুক্তিবাহিনীর রক্তপাত। আতঙ্কিত মহিলাদের সৈয়দপুরে পলায়ন।

নবম অধ্যায়: ঠাকুরগাঁয়ের হিলিতে হত্যাযজ্ঞ ১১৫
রহমতগঞ্জে অবাঙালি হত্যাকাণ্ড। মসজিদে হত্যাযজ্ঞ। অবাঙালি বন্ধুকে রক্ষায় বাঙালি। হিলি, ফুলবাড়ি, পঞ্চগড় ও চরকাইয়ে হত্যাকাণ্ড। হিলিতে হত্যাযজ্ঞ সম্পর্কে ৬ এপ্রিল লন্ডন টাইমসে প্রকাশিত রিপোর্ট।

দশম অধ্যায়: লাকসাম ও রাজবাড়িতে নরহত্যা ১১৯
লাকসামে অবাঙালি বসতিতে হত্যাকাণ্ড। রেলওয়ের অবাঙালি কর্মচারীদের হত্যা। রাজবাড়ীতে অবাঙালি মেয়েদের অপহরণ। আতঙ্কিত অবাঙালি মহিলাদের গোয়ালন্দে পলায়ন। ফরিদপুরে সন্ত্রাস।

একাদশ অধ্যায়: কুষ্টিয়ায় নৃশংসতা ১২৩
হার্ডিঞ্জ ব্রিজ কলোনিতে অবাঙালি গণহত্যা। পদ্মা নদীতে লাশ নিক্ষেপ। স্কুল ভবনে একত্রিত বন্দি বিহারী মহিলা ও শিশুদের নাটকীয়ভাবে ভাগ্য পরিবর্তন। আড়ওয়াপাড়া ও

www.pathagar.com

থানাপাড়ায় হত্যাকাণ্ড। কুষ্টিয়া কারাগারে অবাঙালি পুরুষদের হত্যা। জ্বলন্ত সিগারেট দিয়ে অবাঙালিদের শরীরে ছ্যাকা। অন্তঃসত্ত্বা মহিলাদের তলপেট এফোড়-ওফোড়।

দ্বাদশ অধ্যায়: চুয়াডাঙ্গায় বর্বরতা ১২৭
মুরগি পট্টি কলোনিতে হত্যাকাণ্ড। রেলওয়ে স্টেশনে বিদ্রোহীদের হামলা এবং অবাঙালি স্টাফ হত্যা। স্কুল ভবনে আটক অবাঙালিদের ওপর হামলা। পশ্চিম পাকিস্তানি অফিসারকে নির্যাতন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়: জাফরকান্দি ও মেহেরপুরে হত্যাযজ্ঞ ১৩১
মেহেরপুর জুট মিলে অবাঙালি গণহত্যা। জ্বলন্ত ঘরবাড়ি থেকে পালিয়ে যাওয়া অবাঙালিদের গুলি করে হত্যা। অবাঙালি মেয়েদের অপহরণ, ধর্ষণ ও গুলি করে হত্যা। জাফরকান্দিতে অবাঙালি জনগোষ্ঠীকে নির্মূল।

চতুর্দশ অধ্যায়: ঈশ্বরদীতে গণহত্যা ১৩৩
অবাঙালি গণহত্যা থেকে অল্পসংখ্যক লোকের জীবিত থাকার সুগোগ লাভ। অবাঙালিদের মৃতদেহের স্তূপের ওপর বিহারী বিরোধী শ্লোগান উৎকীর্ণ। পশ্চিম টেংরি কলোনিতে নরহত্যা।

পঞ্চদশ অধ্যায়: পাকসিতে উৎপীড়ন ১৩৫
মসজিদে একত্রিত অবাঙালি বিধবা ও এতিমদের আর্তনাদ। গণহত্যা থেকে ছোট বোনের সঙ্গে ১৫ বছর বয়স্ক ভাইয়ের পলায়ন। প্রাপ্তবয়স্ক অবাঙালি পুরুষদের হত্যা।

ষোড়শ অধ্যায়: নোয়াখালীতে সন্ত্রাসের রাজত্ব ১৩৯
অবাঙালিদের বাড়িঘরে হামলা, লুটপাট ও হত্যাকাণ্ড। এপার্টমেন্ট হাউজে নৃশংসতা। বাঙালিদের কাছে অবাঙালিদের আশ্রয় লাভ।

সপ্তদশ অধ্যায়: সিলেটে দুর্ভোগ ১৪১
অবাঙালি হত্যাকাণ্ডে চা শ্রমিকদের আওয়ামী লীগের উসকানি। বিদ্রোহীদের হাতে অবাঙালি দম্পতি নিহত। তবে বাঙালি গৃহপরিচারিকা ছিল নিহত দম্পত্তির শিশুদের রক্ষক।

অষ্টাদশ অধ্যায়: মৌলভী বাজার ও ভেড়ামারায় গোলাগুলি ১৪৫
হত্যা করার আগে বন্দিদের কবর খুঁড়তে বাধ্য করা। নদীর তীরে অবাঙালিদের একত্রিত করে গুলি করে হত্যা। স্বামীর হত্যাকাণ্ড এবং নিজের ধর্ষিতা হওয়ার ব্যাপারে তরুণী বিধবার সাক্ষ্য। নারকেলডাঙ্গায় হত্যাযজ্ঞ।

উনিশতম অধ্যায়: রংপুরে হত্যাকাণ্ড ১৪৯
আলমনগর কলোনিতে হত্যাযজ্ঞ। বিহারী বসতি নির্মূল। ইকবাল হাইস্কুলে জীবিত অবাঙালি মহিলাদের আটক। আটক মহিলাদের ধর্ষণ এবং গুলি করে হত্যা।

www.pathagar.com

বিশতম অধ্যায়: নীলফামারি ও সৈয়দপুর বিধ্বস্ত ১৫৩
নিষ্ঠুর অবাঙালি হত্যাযজ্ঞ। কপিলমনিতে আতঙ্ক। পুকুরে ধর্ষিতা ও নিহত মেয়েদের লাশ। সৈয়দপুরে রেলওয়ের অবাঙালি কর্মচারীদের হত্যা।

একুশতম অধ্যায়: লালমনিরহাটে হত্যাকাণ্ড ১৫৭
অবাঙালি বসতিতে রক্তপাত। বাঙালি প্রতিবেশীদের কাছে অবাঙালিদের সহায়তা প্রার্থনা। ট্রেনে হত্যাকাণ্ড। মুক্তিবাহিনীর সহিংসতা।

বাইশতম অধ্যায়: যশোরে হত্যাযজ্ঞ ১৫৯
লাইনচ্যুত ট্রেনে অবাঙালিদের হত্যা। ঝমুঝুমপুর কলোনি, তারাগঞ্জ, হামিদপুর, আম্বাগাঁও, বাচ্চাচর ও পুরাতন কসবায় হত্যাকাণ্ড। মোবারকগঞ্জ, কালিগঞ্জ, কোটচাঁদপুর ও তফ-সিডাঙ্গায় অবাঙালি গণহত্যা। যশোরে গণহত্যা সম্পর্কে বিদেশি পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্ট। ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের বিদ্রোহী সৈন্যদের হাতে পশ্চিম পাকিস্তানি অফিসার নিধন। হিন্দু ও সশস্ত্র ভারতীয় অনুপ্রবেশকারীদের হাতে অবাঙালি হত্যাকাণ্ড। ক্যান্টনমেন্ট অবরোধ। বাঙালি বিদ্রোহীদের হাতে ইতালীয় যাজক রেভারেন্ড মারিও ভেরোনসির হত্যাকাণ্ড।

তেইশতম অধ্যায়: নড়াইলে দুর্ভোগ ১৬৭
অবাঙালি হত্যাকাণ্ডে হিন্দুদের সহায়তা। মৌলভীপাড়ায় নির্যাতন। বিদ্রোহীদের হাতে ইসলাম প্রিয় বাঙালি হত্যাকাণ্ড। মুজগুন্নি ও সোনাডাঙ্গায় অবাঙালিদের নির্মূল। অল্পসংখ্যক অবাঙালির প্রাণরক্ষা।

চব্বিশতম অধ্যায়: ঝিনাইদহের বজরডাঙ্গায় নির্মূল অভিযান ১৭১
বিদ্রোহীদের হাতে রেলওয়ের অবাঙালি কর্মচারী এবং রেলওয়ে স্টেশনে অবাঙালি পরিবার নিশ্চিহ্ন। রেললাইন ধ্বংস। ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজে অবাঙালিদের ওপর হামলা।

পঁচিশতম অধ্যায়: নোয়াপাড়া ও দর্শনায় রক্তগঙ্গা ১৭৩
নোয়াপাড়ায় কার্পেটিং মিলের সকল অবাঙালি স্টাফ নিহত। নিহত অবাঙালি বন্ধুর কন্যাকে রক্ষায় বাঙালি পরিবারের সহায়তা। আটক অবাঙালি মেয়েদের নোয়াপাড়া বাজারে ঘোরানো। অপহৃত অবাঙালি ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে মুক্তিপণ আদায়। দর্শনায় অবাঙালি বসতি নির্মূল।

ছাব্বিশতম অধ্যায়: বরিশালে ধ্বংসলীলা ১৭৭
মাঝ নদীতে স্টীমারে অবাঙালিদের হত্যা। বাঙালি বার্জম্যানের হাতে একমাত্র জীবিত মহিলার প্রাণরক্ষা। ঝালকাঠির কুর্মিটোলায় হত্যাযজ্ঞ। বাজারে অবাঙালি মহিলাদের নগ্ন অবস্থায় প্যারেডে বাধ্য করা। গণহত্যায় বিদ্রোহীদের উন্মত্ততা।

www.pathagar.com

সাতাইশতম অধ্যায়: ময়মনসিংহে গণহত্যা ১৮১
ক্যান্টনমেন্টে পশ্চিম পাকিস্তানি সামরিক কর্মকর্তা এবং তাদের পরিবারবর্গকে হত্যা। শানকিপাড়া বিহারী বসতিতে হত্যাকাণ্ড। ময়মনসিংহে রক্তগঙ্গা সম্পর্কে বিদেশি পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্ট। মসজিদে হত্যাকাণ্ড। মসজিদে হত্যাকাণ্ড থেকে ৫শ' বিহারী নারী ও শিশুকে রক্ষায় বাঙালি ইমামের বীরত্ব। বিহারীদের লাশ ভস্মীভূত। ৭০টি পাঞ্জাবী পরিবার নির্মূল। গণহত্যার দৃশ্য। ফায়ারিং স্কোয়াড ও শকুন, কসাইখানা। বিদ্রোহীদের হাতে নিহত স্বামীর হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে বাঙালি বিধবার বর্ণনা।

আটাইশতম অধ্যায়: রাজশাহী ও নাটোরে হত্যাযজ্ঞ ১৯৫
বাঙালি বিদ্রোহীদের ভারতের সামরিক সহায়তা প্রদান। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস। ক্ষতিগ্রস্ত রাজশাহী রেডিও স্টেশন চালু করতে ভারতীয় প্রকৌশলী নিয়োগ। অবাঙালিদের লাশ নদীতে নিক্ষেপ। সারদা ও নবাবগঞ্জে হত্যাযজ্ঞ।

উনত্রিশতম অধ্যায়: পাবনা ও সিরাজগঞ্জে রক্তগঙ্গা ১৯৯
অবাঙালি মেয়েদের অপহরণ ও ধর্ষণ। নদীতে লাশ নিক্ষেপ। সাড়ে ৩শ' অবাঙালিকে জীবন্ত পুড়িয়ে হত্যা। পাকিস্তান সেনাবাহিনী ক্ষতবিক্ষত লাশের স্তূপ খুঁজে পায়।

ত্রিশতম অধ্যায়: কুমিল্লায় দুর্ভোগ ২০১
আগুন দিয়ে পোড়ানোর আগে লাল কালি দিয়ে অবাঙালিদের বাড়িঘর চিহ্নিত। নিউ মার্কেটে হত্যাকাণ্ড। হিন্দুদের হাতে মসজিদ অপবিত্র। সরকারি কোষাগার লুট। বিদ্রোহীদের টেলিফোন একচেঞ্জ দখল। আখাউড়ায় হত্যাকাণ্ড।

একত্রিশতম অধ্যায়: ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় দুর্দশা ২০৫
কারাগারে আটক ৫শ' বিহারী মহিলা ও শিশুকে হত্যা। অবাঙালি হত্যাযজ্ঞ। অপরাধীদের ভারতে পলায়ন। ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় অবাঙালি হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে লন্ডনের সানডে টাইমসে প্রকাশিত রিপোর্ট।

বত্রিশতম অধ্যায়: বগুড়া ও নওগাঁয় গোলযোগ ২০৭
অবাঙালিদের ঘরবাড়ি ও দোকানপাট লুটপাট এবং অগ্নিসংযোগ। হত্যার উদ্দেশ্যে কারাগারে বন্দি ৭শ' অবাঙালিকে পাকিস্তান সেনাবাহিনী উদ্ধার করে। অন্তঃসত্ত্বা মহিলার তলপেটে বেয়নেট চার্জ। নওগাঁয় অবাঙালি হত্যাকাণ্ড। রাস্তায় বিদ্রোহীদের ব্যারিকেড। ৫০ জন আটক অবাঙালি মহিলাকে নগ্ন অবস্থায় প্যারেড।

তেত্রিশতম অধ্যায়: সাপ্তাহারে বীভৎসতা ২০৯
অবাঙালি বসতিতে হত্যাকাণ্ডের দৃশ্য। বাঁচার জন্য জীবিতদের কবরে আশ্রয় গ্রহণ। বন্দি শিবিরে অবাঙালি মহিলাদের প্যারেড। পাকিস্তান সেনাবাহিনী অবাঙালি মহিলাদের উদ্ধার করে। ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে মুক্তিবাহিনীর সন্ত্রাস।

www.pathagar.com

শেষ কথা ২১৫

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অভিযানের অনেক আগে আওয়ামী লীগ অবাঙালি নিধন শুরু করে। স্বায়ত্তশাসন থেকে স্বাধীনতায় উত্তরণে ভোটারদের সঙ্গে আওয়ামী লীগের প্রতারণা। শ্বেতপত্র। আগরতলা ষড়যন্ত্র। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগকে ভারতের অঢেল সহায়তা। বিদ্রোহীদের ভারতের ব্যাপক সামরিক সহায়তা প্রদান। ১৯৭১ সালের এপ্রিলে কলকাতায় ভারতের সমর্থনপুষ্ট প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার। পূর্ব পাকিস্তান দখলে ভারতের সামরিক প্রস্তুতি। শরণার্থীদের সংখ্যা অতিরঞ্জিত। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর হাতে ৩০ লাখ বাঙালি নিহত এবং ২ লাখ বাঙালি মহিলা ধর্ষিত হওয়ার ব্যাপারে আওয়ামী লীগের দাবির অসারতা।

পরিশিষ্ট

www.pathagar.com

সূচনা

১৯৭১ সালে মার্চের প্রথম সপ্তাহে যে সময় আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানে বিদ্রোহের প্রথম সূচনা ঘটায় এবং গোটা প্রদেশব্যাপী বিশৃঙ্খলা, অগ্নিসংযোগ, লুটতরাজ ও হত্যাযজ্ঞের তাণ্ডবলীলা শুরু করে তখন কেন্দ্রীয় তথ্য মন্ত্রণালয়ের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা দেশের পূর্বাঞ্চলে অবাঙালিদের ওপর বিদ্রোহীদের নৃশংসতার কোনো সংবাদ প্রকাশ না করার জন্য আমার বার্তা সংস্থা ইউপিপি'কে নির্দেশ দেন। পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যান্য বার্তা সংস্থা এবং দৈনিক পত্রিকাগুলোকেও একই নির্দেশ দেয়া হয়। আমি তথ্য মন্ত্রণালয়ের সেই কর্মকর্তার কাছে প্রতিবাদ করি এবং তাকে জানাই যে, এসব সংবাদ গোপন করা অন্যায়। আমি প্রতিবাদ করায় সেই কর্মকর্তা তার অন্যায় নির্দেশের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেন, পূর্ব পাকিস্তানে অবাঙালিদের ওপর নৃশংসতার সংবাদ প্রকাশিত হলে পশ্চিম পাকিস্তানে গুরুতর প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে এবং পশ্চিম পাকিস্তানে বসবাসকারী বাঙালিরা প্রতিশোধমূলক হামলার শিকার হবে। তিনি আরো বললেন, অবাঙালিদের ওপর বিদ্রোহীদের নৃশংসতার সংবাদ প্রকাশিত হলে পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে চলমান উত্তেজনা আরো বৃদ্ধি পাবে এবং তাতে আওয়ামী লীগের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে সংকট নিষ্পত্তির সম্ভাবনা ব্যাহত হবে। তার ব্যাখ্যায় সুস্থ যুক্তি এবং মানবিক বিবেচনা ছিল। পূর্ব পাকিস্তানে অসহায় পশ্চিম পাকিস্তানি, বিহারী ও অবাঙালিদের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগের উন্মত্ত সহিংসতার সংবাদ গোপন রাখতে পশ্চিম পাকিস্তানের প্রচার মাধ্যম বিশ্বস্ত তার সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের এ নির্দেশ অনুসরণ করে।

বিদ্রোহের প্রাথমিক দিনগুলোতে আওয়ামী লীগের জঙ্গি সমর্থকরা পূর্ব পাকিস্তানের গোটা টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থায় নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে এবং তারা পশ্চিম পাকিস্তান ও বহির্বিশ্বে প্রেরিত ব্যক্তিগত টেলিগ্রাম ও চিঠিপত্রে অবাঙালি হত্যাযজ্ঞের নির্মম ঘটনাগুলো সযত্নে এড়িয়ে যায়। আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসের রাজত্ব থেকে বেশ কিছু পশ্চিম পাকিস্তানি বিমান ও জাহাজে করে পশ্চিম পাকিস্তানে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। তাদের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানে অবাঙালি হত্যাকাণ্ডের সংবাদ পশ্চিম পাকিস্তানে পৌঁছে। কিন্তু কোনো পত্রিকা এসব সংবাদ প্রকাশ করার সাহস দেখায়নি।

মার্চের তৃতীয় সপ্তাহে প্রায় ৫ হাজার আতঙ্কিত পশ্চিম পাকিস্তানি ও অন্যান্য অবাঙালি চট্টগ্রাম থেকে জাহাজে করে করাচি পৌঁছে। পশ্চিম পাকিস্তানের কোনো পত্রিকায় তাদের অবস্থা সম্পর্কে একটি কথাও ছাপা হয়নি। একটি দৈনিকে এ সংবাদ প্রকাশিত হয়। এ পত্রিকার রিপোর্টে বলা হয়, চট্টগ্রাম থেকে এসব লোক ফিরে এসে জানিয়েছে যে, প্রদেশের অবস্থা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। এ পত্রিকার রিপোর্টে এমন একটি ধারণা দেয়া হয়েছিল যেন এসব ভয়ার্ত লোক শান্তির একটি স্বর্গরাজ্য থেকে ফিরে এসেছে।

১৯৭১ সালে গোলযোগপূর্ণ গোটা মার্চ জুড়ে আতঙ্কিত অবাঙালিরা সেনাবাহিনী নিয়ন্ত্রিত ঢাকা বিমানবন্দরে পশ্চিম পাকিস্তানে নিরাপদে প্রত্যাবর্তনের জন্য ভিড় জমায়।

www.pathagar.com

কিন্তু বিশ্ব কিংবা পশ্চিম পাকিস্তানের প্রচার মাধ্যমে এসব নির্দোষ মানুষের মর্মন্তুদ কাহিনী প্রকাশিত হয়নি। নির্দোষ মানুষগুলো আওয়ামী লীগের সন্ত্রাস থেকে বাঁচার জন্য পালিয়ে বেরিয়েছে। পশ্চিম পাকিস্তানি সামরিক ও বেসামরিক লোকদের ক্ষত-বিক্ষত লাশবাহী কফিনগুলো শোকসন্তপ্ত পরিবারসহ ঢাকা থেকে করাচি বিমানবন্দরে এসে পৌঁছে। কেন্দ্রীয় সরকার নিষেধাজ্ঞা আরোপ করায় পূর্ব পাকিস্তানে অবাঙালি হত্যাযজ্ঞের এ হৃদয়বিদারক কাহিনী পশ্চিম পাকিস্তানের কোনো পত্রিকায় প্রকাশিত হয়নি। ইসলামাবাদে কর্মরত কেন্দ্রীয় সরকারের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের বাঙালি সচিব পূর্ব পাকিস্তানে অবাঙালি হত্যাযজ্ঞের সংবাদ প্রকাশের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন। কিন্তু একপর্যায়ে পত্রিকাগুলো মন্ত্রণালয়ের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করার প্রয়োজন অনুভব করে। ১৯৭১ সালে মার্চের দ্বিতীয় সপ্তাহে আমার অনুরোধে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি করাচির কাউন্সিল মুসলিম লীগ নেতা জেড. এইচ. বারী অত্যন্ত সতর্ক ভাষায় একটি বিবৃতি দেন। ১৯৪৭ সালে তিনি ভারত থেকে পাকিস্তানে অভিবাসন করেছিলেন। তার দল পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে আওয়ামী লীগের সঙ্গে রাজনৈতিক জোট গঠনের চেষ্টা করছিল। বিচারপতি বারী তাঁর বিবৃতিতে পূর্ব পাকিস্তানে বসবাসরত অবাঙালিদের রক্ষায় শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি আহ্বান জানান।

১৯৭১ সালের মার্চের ঘটনাবলী স্মরণ করতে গেলে আমাকে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, পূর্ব পাকিস্তানের অভ্যন্তরে জেলা প্রতিনিধিদের ওপর আমার বার্তা সংস্থা ইউপিপি'র নিয়ন্ত্রণ ছিল খুবই সীমিত। আমাদের সংস্থা প্রদেশব্যাপী অবাঙালি হত্যাযজ্ঞের নিষ্ঠুরতা, ব্যাপকতা ও ভয়াবহতা সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত ছিল না। করাচিতে আমার কাছে ঢাকা ও চট্টগ্রামে সংঘটিত অবাঙালি হত্যাযজ্ঞের অস্পষ্ট সংবাদ পৌঁছতো। বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তান থেকে যারা পশ্চিম পাকিস্তানে পালিয়ে আসতো করাচি বিমানবন্দরে তাদের কাছ থেকে আমি কিছু কিছু সংবাদ পেতাম। আওয়ামী লীগের জঙ্গি সমর্থক এবং ইপিআর ও ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের বিদ্রোহী সৈন্যরা শহর ও জনপদে হত্যা ও ধ্বংস-লীলায় মেতে উঠে। বাস্তবিক অর্থে আমি এসব ঘটনার খবর রাখতাম না।

পূর্ব পাকিস্তানের গভীর রাজনৈতিক সংকট সম্পর্কে ক্রিশ্চিয়ান সায়েন্স মনিটরে আমার পাঠানো একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। ১৯৭১ সালের ১৪ মার্চ ডেইলি মিলওয়াকি জার্নালে আমার এ রিপোর্ট পুনর্মুদ্রিত হয়। আমি তাতে লিখেছিলাম, 'ঢাকা থেকে প্রাপ্ত সংবাদে বলা হয়েছে, আওয়ামী লীগের অসহযোগ আন্দোলনে ব্যাপক সহিংসতা, অগ্নিসংযোগ, লুণ্ঠন ও হত্যাকাণ্ড শুরু হয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানের কয়েকটি শহরে পশ্চিম পাকিস্তানিদের মালিকানাধীন সম্পত্তির ধ্বংস অপরিমেয়। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে টেলিফোন যোগাযোগ প্রায় বিচ্ছিন্ন এবং ঢাকা ও করাচির মধ্যে মাত্র কয়েকটি বিমান চলাচল করছে।'

১৯৭১ সালে এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে পশ্চিম ইউরোপ ও ভারতের দু'একটি পত্রিকায় মার্চে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে পূর্ব পাকিস্তানে বিদ্রোহের সময় অবাঙালি হত্যাযজ্ঞের অবর্ণনীয় কাহিনীর ছিটেফোটা প্রকাশিত হয়। ১৯৭১ সালের ৬ এপ্রিল লন্ডন টাইমসে ছাপা হয়:

> 'ভারত বিভক্তির সময় পূর্ববঙ্গে অভিবাসনকারী হাজার হাজার অসহায় মুসলমান শরণার্থীকে গত সপ্তাহে ক্রুদ্ধ বাঙালিরা হত্যা করেছে বলে খবর পাওয়া গেছে।'

www.pathagar.com

১৯৭১ সালের ৪ এপ্রিল নয়াদিল্লিতে ডেইলি স্টেটসম্যান-এ ছাপা হয়:

> 'পূর্বাঞ্চলে লাখ লাখ অবাঙালি মুসলমান আটকা পড়েছে। এসব অবাঙালি মুসলমান পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে চলমান সংকটে একটি সার্বক্ষণিক আতংকের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। আশংকা করা হচ্ছে যে, বাঙালিরা এই বিপুল সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের ওপর প্রতিশোধ গ্রহণ করবে।'

এ বইয়ে সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের ৫৫টি শহরের প্রত্যক্ষদর্শীদের সাক্ষ্য উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শীরা তাদের অভিন্ন সাক্ষ্যে বলেছেন, ১৯৭১ সালে রক্তস্নাত মার্চ মাসের প্রাথমিক দিনগুলোতে পশ্চিম পাকিস্তানি, বিহারী, অন্যান্য অবাঙালি এবং পাকিস্তানপন্থী বাঙালি হত্যাকাণ্ড শুরু হয়। ২৬ মার্চের আগ পর্যন্ত ঢাকায় আনুমানিক ৩৫ জন বিদেশি সাংবাদিক অবস্থান করছিলেন। কিন্তু এসব সাংবাদিক যেসব পত্রিকা ও বার্তা সংস্থায় নিয়োজিত ছিলেন সেসব পত্রিকা ও বার্তা সংস্থায় পূর্ব পাকিস্তানে অবাঙালি গণহত্যার বিরুদ্ধে একটি কথাও লিখা হয়নি। ঢাকায় আমেরিকার সাংবাদিকও ছিলেন। ১৯৭০ সালের নভেম্বরে প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড়ে দুর্গত বাঙালিদের জন্য তাদের প্রাণ কেঁদে উঠেছিল। আওয়ামী লীগের গণসংযোগে এসব আমেরিকান সাংবাদিক এত মোহাবিষ্ট হয়ে পড়েছিলেন যে, আওয়ামী লীগ অবাঙালি হত্যাযজ্ঞে ইন্ধন দিতে অথবা এ ধরনের হত্যাকাণ্ড ঘটাতে পারে বলে তারা বিশ্বাস করতে প্রস্তুত ছিলেন না।

নিউইয়র্ক টাইমসের ম্যাগাজিন সেকশনের মহিলা সাংবাদিক পেগি ডারডিন এবং একই পত্রিকার রিপোর্টার পেগির স্বামীকে ১৯৭১ সালে মার্চের প্রথম সপ্তাহে বাঙালি বিক্ষোভকারীরা ঢাকার প্রাণকেন্দ্রে লোহার রড ও লম্বা লাঠি দিয়ে প্রহার করে। এ সময় শেখ মুজিবুর রহমান মাত্র অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলেন। কিন্তু পেগি মার্চ অথবা এপ্রিলের কোনোদিন তাঁর বহুল প্রচারিত দৈনিকে বাঙালিদের হাতে তাঁর নিগৃহীত হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে একটি শব্দও লিখেননি। ১৯৭১ সালের ২ মে নিউইয়র্ক টাইমসের ম্যাগাজিন সেকশনে পেগি তাঁর নিবন্ধে বিদ্রোহী বাঙালিদের বিরুদ্ধে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কথিত নৃশংসতার উপাখ্যান তুলে ধরতে গিয়ে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন বিদ্রোহের সংবাদ উল্লেখ করেন এবং প্রথমবার স্বীকার করেন যে, ১৯৭১ সালে মার্চের প্রথম সপ্তাহে তিনি ও তাঁর স্বামী ঢাকায় বাঙালি বিক্ষোভকারীদের হাতে লাঞ্ছিত হয়েছেন।

ঢাকায় অবস্থানরত কয়েকজন বিহারীর আত্মীয়-স্বজন এ শহর এবং অন্যান্য স্থানে নিহত হয়েছিল। এসব বিহারী হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে বিদেশি সাংবাদিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা চালায়। আওয়ামী লীগের চরমপন্থীরা শহরের সকল প্রবেশ পথ নিয়ন্ত্রণ করছিল। এসব চরমপন্থী হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে বিদেশি সাংবাদিকদের সঙ্গে বিহারীদের সাক্ষাতে বাধা দেয়। আওয়ামী লীগ টেলিফোন একচেঞ্জ দখল করে নেয়ায় এবং লাইনে আড়িপাতায় টেলিফোনে কথাবার্তা বলা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। ১৯৭১ সালের মার্চে ঢাকায় অবস্থানকারী একজন ব্রিটিশ সাংবাদিক আমাকে জানিয়েছিলেন যে, এ মাসের তৃতীয় সপ্তাহে নয়াদিল্লিতে তাঁর পত্রিকার সহকর্মীর সঙ্গে যেই মাত্র সাবেক পূর্ব পাকিস্তানে অবাঙালি হত্যাযজ্ঞের লোমহর্ষক ঘটনার উল্লেখ করছিলেন ঠিক তখন বাঙালি টেলিফোন অপারেটররা তাঁর লাইন কেটে দেয়।

www.pathagar.com

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পাকিস্তান সেনাবাহিনী আওয়ামী লীগের জঙ্গি সমর্থক এবং অন্যান্য বাঙালি বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান শুরু করার পরদিন ২৬ মার্চ ৩৫ জন বিদেশি সাংবাদিককে ঢাকা থেকে বহিষ্কার করা হয়। বিদেশি সাংবাদিকদের বহিষ্কার করায় পাকিস্তান সরকারকে অনেক চড়া মূল্য দিতে হয়েছে। বহিস্কৃত সাংবাদিকদের মধ্যে কয়েকজন ছিলেন আমেরিকার প্রভাবশালী ও সুপরিচিত সাংবাদিক। এসব সাংবাদিক পাকিস্তানের সামরিক সরকারের বিরুদ্ধে চরম ঘৃণা পোষণ করতেন এবং ১৯৭১ সালের পুরো সময়ে তাদের শক্তিশালী কলম থেকে পাকিস্তান সম্পর্কে একটি ভালো শব্দ বের হয়নি। প্রভাবশালী আমেরিকান সাংবাদিকগণ নিজ দেশের পত্রপত্রিকায় বাঙালি বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর গৃহীত ব্যবস্থার অতিরঞ্জিত বিবরণ প্রকাশ করেন। কিন্তু তারা ১৯৭১ সালের মার্চ-এপ্রিলে বাঙালি বিদ্রোহীদের হাতে অবাঙালি জনগোষ্ঠীর একটি বিরাট অংশ দৃশ্যত নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার ঘটনা এড়িয়ে যান। আমেরিকা ও পশ্চিম ইউরোপের কোটি কোটি মানুষ পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত অতিরঞ্জিত বিবরণগুলোকে বেদ বাক্য হিসেবে গ্রহণ করে। তারা পত্রিকায় প্রকাশিত সাবেক পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কাল্পনিক নৃশংসতার বিবরণগুলো সত্য বলে বিশ্বাস করতে শুরু করে। ঢাকা থেকে বিদেশি সাংবাদিকদের জোরপূর্বক বহিষ্কার করায় দেশের পূর্বাঞ্চলে সামরিক অপারেশন সম্পর্কে করাচি থেকে সেন্সর করে সংবাদ পাঠানো হতো। সেন্সরকৃত এসব সংবাদ আমেরিকান ও ব্রিটিশ পত্র-পত্রিকাগুলো বিশ্বাস না করায় ১৯৭১ সালের মার্চে আওয়ামী লীগের বিদ্রোহকালে অবাঙালি জনগোষ্ঠীর রক্তপাত সম্পর্কে বিশ্ববাসী ছিল অজ্ঞাত। এভাবে আধুনিককালের একটি নৃশংসতম গণহত্যা চাপা পড়ে যায়।

১৯৭১ সালে এপ্রিলের শেষ সপ্তাহে কেন্দ্রীয় তথ্য মন্ত্রণালয় পাকিস্তানের একদল সাংবাদিককে সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের বিদ্রোহ কবলিত কয়েকটি এলাকা সফরের জন্য নিয়ে যাবার আয়োজন করে। আমাকে তাঁদের সঙ্গে সফরে যাবার আমন্ত্রণ জানানো হয়। কিন্তু আমি তখন সিন্ধু সরকারের সোশাল ওয়েলফেয়ার এভালিউয়েশন কমিটির রিপোর্ট সম্পন্ন করার কাজে ব্যস্ত ছিলাম। আমি ছিলাম এ কমিটির চেয়ারম্যান। ১৯৭১ সালের ১২ এপ্রিল শেষ তারিখের আগে সিন্ধুর প্রাদেশিক প্রশাসনের কাছে এ রিপোর্ট জমা দানে তৎপর থাকায় আমি বিনয়ের সঙ্গে এ আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করি। এ গ্রুপের সঙ্গে যারা গিয়েছিলেন করাচির ইংরেজি দৈনিক মর্নিং নিউজের এসিসট্যান্ট এডিটর এবং লন্ডনের সানডে টাইমসের পাকিস্তানি প্রতিনিধি এন্থনি মাসকারেনহাস ছিলেন তাদের অন্যতম। ১৯৭১ সালের ২ মে সানডে টাইমসে আওয়ামী লীগের বিদ্রোহ এবং বিদ্রোহের ধ্বংসলীলা সম্পর্কে তাঁর বিলম্বিত একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। মাসকারেনহাসের রিপোর্টে পূর্ব পাকিস্তানে বাঙালি বিদ্রোহীদের হাতে এক লাখ অবাঙালি নিহত হওয়ার ব্যাপক রক্তপাতের কিঞ্চিত আভাস দেয়া হয়। কিন্তু এক মাস পর তাঁর আরেকটি রিপোর্টে প্রথম রিপোর্টের সত্যতা ও প্রভাব ম্লান হয়ে যায়। ১৯৭১ সালের ১৩ জুন সানডে টাইমসে 'হোয়াই দ্য রিফিউজিস ফ্লেড?' শিরোনামে মাসকারেনহাসের দ্বিতীয় রিপোর্টটি ফলাও করে প্রকাশিত হয়। ভারতের কারসাজিতে যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার আরো কয়েকটি পত্রিকায় এ রিপোর্টটি পুনর্মুদ্রিত হয়। ভারতীয়দের প্ররোচনায় জুনের গোড়ার দিকে মাসকারেনহাস সপরিবারে করাচি থেকে

www.pathagar.com

লন্ডনে পাড়ি জমান। পরবর্তীতে সানডে টাইমস পূর্ব পাকিস্তানে হিন্দুদের বিরুদ্ধে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কথিত গণহত্যা সম্পর্কে তাঁর বেশ কয়েকটি বিষোদগারমূলক রিপোর্ট প্রকাশ করে। বস্তুনিষ্ঠতার প্রলেপ দিতে ১৩ জুন প্রকাশিত একটি রিপোর্টে তিনি বাঙালি বিদ্রোহীদের হাতে অবাঙালি হত্যাকাণ্ডের বিবরণ দিতে গিয়ে লিখেছেন:

> 'বিহার থেকে প্রত্যাগত হাজার হাজার হতভাগ্য মুসলিম বিহারী পরিবারকে নির্মমভাবে নির্মূল করা হয়। মহিলাদের ধর্ষণ করা হয়। বিশেষ ধরনের ছোরা দিয়ে কারো কারো স্তন কেটে ফেলা হয়। এ বিভীষিকা থেকে শিশুরাও রক্ষা পায়নি। পিতামাতার সঙ্গে শিশুদের হত্যা করা হয়। হাজার হাজার লোকের চোখ উপড়ে ফেলা হয়। অনেকের অঙ্গহানি ঘটানো হয়। চট্টগ্রাম, খুলনা ও যশোরের মতো বড় বড় শহরে ২ লাখের বেশি অবাঙালির দেহ খুঁজে পাওয়া যায়। পূর্ব পাকিস্তানে আমি যেখানে গিয়েছি সেখানেই আমাকে জানানো হয়েছে, নিহতদের প্রকৃত সংখ্যা ১ লাখের কম নয়। হাজার হাজার অবাঙালির কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি। তবে পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ দ্বিতীয় পর্যায়ে ভয়াবহ অবাঙালি হত্যাযজ্ঞের উপাখ্যান চাপা দিয়ে রাখে। কেননা তখন তাদের নিজেদের সেনাবাহিনীও অনুরূপ হত্যাযজ্ঞে মেতে উঠেছিল। পশ্চিম পাকিস্তানি কর্মকর্তারা একান্ত ভাবে স্বীকার করেছেন যে, উভয়পক্ষের হাতে আড়াই লোক নিহত হয়েছে।'

পাকিস্তানি সাংবাদিকরা ১৯৭১ সালের এপ্রিলে এক পক্ষকাল সাবেক পূর্ব পাকিস্তান সফর করেন। পাকিস্তানি পত্র-পত্রিকায় তাঁদের সফরের রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। কিন্তু সরকারি নিষেধাজ্ঞা থাকায় তাঁদের রিপোর্টে পূর্ব পাকিস্তানে অবাঙালি গণহত্যার করুণ কাহিনী স্থান পায়নি। এপ্রিলের মাঝামাঝি আমার বেশ কিছু বন্ধু পূর্ব পাকিস্তান থেকে পালিয়ে করাচি এসে পৌঁছে। তাদের কাছ থেকে আমি চট্টগ্রামে আওয়ামী লীগ বিদ্রোহীদের হাতে অবাঙালি নিহত হওয়ার মর্মস্পর্শী বিবরণ শুনে হতবাক হয়ে যাই। ভদ্র ও বিনয়ী স্বভাবের জন্য আমি বরাবরই বাঙালিদের অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতাম। আমি বিশ্বাস করতে পারছিলাম না যে, বাঙালিরা এমন বর্বর গণহত্যা চালাতে পারে। খবর পাই যে, আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতা এম. আর. সিদ্দিকীর মতো লোকেরা চট্টগ্রামে অবাঙালি গণহত্যার জন্য দায়ী। বাঙালিদের মধ্যে আমার যারা বন্ধু ছিলেন এম. আর. সিদ্দিকীর শ্বশুর সাবেক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও জাতীয় পরিষদ সদস্য আবুল কাশেম খান ছিলেন তাঁদের অন্যতম। তাঁর অমায়িক ব্যক্তিত্ব এবং আন্তরিকতায় আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম। আমি চট্টগ্রামে বিদ্রোহীদের নৃশংসতা সম্পর্কে প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণের স্তূপের ওপর চোখ বুলাতে গিয়ে এম. আর. সিদ্দিকীকে 'চট্টগ্রামের কসাই' হিসেবে আখ্যা দানের কারণ বুঝতে পারলাম। তিনি আওয়ামী লীগের ঠাণ্ডা মাথায় হত্যাযজ্ঞে ঘৃতাহুতি দিয়েছিলেন।

একসময় কেন্দ্রীয় তথ্য মন্ত্রণালয়ে রদবদল ঘটে। এপ্রিলের তৃতীয় সপ্তাহে এ মন্ত্রণালয়ের সচিব হিসেবে বাঙালির পরিবর্তে একজন পশ্চিম পাকিস্তানিকে নিয়োগ দেয়া হয়। এসময় একদিন আমাকে মন্ত্রণালয়ে ডেকে ওয়াশিংটনে পাকিস্তান দূতাবাসে প্রেষণে নিযুক্তির জন্য যাত্রা করতে এবং আমেরিকার জনগণের কাছে পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণের যৌক্তিকতা তুলে ধরার অনুরোধ করা হয়। পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক অপারেশনে কথিত নৃশংসতার জন্য যুক্তরাষ্ট্রে ভারতের সুসংগঠিত প্রচার যন্ত্র এবং ভারতীয় লবি পাকিস্তান ও পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ভাবমূর্তি ধ্বংসে সর্বশক্তি প্রয়োগ করছিল।

www.pathagar.com

২৬ মার্চ যেসব আমেরিকান সাংবাদিককে ঢাকা থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল, তাঁদের অব্যাহত বৈরিতায় যুক্তরাষ্ট্রে পাকিস্তানের গণসংযোগে জটিলতা তৈরি হয়। আমি ক্যাপিটল হীলে একজন বন্ধুভাবাপন্ন মার্কিন সিনেটরের সঙ্গে আলাপ করি। আমি তাঁকে আওয়ামী লীগের বিদ্রোহে পূর্ব পাকিস্তানে ১৯৭১ সালের মার্চে ১ লাখ অবাঙালি নিহত হওয়ার কথা অবহিত করলে তিনি আমার দিকে অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তাকান। তিনি যথার্থভাবে বললেন, 'তাহলে মার্চে পত্র-পত্রিকায় এ হত্যাকাণ্ডের সংবাদ প্রকাশিত হলো না কেন?' এপ্রিলের শেষদিকে ওয়াশিংটনে পাকিস্তান দূতাবাস পূর্ব পাকিস্তানে কেন্দ্রীয় সরকারের সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণের আদ্যোপান্ত বিবরণ দিয়ে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করে। এ পুস্তিকায় ১৯৭১ সালের মার্চে পশ্চিম পাকিস্তানি, বিহারী ও অন্যান্য অবাঙালির বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগের সহিংসতার ওপর আলোকপাত করা হয়। আমেরিকানদের মধ্যে এ পুস্তিকা বিতরণ করা হলে তাৎক্ষণিকভাবে বহু মার্কিন আইন প্রণেতা ও শিক্ষাবিদ পাকিস্তান দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করে বিহারী শব্দটির অর্থ এবং তাদের জাতিগত পরিচয় জানতে চান।

১৯৭১ সালের ৬ মে নিউইয়র্ক টাইমস, রয়টার্স, এসোসিয়েটেড প্রেস, টাইম ম্যাগাজিন, লন্ডনের ফিনান্সিয়াল টাইমস এবং নিউ চায়না নিউজ এজেন্সীর (সিনহুয়া) ৬ জন বিদেশি সাংবাদিকের একটি গ্রুপ ঢাকা গিয়ে পৌঁছান এবং তাঁরা পূর্ব পাকিস্তানের বিদ্রোহ কবলিত ক্ষতিগ্রস্ত কয়েকটি এলাকা ব্যাপকভাবে সফর করেন। পূর্ব পাকিস্তান থেকে প্রেরিত তাঁদের সেন্সরবিহীন রিপোর্টে ১৯৭১ সালের মার্চ-এপ্রিলে বাঙালি বিদ্রোহীদের হাতে ব্যাপক হত্যাকাণ্ডের চিত্র ফুটে উঠে এবং তাদের রিপোর্টে বিদ্রোহীদের নিষ্ঠুরতা সম্পর্কে প্রত্যক্ষদর্শী এবং ভুক্তভোগীদের বর্ণনা উল্লেখ করা হয়। পাকিস্তান দূতাবাস ১৯৭১ সালে মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে তাৎক্ষণিকভাবে পূর্ব পাকিস্তান সফররত বিদেশি সাংবাদিকদের কাছে ঘটনাস্থল থেকে প্রেরিত সংবাদ সম্বলিত একটি পুস্তিকা প্রকাশ ও বিতরণ করে। বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সমর্থক আমেরিকান, ভারতীয় ও বাঙালিরা বিদেশি সাংবাদিকদের সততা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করে বলেন, বিদেশি সাংবাদিকদের যেসব কবর দেখানো হয়েছে সেগুলো অবাঙালিদের নয়। বিচ্ছিন্নতাবাদীরা দাবি করছিল যে, কবরগুলো আসলে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর হাতে নিহত বাঙালিদের।

নয়াদিল্লিতে ভারতীয় অপপ্রচারকারীরা বিদেশি সাংবাদিকদের কাছে পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ধ্বংসযজ্ঞের প্রমাণ হিসেবে ভস্মীভূত ঘরবাড়ি ও বিধ্বস্ত হাট-বাজারের ছবি বিতরণ করে। প্রকৃত ঘটনা ছিল ভিন্ন। বাস্তবে অবাঙালিদের বিরুদ্ধে লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগ ও হত্যাযজ্ঞ চালানোর সময় উন্নত অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত বাঙালি বিদ্রোহীরা এসব ধ্বংস সাধন করেছিল। কয়েকটি ছবি ছিল মহিলার। দাবি করা হচ্ছিল যে, ছবিগুলো পাকিস্তান সেনাবাহিনীর হাতে ধর্ষিতা বাঙালি মহিলাদের। কিন্তু ছবির মহিলাদের পোশাক ও শারীরিক বৈশিষ্ট্যের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালে দেখা যেতো যে, তারা ছিল পশ্চিম পাকিস্তানি মহিলা, বাঙালি নয়।

যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিম ইউরোপে ভারতীয় প্রচারণা সংস্থা এবং এ সংস্থার অঙ্গসংঠনগুলো লাখ লাখ বাঙালিকে পাইকারী হত্যা, বাঙালি হিন্দুদের গণহত্যা এবং ২ লাখ বাঙালি মহিলাকে ধর্ষণের জন্য পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে অভিযুক্ত করে বিপুল সংখ্যক বই, পুস্তক

www.pathagar.com

ও প্রচারপত্র বিলি করে। ভারতীয় প্রচারণামূলক পুস্তিকাগুলোয় পশ্চিম পাকিস্তানিদের চীনের অসভ্য হূন জাতি এবং হিটলারের ঘৃণিত নাৎসিদের চেয়ে ভয়ংকর গণহত্যাকারী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। ভারতীয় অপপ্রচার এত জোরালো ও সর্বব্যাপী ছিল যে, ১৯৭১ সালের মার্চ-এপ্রিলে সংঘটিত অবাঙালি গণহত্যা একটি গুরুত্বহীন ঘটনা এবং বিস্মৃত ইতিহাসে রূপান্তরিত হয়।

পাকিস্তান সরকার ১৯৭১ সালের আগস্টে পূর্ব পাকিস্তান সংকটের ওপর একটি শ্বেতপত্র প্রকাশ করে। এ শ্বেতপত্র কোনো তাৎপর্যপূর্ণ আন্তর্জাতিক প্রভাব বিস্তারে ব্যর্থ হয়। শ্বেতপত্র প্রকাশে অহেতুক বিলম্ব করা হয় এবং অবাঙালি গণহত্যার একটি অস্পষ্ট ও হতাশাব্যঞ্জক বর্ণনা দেয়া হয়।

১৯৭১ সালের মার্চ-এপ্রিলে আওয়ামী লীগ সমর্থক ও অন্য বিদ্রোহীরা কয়েক ডজন জায়গায় হাজার হাজার অবাঙালিকে হত্যা করে। কিন্তু শ্বেতপত্রে তা উল্লেখ করা হয়নি। পাকিস্তান সরকার বিহারী হত্যাকাণ্ডে আওয়ামী লীগের ঘৃণ্য ভূমিকার বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক জনমত গঠনে চরম ব্যর্থতার পরিচয় দেয়। ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও ১৯৭১ সালে এপ্রিলের আগে এ শ্বেতপত্র প্রকাশ করা হলে তা আরো কার্যকর প্রভাব রাখতে এবং বিদেশি পাঠকরা আওয়ামী লীগের বর্ণবাদী জাতিগত শুদ্ধি অভিযানের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠতে পারতো।

মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধে সময় একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। বিশেষ করে সত্য ও ন্যায়নীতির প্রতি শ্রদ্ধা নেই এমন কোনো অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সময়ের গুরুত্ব অপরিসীম। ১৯৭১ সালের আগস্ট নাগাদ ভারত শরণার্থীদের সংখ্যা ফাপিয়ে ফুলিয়ে প্রচার করায় এবং পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে অভিযুক্ত করে আন্তর্জাতিক জনমতকে বিষিয়ে তোলায় আমাদের শ্বেতপত্রে উল্লেখিত শরণার্থীদের সংখ্যা বিশ্বাসযোগ্য বলে প্রতীয়মান হয়নি। শুধু তাই নয়, এ শ্বেতপত্র পাকিস্তান ও পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ভাবমূর্তি ধ্বংসে ভারতের প্রচারিত অগণিত পুস্তিকা ও প্রচারপত্রের প্রভাবও প্রতিহত করতে পারেনি। পূর্ব পাকিস্তানে স্বাভাবিকতা পুনঃপ্রতিষ্ঠার ওপর কেন্দ্রীয় তথ্য মন্ত্রণালয়ের প্রামাণ্য চিত্র নির্মাণ ছিল একটি সময়োচিত পদক্ষেপ। এপ্রিলের দ্বিতীয়ার্ধে এ প্রামাণ্য চিত্র নির্মাণ করা হয় এবং মে মাসে তা বিদেশে পাকিস্তানি মিশনগুলোতে প্রেরণ করা হয়। বিদেশে খুব স্বল্পসংখ্যক দর্শক ও শ্রোতা এ প্রামাণ্য চিত্র দেখেছিল। পর্যাপ্ত তহবিল পাওয়া গেলে এ প্রামাণ্য চিত্র যুক্তরাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ টেলিভিশন নেটওয়ার্কগুলোতে প্রদর্শন করা যেতো। প্রামাণ্য চিত্রে বিদ্রোহীদের হাতে ভস্মীভূত ঘরবাড়ি ও দোকানপাটের ধ্বংসস্তূপ দেখানো হয়। কিন্তু এতে হাজার হাজার অবাঙালি নিধনে ১৯৭১ সালের মার্চে বিদ্রোহীদের পরিচালিত কসাইখানা ও নির্যাতন চালানোর সেলগুলোর পক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ দেয়া হয়নি। আওয়ামী লীগের বর্বর গণহত্যা এবং গণহত্যার ভয়াবহ চিত্র পুরোপুরি প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি।

১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বরে পাকিস্তান পিপলস্ পার্টির চেয়ারম্যান জুলফিকার আলী ভুট্টোর লেখা 'দ্য গ্রেট ট্রাজেডি' নামে একটি বই প্রকাশিত হয়। বইটিতে পূর্ব পাকিস্তান সংকটের উৎপত্তি, আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের বিচ্ছিন্নতাবাদী উচ্চাকাঙ্ক্ষা, ১৯৭১ সালের মার্চের তৃতীয় সপ্তাহে ঢাকায় সাংবিধানিক আলোচনায় শেখ মুজিবুর রহমানের অনমনীয় ও আপোসহীন অবস্থান এবং একটি একক ও ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তানের কাঠামোর আওতায় দু'টি

www.pathagar.com

অংশে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনকারী দলগুলোর সমন্বয়ে একটি মহাজোট গঠনে পাকিস্তান পিপলস্ পার্টির প্রচেষ্টা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়। সাংবিধানিক কাঠামোর প্রতি ভুট্টোর সমর্থন এবং তার দলের ভূমিকা ছিল জোরালো ও যৌক্তিক। বিশ্বব্যাপী ব্যাপকভাবে 'দ্য গ্রেট ট্রাজেডি' প্রচার করা প্রয়োজন ছিল। আমাদের দুর্ভাগ্য, বইটি প্রচারে বাধা দেয়া হয়।

১৯৭১ সালে নভেম্বরের শেষদিকে যুক্তরাষ্ট্র থেকে ফিরে আসার পর আমি ইসলামাবাদে ক্ষমতাসীন জেনারেলদের সঙ্গে ১৯৭১ সালের মার্চ-এপ্রিলে আওয়ামী লীগের হলোকাস্ট থেকে রক্ষা পাওয়া অবাঙালি প্রত্যক্ষদর্শীদের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে একটি বই প্রকাশ এবং প্রচারের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা করি। আমি জানতে পারি যে, প্রত্যক্ষদর্শীদের কিছু বিশ্বস্ত সাক্ষ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। কিন্তু জেনারেলগণ পূর্ব পাকিস্তানে ভারতের দৃশ্যত আগ্রাসন এবং ভারতের সঙ্গে একটি সর্বাত্মক যুদ্ধের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। ১৯৭২ সালের গোড়ার দিকে আমি পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত বেশ কয়েকজন অবাঙালির সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। এসব অবাঙালি করাচির ঔরঙ্গি বস্তিতে বাস করছিল। আওয়ামী লীগের রক্তাক্ত বিদ্রোহকালে পূর্ব পাকিস্তানে তাদের সীমাহীন দুর্ভোগের বিবরণ শুনে আমি বিচলিত হয়ে পড়ি এবং দেশের পূর্বাংশে অবাঙালি জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে পরিচালিত গণহত্যা আঁচ করতে পারি। তাদের সাক্ষ্য থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, আওয়ামী লীগ, ইপিআর ও ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের বিদ্রোহীরা প্রথম নির্দোষ অবাঙালি হত্যাকাণ্ডে মেতে উঠে এবং ক্ষমতার জন্য আওয়ামী লীগের উদগ্র আকাঙ্ক্ষা থেকে ১৯৭১ সালের মার্চ-এপ্রিলে পূর্ব পাকিস্তানে রক্তগঙ্গা বয়ে যায়। তাদের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে আমি একটি বই লিখার কথা ভাবছিলাম। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের সব শহরের পর্যাপ্ত সাক্ষী আমার ছিল না। সেখানকার প্রায় প্রত্যেকটি শহরের অবাঙালি সম্প্রদায়কে হয়তো পুরোপরি নয়তো আংশিক নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হয়।

ইতোমধ্যে আমি 'মিশন টু ওয়াশিংটন' শিরোনামে আরেকটি বই লিখতে শুরু করেছিলাম। পাকিস্তানের ব্যবচ্ছেদ ঘটানোর লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্রে ভারতের চক্রান্ত উদ্ঘাটন করাই ছিল আমার এ বইটি লিখার উদ্দেশ্য। আমার ব্যক্তিগত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আমি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে মার্কিন জনমতকে ক্ষেপিয়ে তুলতে এবং পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনীর কাছে আমেরিকার সামরিক সহায়তা বন্ধে যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয় লবি এবং তাদের সহযোগীদের অশুভ তৎপরতার বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরেছি। ১৯৭৩ সালের জানুয়ারিতে 'মিশন টু ওয়াশিংটন' প্রকাশিত হয়।

সুপরিচিত ব্রিটিশ সাংবাদিক ও লেখক অধ্যাপক রাশব্রুক উইলিয়াম 'দি ইস্ট পাকিস্তান ট্রাজেডি' শিরোনামে একটি বই লিখেছেন। ১৯৭৩ সালে প্রকাশিত এ বইয়ে পূর্ব পাকিস্তান সংকটের রাজনৈতিক দিকগুলো অত্যন্ত হাল্কাভাবে আলোচনা করা হয় এবং ভাসা ভাসাভাবে পাকিস্তানের যুক্তিগুলো ব্যাখ্যা করা হয়। মেজর জেনারেল ফজল মুকিম খান লিখেছেন 'লীডারশীপ ইন ক্রাইসিস।' তার বইটিও ১৯৭৩ সালে প্রকাশিত হয়। এ বইয়ে পূর্ব পাকিস্তান সংকটের রাজনৈতিক-সামরিক দিক, বাঙালি বিচ্ছিন্নতাবাদী বিদ্রোহীদের ভারতের সামরিক ও অর্থনৈতিক সহায়তা প্রদান এবং ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে ভারতের সঙ্গে বিপর্যয়কর যুদ্ধ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

১৯৭১ সালের মার্চে অবাঙালিদের রক্তপাত শুরু হওয়ার পর থেকে ভারতের

www.pathagar.com

পাকিস্তান বিরোধী অপপ্রচার চলতে থাকে। কিন্তু দেশটির অপপ্রচারের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের জবাব ছিল দুঃখজনকভাবে দুর্বল ও অপর্যাপ্ত। ১৯৭৩ সালের গ্রীষ্ম ও শরৎকালে আমি ব্যাপকভাবে মধ্যপ্রাচ্য, পশ্চিম ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্র সফর করি। সফরকালে আমি বিদেশি বই বিক্রির দোকানগুলোতে পাকিস্তান ও পাকিস্তানের চমৎকার সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে অমযার্দাকর বেশ কয়েকটি বই দেখতে পাই। এসবের মধ্যে আমি দু'টি বই পড়ে ক্রোধান্বিত ও উত্তেজিত হই। একটি বই ছিল ভারতীয় মেজর জেনারেল ডি. কে. পালিতের 'দ্য লাইটিং ক্যাম্পেইন।' বইটিতে তিনি পূর্ব পাকিস্তানে মোতায়েন পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে অপবাদ দিয়েছেন। আরেকটি বই ছিল ওলগা ওলসনের 'ডক্টর (Doktor)।' তিনি ১৯৭১ সালে সেনাবাহিনীর অভিযানকালে বাঙালিদের দুর্ভোগকে অতিরঞ্জিত করেছেন। আমি বাংলাদেশের মোটা কলেবরের দু'টি দলিলের ওপর চোখ বুলাই। বাংলাদেশ সংক্রান্ত এ দু'টি দলিল ভারত সরকার যুক্তরাষ্ট্রে বিতরণ করেছিল। দলিল দু'টিতে ভারতকে শান্তির অবতার হিসেবে চিত্রিত করা হয়। দেশটি যেন পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কথিত লাম্পট্য ও বর্বরতার বিরুদ্ধে মিশন সদৃশ দায়িত্ব পালন করেছিল এবং চরম ধৈর্যের পরিচয় দিচ্ছিল। আমি বিদেশের এসব বুকস্টলে ১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তানে অসহায় বিহারী ও অন্যান্য অবাঙালির বিরুদ্ধে বাঙালি বিদ্রোহীদের নৃশংসতার ওপর কোনো বই দেখতে পাইনি। ১৯৭৩ সালের শরৎকাল নাগাদ যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিম ইউরোপে সাধারণ ধারণা ছিল এ রকম যেন ১৯৭১ সালে বিহারীরা পূর্ব পাকিস্তানে অপারেশনে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সঙ্গে যোগদান করেছিল এবং ১৯৭১ সালে ডিসেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পরাজয়ের পর বিহারীদের ওপর বাঙালিদের প্রতিশোধমূলক হামলা চালানোর বৈধ অধিকার ছিল।

মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকজন রাজনীতিবিদ ও সাংবাদিক পাকিস্তানের প্রতি আন্তরিকতা সত্ত্বেও তারা আমার কাছে জানতে চান পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কথিত নিষ্ঠুরতার যে কাহিনী তারা পাঠ করেছেন তা সঠিক কিনা এবং নিষ্ঠুরতা পাকিস্তানিদের মজ্জাগত বৈশিষ্ট্য ও স্বভাব কিনা। আমাদের বিশ্বাসের অনুসারী ও বন্ধুদের মনে জাতি হিসেবে পাকিস্তানিদের প্রতি অশ্রদ্ধা সৃষ্টিতে ভারতীয়দের ঘৃণ্য প্রচারণায় আমি ব্যথিত হই।

১৯৭৩ সালের সেপ্টেম্বরের শেষদিকে সিমলা চুক্তির আওতায় পাকিস্তানে বসবাসকারী বাঙালিদের সঙ্গে বাংলাদেশে অবস্থানরত পাকিস্তানিদের বিনিময় এবং ভারত থেকে পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দিদের প্রত্যাবর্তন শুরু হয়। করাচির ঔরঙ্গিতে পূর্ব পাকিস্তানের যুদ্ধবিধ্বস্ত লোকদের পুনর্বাসন ও ত্রাণ কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে আমি প্রত্যাবর্তনকারী শত শত অবাঙালি নারী-পুরুষ ও শিশুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। তাদের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে আমার ধারণা হয়েছিল যে, ১৯৭১ সালের মার্চ-এপ্রিলে অবাঙালিদের প্রাণহানির সংখ্যা ৫ লাখের কাছাকাছি। ১৯৭১ সালের মার্চে আওয়ামী লীগের বিদ্রোহকালে এবং ডিসেম্বরে ভারতের সশস্ত্র হস্তক্ষেপে ঢাকার পতন ঘটার পর অবাঙালিদের সীমাহীন দুর্ভোগের মর্মস্পর্শী বিবরণ শুনে স্তম্ভিত হয়ে যাই। তখনি আমি সিদ্ধান্ত নেই যে, পূর্ব পাকিস্তানে অসহায় অবাঙালি ও দেশপ্রেমিক পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে পরিচালিত লোমহর্ষক গণহত্যা ও নৃশংসতার পূর্ণাঙ্গ কাহিনী বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরবো। তারপর এ বইটি লিখি।

www.pathagar.com

৫ হাজার প্রত্যাবর্তনকারী অবাঙালি পরিবারের মধ্য থেকে কিছু লোককে বাছাই করি। এ বইটিতে এরূপ বাছাই করা ১৭২ জন প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ সন্নিবেশ করা হয়েছে। যাচাই-বাছাই করে আমি পূর্ব পাকিস্তানের ৫৫টি শহর বেছে নেই। এসব শহরে ১৯৭১ সালের মার্চ এবং এপ্রিলের গোড়ার দিকে অবাঙালি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল ব্যাপক। ১৯৭৪ সালের জানুয়ারিতে প্রত্যক্ষদর্শীদের সাক্ষ্য সংগ্রহ এবং সংকলনের কাজ শুরু হয় এবং ১২ সপ্তাহে তা শেষ হয়। পূর্ব পাকিস্তানের ৫৫টি শহরের সাক্ষীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণে ৪ জন রিপোর্টারের একটি টিম নিয়োগ করা হয়। এসব রিপোর্টার সাক্ষীদের সাক্ষ্য গ্রহণে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে কাজ করেছেন। ভুক্তভোগীরা তাদের বিধ্বস্ত জীবনের অবর্ণনীয় দুর্দশার করুণ কাহিনী বলতে গিয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়তো। তাতে অনেকের সাক্ষাৎকার গ্রহণে সময় লাগতো বেশি। ১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে আমি সাক্ষ্য গ্রহণে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেই। আমার আবেদনে তাৎক্ষণিক শত শত লোক সাড়া দেয়ায় আমি তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ।

একটি গুছানো প্রফরমায় প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবৃতি ও সাক্ষাৎকার রেকর্ড করা হয় এবং তাতে তাদের স্বাক্ষর গ্রহণ করা হয়। প্রত্যক্ষদর্শী বাছাইয়ে আমি তাদের পটভূমি, নির্ভরশীলতা এবং বিশ্বস্ততার সঙ্গে হত্যাযজ্ঞের বর্ণনা প্রদানে উপযুক্ততা মূল্যায়ন করেছি। আমি সে সময়ের হাজার হাজার রেকর্ড, দলিলপত্র এবং বিদেশি ও পাকিস্তানি পত্র-পত্রিকার সংবাদের ওপর চোখ বুলিয়েছি। এ বইটিতে ১৯৭১ সালের মার্চ-এপ্রিলে সংঘটিত বিভীষিকাময় নীরব গণহত্যার প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণের ওপর জোর দেয়ার পাশাপাশি আমি ডিসেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে পূর্ব পাকিস্তানে ভারতীয় দখলদারিত্ব কায়েম হওয়ার পর অবাঙালি ও পাকিস্তানপন্থী বাঙালিদের ওপর মুক্তিবাহিনীর সন্ত্রাস ও সহিংসতার সাক্ষ্যও অন্তর্ভুক্ত করেছি। এ নিয়ে আরেকটি বই লিখা যায়।

আমি বহু লোকের সাক্ষ্য গ্রহণ করেছি। কিন্তু সবার সাক্ষ্য বইটিতে ঠাঁই দিতে পারিনি। তাই তাদের কাছে ক্ষমা চাই। বইটির সীমিত কলেবরের কথা বিবেচনা করা ছাড়াও আরেকটি কারণে কিছু সাক্ষীকে বাদ দিতে হয়েছে। আমি এ বইয়ে যাদের সাক্ষ্য সংযোজন করেছি তাদের মধ্যে এমন পিতা-মাতা আছেন যারা তাদের সন্তানকে খুন হতে দেখেছেন, এমন স্ত্রী রয়েছেন যাকে তার স্বামীকে হত্যা করার দৃশ্য দেখতে বাধ্য করা হয়েছিল এবং এমন তরুণী রয়েছে যাকে অপহরণ ও ধর্ষণ করা হয়েছিল কিংবা সে বিদ্রোহী নিয়ন্ত্রিত কসাইখানা থেকে পালিয়ে এসেছিল। সাক্ষী বাছাই করার সময় আমি একথাও বিবেচনা করেছি যাতে বাংলাদেশে তাদের কোনো আত্মীয়-স্বজন অবশিষ্ট না থাকে।

বহু বাঙালি নিজের জীবন বিপন্ন করে তার প্রতিবেশী অবাঙালিকে রক্ষা এবং আশ্রয় দিয়েছেন। আমি আমার বইয়ে এসব বাঙালির মহৎ আদর্শ এবং সাহসিকতার প্রশংসা করেছি। আমি প্রত্যক্ষদর্শীদের সাক্ষ্য পরীক্ষা ও বিশ্লেষণ করেছি। এসব সাক্ষ্যের ভিত্তিতে আমি দৃঢ়প্রত্যয়ের সঙ্গে বলতে পারি যে, অবাঙালি নিধনে সংখ্যগরিষ্ঠ বাঙালির কোনো সাঁয় ছিল না। তারা কোনো পক্ষও ছিল না। পূর্ব পাকিস্তানের বিচ্ছিন্নতায় বদ্ধপরিকর একটি সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর ক্ষমতা ও অস্ত্রের সামনে সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালিরা ছিল জিম্মি, নিষ্ক্রিয় ও নীরব। আমি আমার সকল আন্তরিকতা ও শক্তি দিয়ে জোর গলায় বলতে পারি যে, জাতি

www.pathagar.com

হিসেবে বাঙালিদের বর্ণবাদী হিসেবে অভিযুক্ত করা আমার উদ্দেশ্য নয়। বইটি লিখা এবং প্রকাশ করার সময় আমার সে রকম কোনো চিন্তা ছিল না। আমার একসময়ের স্বদেশবাসী বাঙালি ভাইদের নিন্দা করার কোনো ইচ্ছা আমার মধ্যে কাজ করেনি। পাকিস্তানের প্রতি আনুগত্যের জন্য বাংলাদেশের কারাগারে শত শত অনুগত বাঙালি সীমাহীন যন্ত্রণা ভোগ করেছেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় পূর্ববঙ্গের মুসলমানরাই অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল। নাৎসিদের পাপের জন্য মহান জার্মান জাতিকে অভিযুক্ত করা যেমন অন্যায়, তেমনি আওয়ামী লীগের জঙ্গি সমর্থক ও তাদের সহযোগীদের অন্যায় কাজের জন্য গোটা বাঙালি জাতিকে অভিযুক্ত করাও সমান অন্যায়। জাতি হিসেবে বাঙালিদের প্রতি আমার অগাধ শ্রদ্ধা। ১৯৭০-৭১ সালের শীতকালে সিন্ধু প্রশাসনের ত্রাণ কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে পূর্ব পাকিস্তানের ঘূর্ণিদুর্গত মানুষের কাছে এক কোটি রুপির ত্রাণ সামগ্রী পৌঁছাতে আমাকে কয়েক মাস অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হয়েছে। বইটি প্রকাশিত হওয়ার সময় সকল বাঙালি পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করায় তাদের ওপর কোনো ধরনের প্রতিশোধ গ্রহণের আশংকা ছিল না।

সময় একটি উত্তম উপশমকারী। আমি সর্বশক্তিমান আল্লাহর কাছে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি তিনি যেন পাকিস্তান ও বাংলাদেশের মুসলমানদের বৈষয়িকভাবে সম্ভব না হলেও হৃদয় ও মনের দিক দিয়ে পুনরায় ঐক্যবদ্ধ করে দেন। বাঙালি মুসলমানদের মানসিকতা ও তাদের সামাজিকতা সম্পর্কে যতদূর জানি তাতে আমি সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করি পৃথিবীর কোনো শক্তি স্থায়ীভাবে তাদের ইসলামী পরিচিতি মুছে ফেলতে পারবে না। ১৯৭১ সালের ট্রাজেডি সত্ত্বেও তারা বিশ্ব মুসলিম ভ্রাতৃত্বের মূল স্রোতের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বহাল থাকবে।

বিহারী ও অন্যান্য অবাঙালিরা পাকিস্তানে প্রত্যাবর্তন করেছে। তাদের পুনর্বাসন এবং রক্ষা করা আমাদের নৈতিক ও সামাজিক দায়িত্ব। তাদের পিতা-মাতা অথবা সন্তান পাকিস্তানের আদর্শের প্রতি অনুগত থাকায় তাদেরকে দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে এবং পাকিস্তান রক্ষায় তাদেরকে রক্ত দিতে হয়েছে। এ বিপর্যয় তাদের নিজেদের সৃষ্ট না হওয়ায় তারা আমাদের সহানুভূতি ও সহমর্মিতা এবং ক্ষত-বিক্ষত জীবন পুনরুদ্ধারে আমাদের সমর্থন পাওয়ার পূর্ণ দাবিদার। 'ব্লাড এন্ড টীয়ার্স-এ এসব হতভাগ্য মানুষের দুর্দশা উপস্থাপন এবং তাদের ভয়াবহ যন্ত্রণার স্মৃতি চিত্রায়নে আমি মানবিক বিবেচনা ও মানবিক আবেগে তাড়িত হয়েছি। সত্যি তাদের উপাখ্যান অতি করুণ এবং তাদের বেদনা অব্যক্ত। এ বইটি হচ্ছে নিকট অতীতে তাদের অসহনীয় যাতনা এবং তাদের হৃদয়ে বয়ে বেড়ানো ক্ষতের একটি চিত্র। ১৯৭১ সালে রক্তঝরা মার্চে অবাঙালিদের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগ পরিচালিত গণহত্যার সময় পূর্ব পাকিস্তানে যে রক্তস্রোত ও অশ্রুধারা প্রবাহিত হয়েছে এবং ভারতের হাতে আমাদের দেশের পূর্বাংশের ব্যবচ্ছেদ ঘটায় অনাগত ভবিষ্যতে আমাদেরকে আরো যে অশ্রুপাত করতে হবে 'ব্লাড এন্ড টীয়ার্স' হচ্ছে সে রক্ত ও অশ্রুর একটি স্বাক্ষর।

৩০ মে, ১৯৭৪ কুতুবউদ্দিন আজিজ
করাচি

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রথম অধ্যায়

মার্চে ঢাকায় হত্যাযজ্ঞ

আওয়ামী লীগ ১৯৭১ সালের ১ থেকে ২৫ মার্চ পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকাকে কুক্ষিগত করে রাখে। লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগ ও নরহত্যার এ ধূসর দিনগুলোতে আওয়ামী লীগ ও তাদের সহযোগীদের হাতে এ মহানগরীতে ৫ হাজারের বেশি অবাঙালি নিহত হয়। ১৯৭১ সালে মার্চের কয়েক মাস আগে আওয়ামী লীগের কট্টর নেতৃত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃত্বের সঙ্গে সংঘাতে যেতে তাদের অস্ত্রে শান দিতে থাকে। আওয়ামী লীগের অনলবর্ষী বক্তাগণ পশ্চিম পাকিস্তানি, বিহারী ও অন্যান্য অবাঙালির বিরুদ্ধে ঘৃণায় তাদের গোঁড়া অনুসারীদের মন বিষিয়ে তোলে। তারা বাঙালি জাতীয়তাবাদের একটি বর্ণবাদী ও বর্ণবিদ্বেষী চেতনা জাগিয়ে তোলে। পাকিস্তানি জাতিসত্তা থেকে পৃথক হয়ে যাওয়া ছিল তাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য।

১৯৭১ সালের ১ মার্চ ৩ মার্চ আহুত জাতীয় পরিষদের অধিবেশন সাময়িকভাবে স্থগিতে জেনারেল ইয়াহিয়া খানের ঘোষণার এক ঘন্টার মধ্যে শেখ মুজিবুর রহমান কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের প্রথম গোলাবর্ষণ করেন। ঢাকায় তাৎক্ষণিক এক সংবাদ সম্মেলনে প্রশাসনকে অচল করে দিতে এবং পূর্ব পাকিস্তানে আইনসঙ্গতভাবে প্রতিষ্ঠিত সরকারের কর্তৃত্ব দখলে প্রাদেশিক রাজধানীতে সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দেন। তিনি দলের জঙ্গি সমর্থকদের সবুজ সংকেত দেয়ায় আওয়ামী লীগের কর্মীরা গোটা শহরে ভাঙচুর, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ ও হত্যাযজ্ঞে মেতে উঠে। তারা নারায়ণগঞ্জ শিল্প এলাকায় রাইফেল ক্লাব থেকে অস্ত্র ও গোলবারুদ লুট করে। তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইকবাল ও জগন্নাথ হলকে তাদের সন্ত্রাসের রাজত্বের ঘাঁটিতে রূপান্তরিত করে। ২ মার্চ আওয়ামী লীগের জঙ্গি সমর্থকরা নিউমার্কেট ও বায়তুল মোকাররমের অস্ত্র দোকানগুলো থেকে অস্ত্র ও গোলাবারুদ লুট করে। তারা এসব অস্ত্র ট্রাকে করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে নিয়ে যায়। সেখানে ছাত্ররা একটি উন্মুক্ত ফায়ারিং রেঞ্জে অস্ত্র চালনার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। বন্দুক, ছোরা, লোহার রড ও লাঠি সজ্জিত উন্মত্ত জনতা স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়াতো এবং অবাঙালিদের মালিকানাধীন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, দোকানপাট ও সিনেমা হল লুট করতো। ঢাকায় আওয়ামী লীগের সন্ত্রাস ও নৈরাজ্য দমনে প্রাদেশিক সরকার সহায়তার জন্য ঢাকা সেনানিবাস থেকে সেনাবাহিনী তলবে বাধ্য হয়। আওয়ামী লীগের জঙ্গিরা সকাল-সন্ধ্যা কারফিউ অমান্য করতে বাঙালি জনতাকে প্ররোচিত করে। ঢাকার সদরঘাটে একদল বিক্ষুব্ধ জনতা সেনাবাহিনীর একটি ইউনিটের ওপর হামলা চালালে ৬ জন নিহত হয়। উন্মত্ত জনতার হামলা থেকে সেনাবাহিনী ঢাকা টিভি স্টেশন রক্ষা করে।

www.pathagar.com

৩ মার্চ প্রদেশব্যাপী আওয়ামী লীগ আহুত সাধারণ ধর্মঘটে ঢাকার জীবনযাত্রা অচল হয়ে পড়ে। আওয়ামী লীগের সশস্ত্র কর্মীদের নেতৃত্বে উন্মত্ত জনতা ঢাকার নবাবপুর, ইসলামপুর ও পাটুয়াটুলির মতো জায়গায় হাজার হাজার অবাঙালির বাড়িঘরে লুটপাট, অগ্নিসংযোগ ও হত্যাকাণ্ড চালায়। জিন্নাহ এভিনিউতে অবাঙালি মালিকানাধীন বহু দোকানপাট লুট করা হয়। শহরের উপকণ্ঠে একটি বস্তিতে অবাঙালিদের ৫০টি ঘর পুড়িয়ে দেয়া হয় এবং তাদের অনেকে জীবন্ত দগ্ধ হয়। গুণ্ডা-পাণ্ডারা অবস্থাপন্ন অবাঙালিদের অপহরণ করতে শুরু করে এবং তাদের আত্মীয়-স্বজনদের কাছ থেকে মুক্তিপণ আদায় করতে থাকে। আওয়ামী লীগ হাইকমান্ডের নির্দেশে ঢাকায় টেলিভিশন ও রেডিও স্টেশনে পাকিস্তানের জাতীয় সঙ্গীতের পরিবর্তে বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত 'আমার সোনার বাংলা' বাজানো হয়। শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকায় গোটা পূর্ব পাকিস্তানে আইন অমান্য করার ডাক দেন। আইন অমান্য আন্দোলন ছিল বিদ্রোহের শামিল। তিন দিনের মধ্যে আওয়ামী লীগ সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েমে সফল হয়। সন্ত্রাসবাদী তৎপরতার মূল লক্ষ্য ছিল সশস্ত্র পন্থায় গোটা প্রদেশের নিয়ন্ত্রণ লাভে কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃত্ব খর্ব এবং অবাঙালি জনগোষ্ঠীকে নির্মূল করা। আওয়ামী লীগ হাইকমান্ডের নির্দেশে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যকার টেলিযোগাযোগ এবং বিমান চলাচল বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয়।

৪ থেকে ১০ মার্চ পর্যন্ত আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে উন্মত্ত জনতা অবাঙালিদের ঘরবাড়ি ও দোকানপাট লুট এবং অগ্নিসংযোগ করে। মুক্তিপণ আদায়ে ধনী পশ্চিম পাকিস্তানিদের অপহরণ করা হয়। ৬ মার্চ ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগার ভেঙ্গে ৩৪১জন কয়েদী পালিয়ে গিয়ে আওয়ামী লীগের জঙ্গি সমর্থকদের সঙ্গে যোগ দেয়। জঙ্গি ছাত্ররা ঢাকার প্রধান প্রধান সড়কগুলো প্রদক্ষিণ করে। মলোটভ ককটেল এবং অন্যান্য দেশীয় বোমা তৈরির উদ্দেশ্যে আওয়ামী লীগ ও ছাত্র লীগের সশস্ত্র ক্যাডাররা ঢাকার সায়েন্স ল্যাবরেটরী ও পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট থেকে রাসায়নিক বিস্ফোরক লুট করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সলিমুল্লাহ হলের উচ্ছৃঙ্খল ছাত্ররা ঢাকায় ব্রিটিশ কাউন্সিল অফিসে অগ্নিসংযোগ করার চেষ্টা করে। কিন্তু সময় মতো সৈন্যরা এসে পৌঁছে যাওয়ায় জঙ্গি ছাত্ররা পালিয়ে যায়। আওয়ামী লীগ ও ছাত্র লীগের কর্মীরা অস্ত্রের মুখে অবাঙালিদের জীপ, গাড়ি ও মাইক্রোবাস ছিনতাই করে নিয়ে যায়। তারা শহরের গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় এবং বিমানবন্দরের বাইরে চেকপোস্ট স্থাপন করে। এসব চেকপোস্টে তারা ঢাকা থেকে পলায়নরত অবাঙালিদের দেহ তল্লাশি করে এবং তাদের কাছ থেকে নগদ অর্থ, অলঙ্কার, ঘড়ি ও রেডিওসহ মূলবান সামগ্রী কেড়ে নেয়।

৭ মার্চ শেখ মুজিবুর রহমান রমনা রেস কোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) এক বিশাল সমাবেশে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। মঞ্চে বাংলাদেশের নয়া পতাকা উত্তোলন করা হয়। পতাকায় একটি গাঢ় নীল জমিনে একটি লাল বৃত্তে ছিল বাংলাদেশের মানচিত্র। জনতা 'জয় বাংলা' এবং 'বাংলাদেশ স্বাধীন' প্রভৃতি শ্লোগান দেয়। আওয়ামী লীগের স্বেচ্ছাসেবকদের প্ররোচনায় জনতা পাকিস্তান, পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট, পূর্ব পাকিস্তানের নয়া গভর্নর লে. জেনারেল টিক্কা খান এবং পিপলস্ পার্টির চেয়ারম্যান জেড. এ. ভুট্টোর বিরুদ্ধে শ্লোগান দেয়। এসময় বার বার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা গান 'আমার সোনার বাংলা' বাজানো হয়।

www.pathagar.com

সরকারি অফিস-আদালতে অনির্দিষ্টকাল ধর্মঘট পালনের নির্দেশ দিয়ে শেখ মুজিবুর রহমান আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে একটি সমান্তরাল সরকার প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি কেন্দ্রীয় সরকারকে খাজনা-ট্যাক্স প্রদান করার পরিবর্তে প্রাদেশিক কোষাগারে অর্থ জমাদানে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে নির্দেশ দেন। শেখ মুজিবুর রহমান সেনাবাহিনীর চলাচল বন্ধ এবং সেনাবাহিনীকে রেলওয়ে ও বন্দর ব্যবহারে বিরত রাখতে রাস্তায় রাস্তায় প্রতিবন্ধকতা স্থাপনে তার জঙ্গি সমর্থকদের নির্দেশ দেন। আওয়ামী লীগ রেডিও, টেলিভিশন স্টেশন, টেলিযোগাযোগ এবং পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে অর্থ স্থানান্তরসহ বৈদেশিক বাণিজ্য ও ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে। শেখ মুজিবুর রহমান কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃত্ব অগ্রাহ্য করতে আওয়ামী লীগের নির্দেশ পালনে শ্রমিক ইউনিয়ন, গ্রাম ও শহরের সংগ্রাম কমিটিগুলোর প্রতি আহ্বান জানান। কার্যত সেদিন থেকে আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব বিচ্ছিন্নতার পথ বেছে নেয় এবং ঐ শক্তিকে উস্কে দেয় যাদের লক্ষ্য ছিল একটি স্বাধীন ও বর্ণবাদী বাঙালি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। ১৯৭১ সালের ৯ মার্চ ঢাকা থেকে লন্ডনের ডেইলি টেলিগ্রাফের সাংবাদিক কেনেথ ক্লার্কের প্রেরিত একটি সংবাদে বলা হয়:

> 'খবরে বলা হয়েছে, রোববার রাতে (৭ মার্চ) শেখ মুজিবুর রহমান প্রদেশকে বিচ্ছিন্নতার দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যাওয়ায় ঢাকায় আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি পুরোপুরি ভেঙ্গে পড়ে।'

১১ থেকে ১৫ মার্চ যেদিন জেনারেল ইয়াহিয়া খান শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে শাসনতান্ত্রিক আলোচনার জন্য ঢাকা গিয়ে পৌছান সেদিন পর্যন্ত আওয়ামী লীগ ইতোপূর্বে ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত সমান্তরাল সরকারকে সংহত করে। এসময় আরো অবাঙালি নিহত এবং তাদের বাড়িঘর লুণ্ঠিত হয়। আওয়ামী লীগের উগ্র কর্মীরা অবাঙালিদের ভয়ভীতি প্রদর্শন করে এবং ঢাকার কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশনে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তাদের আটক করে। ঢাকার কাকরাইলে একটি সরকারি অফিসে অগ্নিসংযোগ করা হয়। ঢাকা বিমানবন্দরে প্রবেশমুখের কাছে চেকপোস্টে আওয়ামী লীগ ক্যাডাররা ঢাকা থেকে পলায়নরত অবাঙালিদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। কতিপয় সরকারি কর্মচারী জীবনের মায়া উপেক্ষা করে অফিস করছিল। এসব অফিসে বোতল ভর্তি এসিড নিক্ষেপ করা হয়। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে গঠিত সংগ্রাম কমিটির সশস্ত্র গুন্ডারা স্বচ্ছল অবাঙালিদের কাছ থেকে চাঁদা আদায় করে।

১৬ থেকে ২৩ মার্চ জেনারেল ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে শেখ মুজিবুর রহমানের আড়ম্বরপূর্ণ শাসনতান্ত্রিক আলোচনার সময় আওয়ামী লীগ তাদের সমান্তরাল সরকারের কার্যক্রম অব্যাহত রাখে এবং ঢাকা ও তার আশপাশের কয়েকটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে দলীয় ক্যাডারদের প্রশিক্ষণ দেয়। অবাঙালিদের বাড়িঘরে হামলার ঘটনা নাটকীয়ভাবে বৃদ্ধি পায়। একদল দাঙ্গাবাজ জনতা ঢাকায় সেনাবাহিনীর একটি জীপে হামলা চালায় এবং জীপের আরোহী ৬ সৈন্যকে অপহরণ করে। শহরে পুলিশের অস্ত্রাগার থেকে অস্ত্র লুট করা হয়। আওয়ামী লীগের সশস্ত্র ক্যাডাররা ঢাকা সেনানিবাসে পাকিস্তানি সৈন্যদের কাছে খাদ্য সরবরাহের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে।

আওয়ামী লীগ হাইকমান্ড ২৩ মার্চ পাকিস্তানের জাতীয় দিবসকে প্রতিরোধ দিবস হিসেবে চিহ্নিত করে। এ দলের কর্মীরা পাকিস্তানের জাতীয় পতাকার পরিবর্তে ঢাকায়

www.pathagar.com

সকল সরকারি ও বেসরকারি ভবনের শীর্ষে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করে। শেখ মুজিবুর রহমান ধানমন্ডির ৩২ নম্বরে তার বাসভবনে একটি সশস্ত্র বিদায়ী কুচকাওয়াজে সালাম গ্রহণ করেন। এ অনুষ্ঠানে আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়। আওয়ামী লীগ তাদের শক্তির মহড়া দেয় এবং জনতা যুদ্ধংদেহী মনোভাব প্রদর্শন করে। তারা 'জয় বাংলা' ধ্বনি দেয়। অবাঙালি বসতিতে তারা হামলা চালায়।

আরো পশ্চিম পাকিস্তানি ব্যবসায়ীকে অপহরণ করা হয় এবং বাঙালি অপহরণকারীরা তাদের আত্মীয়-স্বজনের কাছে মুক্তিপণ দাবি করে। ক্ষিপ্ত জনতা বন্দুক ও দেশীয় অস্ত্র উঁচিয়ে ঢাকা বিমানবন্দরে করাচি অভিমুখী যাত্রীদের ওপর ইট পাটকেল নিক্ষেপ করে। আওয়ামী লীগের বিক্ষোভকারীরা ঢাকায় প্রেসিডেন্ট ভবনের পাশ দিয়ে মার্চ করে যায়। সেখানে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান অবস্থান করছিলেন। তারা প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ও পাকিস্তান সেনাবাহিনীর প্রতি কূট উক্তি করে। অবাঙালি ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে আওয়ামী লীগের নাম ভাঙ্গিয়ে মুক্তিপণ আদায় করে অল্পবয়স্ক কর্মীরা ধনী হয়ে উঠে। তারা পশ্চিম পাকিস্তানি ও অবাঙালিদের কাছ থেকে কেড়ে নেয়া গাড়িতে চড়ে ঘুরে বেড়াতো। সন্ধ্যায় শেখ মুজিবুর রহমানের বাসভবনের বাইরে হাওয়া খেতো এবং 'জয় বাংলা' ধ্বনি দিতো।

২৩ মার্চ চীনা কন্স্যুলেটে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করতে গেলে আওয়ামী লীগের সঙ্গে তাদের বিরোধ বাধে। চীনারা তাদেরকে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলনে বাধা দেয়। আওয়ামী লীগের বিক্ষোভকারীরা বহু স্থানে পাকিস্তানের জাতীয় পতাকা টুকরো টুকরো করে এবং পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর ছবি পায়ের নিচে পিষ্ট করে। ইপিআর ও আনসার বাহিনীর সদস্যরা সপক্ষ ত্যাগ করায় আওয়ামী লীগের জঙ্গিদের শক্তি বৃদ্ধি পায়। তার আগে ঝড়ের গতিতে ভারত থেকে আগ্নেয়াস্ত্রের চোরাচালান প্রবেশ করছিল এবং নাশকতার জন্য বহু ভারতীয় এজেন্ট পূর্ব পাকিস্তানে অনুপ্রবেশ করে। ঢাকার শহরতলীতে শত শত অবাঙালির বস্তি ঘরে আগুন দেয়া হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস আওয়ামী লীগের জঙ্গিদের ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ল্যাবরেটরীগুলো বিভিন্ন ধরনের বিস্ফোরক তৈরিতে ব্যবহার করা হয়। অপহৃত অবাঙালিদের ওপর নির্যাতন এবং তাদের হত্যাকাণ্ডে জগন্নাথ হলের একটি অংশ ব্যবহার করা হয়। পূর্ব পাকিস্তানের প্রায় প্রতিটি শহরে লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগ ও হত্যাকাণ্ডের সংবাদে কেন্দ্রীয় সরকার এবং সেনাবাহিনীর ইস্টার্ন কমান্ড উদ্বিগ্ন হয়ে উঠে। ঢাকায় আওয়ামী লীগের ছাত্র ও শ্রমিক সংগঠনগুলোর প্রচারিত সাইক্লোস্টাইল করা পোস্টারগুলো সামরিক আদেশের মতো কার্যকর হয়। এ সব পোস্টারে পূর্ব বাংলার জাতীয় স্বাধীনতার জন্য রক্তাক্ত প্রতিরোধ যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য জনগণকে প্ররোচিত করা হয়। আওয়ামী লীগ ও তাদের সমর্থকরা ঢাকার পুলিশ সদর দপ্তর থেকে প্রায় ১৫ হাজার লোড করা রাইফেল লুট করে। আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসীরা ঢাকায় আরো বহু অস্ত্রের দোকান লুট করে। ২৩ মার্চ গোটা ঢাকা শহর জুড়ে ব্যারিকেড ও সড়ক প্রতিবন্ধকতা দেখা যায়। কয়েকটি স্থানে পেট্রোল বোমা ও অন্যান্য দেশীয় বোমা বিস্ফোরিত হয়।

সেনাবাহিনীর গোয়েন্দা সংস্থা ২৬ মার্চ প্রত্যুষে গোটা পূর্ব পাকিস্তানে একটি সশস্ত্র অভ্যুত্থান ঘটাতে আওয়ামী লীগের পরিকল্পনা সম্পর্কে জানতে পারে। সশস্ত্র অভ্যুত্থান

www.pathagar.com

অনুষ্ঠানে আওয়ামী লীগের নির্ধারিত সময়ের কয়েক ঘণ্টা আগে ২৫ মার্চ গভীর রাতে সেনাবাহিনীর ইউনিটগুলো ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট থেকে বের হয়ে আসে এবং কয়েক ঘণ্টার মধ্যে প্রাদেশিক রাজধানীতে আওয়ামী লীগের অভ্যুত্থান নস্যাতে বেশ কয়েকটি জায়গায় আগেভাগে আঘাত হানে। ঢাকায় বাঙালি বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনীর অভিযানকালে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে মুজিবের আলোচনা আওয়ামী লীগকে সেনাবাহিনীর সঙ্গে শক্তিপ্রদর্শনে অস্ত্র ও গোলাবারুদ সংগ্রহ এবং বিস্ফোরক তৈরির সুযোগ দিয়েছিল।

জেনারেল ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে আলোচনায় আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ তাকে একটি সাংবিধানিক ব্যবস্থায় সম্মত হতে চাপ দেয়। তারা সাংবিধানিক ব্যবস্থায় একটি শিথিল কনফেডারেশনের আওতায় পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানকে দু'টি পৃথক সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে গঠনের দাবি জানায়। কনফেডারেশনের কাঠামো এত দুর্বল ছিল যে, শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন কার্যত স্বাধীন বাংলাদেশ এ কনফেডারেশন থেকে অতি সহজে বেরিয়ে যেতে পারতো। একদল সৈন্য ২৬ মার্চ রাত ১টা ৩০ মিনিটে ঢাকার ধানমণ্ডির বাসভবন থেকে শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করে। সামরিক প্রহরায় তাকে রাতে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে রাখা হয় এবং পরদিন তাকে বিমানযোগে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয়। পশ্চিম পাকিস্তানে তাকে আটক রাখা হয়েছিল।

ঢাকায় বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনীর অভিযান এত ক্ষিপ্র ও কার্যকর ছিল যে, ২৬ মার্চ প্রত্যুষে শহরে সেনাবাহিনীর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ কায়েম হয়। ঢাকায় সেনাবাহিনীর শক্তি আওয়ামী লীগের বিদ্রোহ দমনে যথেষ্ট ছিল। তবে প্রদেশের বাদবাকি অংশে সেনাবাহিনীর অবস্থান ছিল দুর্বল। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন ১ লাখ ৭৬ হাজারের বেশি বিদ্রোহীকে নির্মূল করতে সেনাবাহিনীর ৩ দিন থেকে ৩ সপ্তাহ সময় লেগেছিল। বিদ্রোহীরা অবাঙালি জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে 'অপারেশন লুট, কিল এন্ড বার্ন' পরিচালনা করেছিল। এমনকি ঢাকার উপকণ্ঠে আওয়ামী লীগের সশস্ত্র বিদ্রোহীরা ১৯৭১ সালের ২৫/২৬ মার্চ রাতে শত শত অবাঙালিকে হত্যা করে। ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগে ঢাকায় ভারতীয় কূটনৈতিক মিশনে আওয়ামী লীগ বিদ্রোহীদের একটি ট্রান্সমিটার ব্যবহার করার প্রমাণ পাওয়া যায়। ভারতীয় কর্তৃপক্ষ বিদ্রোহীদের সহায়তা করছিল বিশেষ করে সীমান্ত এলাকায়। ২৬ মার্চ 'ফ্রি বেঙ্গল রেডিও' সম্প্রচার শুরু করে এবং এই রেডিও বিদ্রোহীদের কাল্পনিক বিজয়ের সংবাদ প্রচার করে। এ বেতার কেন্দ্র ভারতের ভূখণ্ডে স্থাপন করা হয়েছিল। ভারতীয় পত্র-পত্রিকা এবং অল ইন্ডিয়া রেডিও থেকে একজন বাঙালি বিদ্রোহীর হাতে জেনারেল টিক্কা খানের নিহত হওয়ার আষাঢ়ে গল্প প্রচার করা হয়। এ সংবাদ ছিল একদল ভারতীয় প্রচারবিদ এবং বিদ্রোহীদের উর্বর মস্তিষ্কের আবিষ্কার। কলকাতায় বাঙালি বিদ্রোহীরা একটি মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ ইউনিট পরিচালনা করছিল।

সেনাবাহিনী বিদ্রোহীদের কাছ থেকে যেসব রাইফেল উদ্ধার করে সেসব রাইফেলের অধিকাংশ তৈরি করা হয়েছিল ভারতের ইছাপুর রাইফেল কারখানায়। গোলাবারুদগুলোতে ভারতের কারকি সমরাস্ত্র কারখানার সিল ছিল। ১৯৭১ সালে মার্চের প্রথম সপ্তাহে ভারত গুরুত্বপূর্ণ সীমান্ত এলাকায় বিদ্রোহীদের সহায়তায় ৮ ব্যাটালিয়ন বিএসএফ মোতায়েন

www.pathagar.com

করেছিল। ঢাকার নবাবগঞ্জে সেনাবাহিনী আওয়ামী লীগের এক নেতার কাছ থেকে একজন ভারতীয় এজেন্টের কাছে লেখা একটি গোপন বার্তা উদ্ধার করে। এ বার্তায় বিদ্রোহীদের কাছে ভারত থেকে ভারি অস্ত্র পাচারে সীমান্তে একটি বৈঠক অনুষ্ঠানের অনুরোধ জানানো হয়েছিল।

বিদ্রোহীরা পুরনো ঢাকায় একটি বিহারী বস্তি পুড়িয়ে দেয়। কিন্তু আওয়ামী লীগের অনুচররা ২৬ মার্চ ভোরে বিদেশি সাংবাদিকদের জানায় যে, পাকিস্তান সেনাবাহিনী এ বস্তিতে আগুন দিয়েছে। শিল্প নগরী নারায়ণগঞ্জে অপহৃত অবাঙালিদের হত্যা করে লাশ বুড়িগঙ্গা নদীতে ফেলে দেয়া হয়। অনেককে জ্বলন্ত ঘরবাড়িতে আটকে রেখে জীবন্ত হত্যা করা হয়।

আমেরিকান মহিলা সাংবাদিক পেগি ডারডিন ৩ মার্চ আহূত জাতীয় পরিষদ অধিবেশনের সংবাদ সংগ্রহে ঢাকা এসেছিলেন। সঙ্গে ছিলেন তার স্বামী। পেগি ঢাকায় অবাঙালিদের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগের সহিংসতা প্রত্যক্ষ করেন। ১৯৭১ সালের ২ মে নিউইয়র্ক টাইমস ম্যাগাজিনে তার একটি রিপোর্টে বলা হয়:

> '১ মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিতে জেনারেল ইয়াহিয়ার ঘোষণা প্রচারিত হওয়ার কয়েক মিনিটের মধ্যে এবং পরবর্তী কয়েক সপ্তাহ যাবৎ মহিলাসহ সমাজ জীবনের সর্বস্তরের বিক্ষুব্ধ, উত্তেজিত ও ক্রুদ্ধ বাঙালি জনতা তাদের ক্রোধ প্রকাশ এবং স্বাধিকারের দাবিতে উত্তাল রাজপথে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে।...
>
> 'ঢাকায় জনতা ক্রোধে ফেটে পড়েছে। তারা প্রেসিডেন্ট ও মি. ভুট্টোর বিরুদ্ধে শ্লোগান এবং 'জয় বাংলা' ও 'স্বাধীন বাংলা' ধ্বনি দিয়েছে। ২ মার্চ শেখ মুজিবুর রহমান প্রদেশে ৫ দিনব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দিয়েছেন। এ ধর্মঘটে সকল সরকারি অফিসসহ সব ধরনের কাজকর্ম বন্ধ থাকে, দোকানপাট বন্ধ রাখা হয় এবং বাই-সাইকেলসহ কোনো যানবাহন চলাচল করেনি। ঢাকা একটি ভূতুরে শহরে পরিণত হয়। উন্মুক্ত স্থানগুলোতে মিটিং মিছিল ছাড়া শহরে আর কিছু ছিল না। শ্লোগানমুখর জনতাকে রাজপথ প্রদক্ষিণ করতে দেখা গেছে। পায়ে হাঁটা ছাড়া বাইরে বের হওয়ার উপায় নেই। আমি ও আমার স্বামী প্রতিদিন যানবাহনমুক্ত শহরের প্রশস্ত রাজপথে বন্ধ দোকানপাট এবং ফাঁকা হাট-বাজারের পাশ দিয়ে ১০ থেকে ২০ মাইল হেঁটেছি।...
>
> 'উত্তেজিত জনতার ঘৃণা শুধু পশ্চিম পাকিস্তানি নয়, কখনো কখনো ইউরোপীয়দের বিরুদ্ধেও উপচে পড়েছে। কোনো কোনো জায়গায় রাজপথে পশ্চিম পাকিস্তানিদের হত্যা এবং তাদের বাড়িঘর ও দোকানপাট লুট করা হয়। ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে আওয়ামী লীগের গুন্ডারা ভবনের একপাশে বৈদ্যুতিক অক্ষরে হোটেলের নামসহ সব কিছু ভেঙ্গে ফেলেছে। হোটেলে লবির জানালা দিয়ে একটি গুলি করা হয়েছে। বিগত কয়েক দিন ধরে বিদেশিদের বিরুদ্ধে অনুরূপ বৈরিতা দেখানো হয়েছে। এ পরিস্থিতিতে সুইস ম্যানেজার হোটেলের সুইমিং পুল বন্ধ করে দিয়েছেন এবং সকল অতিথিকে খাবারের সময় ছাড়া বাদবাকি সময় নিজ নিজ রুমে অবস্থান করার নির্দেশ দিয়েছেন। ধর্মঘট অব্যাহত থাকায় এবং যানবাহনের ঘাটতি দেখা দেয়ায় কর্মচারীর সংখ্যা হ্রাস পায়। ফলে অতিথিদের আত্মনির্ভরশীল হতে হয়। হোটেলের খাবারের মধ্যে ছিল মোটা ভাত ও কয়েক পদের তরকারি।...'

www.pathagar.com

১ মার্চ আওয়ামী লীগ সূচিত ধর্মঘটকালে বিদেশিদের প্রতি সৃষ্ট ঘৃণার ধারাবাহিকতায় ঢাকার কেন্দ্রস্থলে পেগি ডারডিন ও তার স্বামী একদল বাঙালি বিক্ষোভকারীর হাতে প্রহৃত হন। এ ব্যাপারে তিনি ১৯৭১ সালের ২ মে নিউইয়র্ক টাইমসে লিখেন:

> 'সাধারণ ধর্মঘটের প্রথমদিন উত্তেজিত তরুণ বিক্ষোভকারীরা বায়তুল মোকাররম মসজিদের কাছে লোহার রড ও বাঁশের লম্বা লাঠি নিয়ে আমাকে এবং আমার স্বামীকে পেটাতে শুরু করে। অলৌকিকভাবে আওয়ামী লীগের একটি টহল দল আমাদেরকে দেখতে পায় এবং আক্রমণকারীদের ধাওয়া করে। এই টহল দল আক্রমণকারীদের নিজেদের লাঠি দিয়ে তাদের পিটায় এবং আমাদেরকে সংকীর্ণ পথ দিয়ে নিরাপদে আওয়ামী লীগের স্থানীয় প্রধান কার্যালয়ে নিয়ে যায়।...'

নিউইয়র্ক টাইমসের আরেক সাংবাদিক ম্যালকম ব্রাউন মে মাসের গোড়ার দিকে পূর্ব পাকিস্তান সফর করেন। ১৯৭১ সালের ৬ মে নিউইয়র্ক টাইমসে ঢাকা থেকে প্রেরিত তার এক রিপোর্টে বলা হয়:

> 'পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক গভর্নর লে. জেনারেল টিক্কা খান আজ বলেছেন যে, তার স্টাফের হিসেবে ২৫ মার্চ রাতে প্রদেশে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় সেনাবাহিনীর অভিযানকালে ঢাকায় ১৫০ ব্যক্তি নিহত হয়েছে।...
> 'গাঙ্গেয় ব-দ্বীপে অসংখ্য জলাশয় ও নদ-নদী পরিবেষ্টিত বন্যা প্রবণ সমতল ভূমিতে গড়ে উঠা শহর ঢাকাকে শান্ত বলে মনে হচ্ছে।...
> তিনি (জেনারেল টিক্কা খান) বলেছেন, 'আমাদেরকে ছাত্র হত্যার জন্য অভিযুক্ত করা হচ্ছে। আমরা ছাত্র অথবা অন্য কোনো গ্রুপের ওপর হামলা চালাইনি। আক্রান্ত হওয়ায় আমরা জবাব দিয়েছি।'
> 'বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ছিল। অতএব সেখানে অবস্থানকারীদের কেউ ছাত্র হতে পারে না।' টিক্কা আরো বলেন, 'যারা বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে অবস্থান করছিল আমরা তাদেরকে বের হয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেই। কিন্তু তারা আমাদের ওপর গুলিবর্ষণ করে। স্বাভাবিকভাবে আমরাও পাল্টা গুলি ছুঁড়েছি।...'

বার্তা সংস্থা রয়টার্সের সাংবাদিক মরিস কুইন্টান্স ১৯৭১ সালের মে মাসের গোড়ার দিকে পূর্ব পাকিস্তান সফর করেন। ৬ মে ঢাকা থেকে প্রেরিত এক রিপোর্টে তিনি লিখেন:

> 'সামরিক গর্ভনর লে. জেনারেল টিক্কা খান এক অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের জানিয়েছেন যে, সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক পরিস্থিতি পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে।...
> জেনারেল বলেছেন, পূর্ব পাকিস্তানে হত্যাযজ্ঞ সংঘটিত হয়েছে। তবে সেনাবাহিনী এ হত্যাযজ্ঞ পরিচালনা করেনি। ২৫ মার্চ ক্যান্টনমেন্ট থেকে বের হওয়ার পর সেনাবাহিনী ব্যাপক নির্দোষ মানুষকে হত্যা করার প্রমাণ দেখতে পায়। একটি উদাহরণ দিতে গিয়ে তিনি বলেন, সেখানে ৫শ' লোককে একটি ভবনে বেঁধে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়। কেউ রক্ষা পায়নি। তিনি বলেন, প্রতিশোধের আশংকায় পশ্চিম পাকিস্তানের লোকদের এসব ঘটনা জানানো হয়নি। টিক্কা খান আরো বলেন, আক্রান্ত হওয়া নাগাদ সেনাবাহিনী কারো ওপর গুলি চালায়নি। এমনকি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'টি শক্তঘাঁটির ওপরও নয়। এ দু'টি শক্তঘাঁটিতে ভিন্নমতাবলম্বীরা স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র ও দেশীয় বোমায় সজ্জিত ছিল। তাদেরকে ভবন ত্যাগের সুযোগ দেয়া হয়েছিল। জেনারেল বলেন, ২৬ মার্চ

www.pathagar.com

ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে গোটা ঢাকায় সামরিক অভিযান শেষ হয়ে যায়।...
'ঢাকা বিমানবন্দরের কাছাকাছি কয়েকটি বাড়ি বিধ্বস্ত। এসব বাড়ি জনশূন্য। কয়েকটি বাড়ির ছাদ নেই। পাকিস্তানি কর্মকর্তারা জানিয়েছেন যে, সেনাবাহিনী প্রদেশে শান্তি-শৃঙ্খলা পুনরুদ্ধারে অভিযান শুরুর আগে সংঘটিত সাম্প্রদায়িক সহিংসতায় এসব বাড়ির লোক আক্রান্ত হয়েছিল।'

১৯৭১ সালে মে মাসের শেষদিকে পাকিস্তানের প্রতি বৈরি বিদেশি প্রচার মাধ্যমগুলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং এ বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাধীন কলেজগুলো সম্পূর্ণ ধ্বংস করার জন্য পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে অভিযুক্ত করেছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করার পর ৭ মে মরিস কুইন্টান্স লিখেছেন:

'শুক্রবার সাংবাদিকদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে ২৫ মার্চ রাতে ছাত্র ও আওয়ামী লীগের সমর্থকদের সঙ্গে সেনাবাহিনীর সংঘর্ষ হয়। ইকবাল হল ও জগন্নাথ হলে সংঘর্ষ সীমাবদ্ধ ছিল। সেনাবাহিনী জানিয়েছে, সেখানে দেশীয় বোমা ও স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রের মজুদ গড়ে তোলা হয়েছিল। সেনাবাহিনী এ দু'টি শক্তঘাঁটির নিয়ন্ত্রণ গ্রহণে এগিয়ে গেলে প্রতিরোধকারীদের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ হয়। ছাত্রাবাসে একটি বিরাট গর্ত চোখে পড়ে। সেনাবাহিনী বলছে, যেসব ছাত্র আত্মসমর্পণে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল তাদের বের করে দেয়ার জন্য সেনাবাহিনী সেখানে রকেট ছুঁড়েছিল। একজন অফিসার সাংবাদিকদের ছাত্রাবাসের সামনে একটি লনে নিয়ে যান। সেখানে ছিল কাঁটা তার পরিবেষ্টিত এবং উঁচু দেয়াল ঘেরা একটি প্রশিক্ষণ মাঠ। অফিসারটি জানান যে, ছাত্ররা এখানে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছিল।...'

সাংবাদিকদের আটক ভারতীয় সৈন্য এবং উদ্ধারকৃত ভারতীয় অস্ত্রশস্ত্র দেখানো হয়। এ ব্যাপারে ১৯৭১ সালের ৭ মে মরিস কুইন্টান্স লিখেছেন:

'ঢাকায় শুক্রবার খাকি পোশাক পরিহিত তিনজন সৈন্য স্বীকার করে যে, বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সমর্থক ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলসের ভিন্নমতাবলম্বী ইউনিটগুলোকে সহায়তার জন্য গত মাসে ভারত থেকে তাদেরকে পাকিস্তানে পাঠানো হলে তারা বন্দি হয়। ঢাকা সেনানিবাসে দোভাষীর মাধ্যমে একজন বন্দি ৬ জন বিদেশি সাংবাদিককে জানায়, সে রাতে পাকিস্তান ভূখন্ডে অনুপ্রবেশ করে। তার প্লাটুনকে সীমান্ত চৌকিতে এগিয়ে যাবার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল।...
'ঢাকায় পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সদর দপ্তর শুক্রবার সাংবাদিকদের আটক ভারতীয় অস্ত্রশস্ত্র ও গোলবারুদ দেখায়। আটক অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে ছিল রাইফেল, মর্টার ও হ্যান্ড গ্রেনেড। সেনাবাহিনী জানায়, অস্ত্রশস্ত্রগুলোর মার্কিং প্রমাণ করছে, এগুলো ভারতে তৈরি।...'

১৯৭১ সালের ৭ এপ্রিল লন্ডনের ডেইলি টেলিগ্রাফে একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। ডান্ডির একজন বাসিন্দার উদ্ধৃতি দিয়ে ঢাকা থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত রিপোর্টে বলা হয়:

'প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার ভাষণ সম্প্রচারের পর ২৬ মার্চ কিভাবে উন্মত্ত জনতা এ ফ্যাক্টরিতে এসেছিল তিনি তার বর্ণনা দিয়েছেন। গুন্ডারা ভাঙচুর শুরু করে। তারা ফ্যাক্টরি ও অফিস লুট করে। সব পশু হত্যা করার পর তারা মানুষ খুন করতে শুরু

www.pathagar.com

করে। তারা আমার চারজন পরিচালকের বাসায় যায়। এ চারজন পরিচালক ছিল পশ্চিম পাকিস্তানি। তাদের বাড়িতে অগ্নিসংযোগ এবং মোট ৩০ জনের পরিবারসহ তাদেরকে জীবন্ত পুড়িয়ে হত্যা করা হয়। যারা দৌড়ে পালিয়ে গিয়েছিল তাদেরকেও হত্যা করা হয়।'

১৯৭১ সালের ২ মে লন্ডনের সানডে টাইমসের এক রিপোর্টে বলা হয়:

'পূর্ব পাকিস্তানে বিগত ১০ দিনের ঘটনাবলীর বিস্তারিত বিবরণ থেকে এ সত্য প্রতিভাত হচ্ছে যে, পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে একটি বিশাল ও সফল বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছে এবং নারী, পুরুষ ও শিশু নির্বিশেষে হাজার হাজার অবাঙালি নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছে। এ পর্যন্ত বাংলাদেশের প্রধান প্রধান শহরগুলোতে ২০ হাজারের বেশি লাশ খুঁজে পাওয়া গেছে। তবে চূড়ান্ত সংখ্যা এক লাখ ছাড়িয়ে যেতে পারে।

'৮০টির বেশি সাক্ষাৎকারে প্রত্যক্ষদর্শীরা ধর্ষণ, নির্যাতন, চক্ষু উৎপাটন, নারী ও পুরুষকে প্রকাশ্যে বেত্রাঘাত, গুলি অথবা বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে হত্যার আগে মহিলাদের স্তন কর্তন এবং অঙ্গছেদনের বিভীষিকাময় কাহিনী বর্ণনা করেছে। সেনাবাহিনীর পাঞ্জাবী সদস্য এবং বেসামরিক কর্মচারী ও তাদের পরিবারের ওপর ব্যতিক্রমধর্মী নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করা হয়েছে।...'

(১) প্রথম সাক্ষীর বিবরণ: ২৩ বছরের মোহাম্মদ হানিফ ১৯৭১ সালের ২৪ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলের একটি রুমে একজন বাঙালি জঙ্গি ছাত্রকে একজন অবাঙালি বন্দির শিরশ্ছেদ করার ঘটনা প্রত্যক্ষ করে। তার আত্মীয়-স্বজন দাবিকৃত ৩ হাজার রুপি মুক্তিপণ দিতে ব্যর্থ হওয়ায় তার শিরশ্ছেদ করা হয়। মোহাম্মদ হানিফ ঢাকার লালমাটিয়া কলোনির 'বি' ব্লকের ৪৯ নম্বর কোয়ার্টারে বসবাস করতো। সে ঢাকার টাইগার অয়ার কোম্পানিতে কাজ করতো। ১৯৭৪ সালে পাকিস্তানে প্রত্যাবাসনের পর সে তার নির্মম অভিজ্ঞতার বর্ণনা দেয়। সে তার জবানীতে বলেছে:

'২৪ মার্চ বিকালে আমি একটি মোটর চালিত রিক্সা (তিন চাকার ট্যাক্সি) ভাড়া করি এবং লালমাটিয়া কলোনিতে আমাকে নিয়ে যেতে ড্রাইভারকে বলি। আমি তার সঙ্গে ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাংলায় কথা বলি এবং ড্রাইভার বুঝতে পেরেছিল যে, আমি একজন অবাঙালি। আমি ভয়ে চিৎকার করা সত্ত্বেও আকস্মিকভাবে সে জগন্নাথ হলের কম্পাউন্ডে ট্যাক্সি নিয়ে প্রবেশ করে। সেখানে ছয় জন সশস্ত্র ছাত্র আমাকে ঝাপটে ধরে ফেলে। ছাত্ররা আমাকে একটি ভগ্ন রুমে নিয়ে যায়। রুমে ছাত্ররা আমাকে তন্ন তন্ন করে তল্লাশি করে এবং আমার পকেট থেকে ১৫০ রুপি মূল্যের একটি ঘড়ি ছিনিয়ে নিয়ে যায়। তারা আমাকে আমার নিকটাত্মীয়দের কাছে আমার জীবন রক্ষায় মুক্তিপণ হিসেবে ৩ হাজার রুপি প্রদানে একটি চিঠি লিখার নির্দেশ দেয়। আমি ইতস্তত করতে থাকি এবং আমাকে মনস্থির করার জন্য কিছুটা সময় দেয়ার জন্য তাদের অনুরোধ করি। তারা শক্ত দড়ি দিয়ে আমার হাত বেঁধে ফেলে এবং আমাকে একটি বিরাট হলে নিয়ে যায়। সেই হলে দড়ি দিয়ে বাঁধা বহু অবাঙালি বন্দি মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছিল।...

'যে জঙ্গি ছাত্রটি আমাকে মুক্তিপণের চিঠি লিখতে বলেছিল সে হলের শেষ প্রান্তে একজন অসহায় বন্দির দিকে এগিয়ে যায়। ছাত্রটি বাংলায় বন্দিকে জানায় যে,

www.pathagar.com

মুক্তিপণের অর্থ নিয়ে কেউ আসেনি এবং তার আত্মীয়-স্বজনকে দেয়া চূড়ান্ত সময় পেরিয়ে গেছে। অতএব তাকে মরতে হবে। আতঙ্কিত বন্দি চিৎকার করে উঠে এবং পালিয়ে যাবার চেষ্টা করে। তবে ছয় জন জঙ্গি ছাত্র তাকে ধরে ফেলে এবং নেতা গোছের ছাত্রটি একটি রাম দা দিয়ে তার মাথা দ্বিখণ্ডিত করে ফেলে।...

'এ দৃশ্য দেখে আমি শিউরে উঠি। মধ্যরাতে আমি আটককারী ছাত্রদের জানাই যে, আমি আমার বড় ভাইয়ের কাছে মুক্তিপণ প্রদানের জন্য চিঠি লিখবো। আমি ২৫ মার্চ ভোরে চিঠি লিখি। আমি আমার বড় ভাইকে ২৪ ঘন্টার মধ্যে তিন হাজার রুপি আটককারীদের কাছে পৌঁছে দেয়ার অনুরোধ করি। আটককারী ছাত্ররা ২৬ মার্চ সকাল পর্যন্ত অর্থ প্রাপ্তির শেষ সময় বেধে দেয়। তবে আল্লাহ ছিলেন দয়াময়। ২৫ মার্চ শেষ রাতে সেনাবাহিনী ঢাকায় বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করে এবং জগন্নাথ হলে সেনাবাহিনীর সঙ্গে মোকাবিলায় ছাত্ররা বিধ্বস্ত হয়। সেনাবাহিনী আমাদের উদ্ধার করে।'

(২) **দ্বিতীয় সাক্ষীর বিবরণ:** ৪০ বছরের বাছা খান বলেছেন, ১০ জন পাঠানের মধ্যে একমাত্র তিনি জীবিত। এসব পাঠান ঢাকার মহাখালীতে ডেল্টা কন্সট্রাকশন কোম্পানিতে নিরাপত্তা প্রহরী হিসেবে কাজ করতো। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে বাঙালি বিদ্রোহীরা সবাইকে হত্যা করে। বাছা খান জানান, তিনি রাতের অন্ধকারে একটি গাছে চড়ে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পান। ১৯৭৩ সালের সেপ্টেম্বরে তিনি ঢাকা থেকে করাচিতে প্রত্যাবর্তন করেন। বাছা খান তার সাক্ষ্যে বলেছেন:

'আমি ছিলাম ঢাকায় ডেল্টা কন্সট্রাকশন কোম্পানিতে প্রহরী হিসেবে কর্মরত ১০ জন পাঠানের একটি গ্রুপের একজন। আমরা কোম্পানির প্রাঙ্গণে স্টাফ কোয়ার্টারে বসবাস করতাম। মার্চের প্রথম সপ্তাহ থেকে আওয়ামী লীগের জঙ্গি সমর্থক এবং তরুণ গুণ্ডারা অবাঙালি বিশেষ করে পশ্চিম পাকিস্তানিদের ভয়ভীতি প্রদর্শন করছিল। তাই আমরা সবাই ছিলাম সতর্ক।...

'২৫ মার্চ একদল বিদ্রোহী বাঙালি আমাদের স্টাফ কোয়ার্টার আক্রমণ করে। আকস্মিকভাবে হামলা চালিয়ে তারা তিনজন পাঠান প্রহরীকে হত্যা করতে সফল হয়। আমি এবং অন্য তিনজন জীবিত পাঠান আমাদের তিনটি বন্দুক নিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেই। আমরা হামলাকারীদের কিছুক্ষণ কোণঠাসা করে রাখতে সক্ষম হই। তবে হামলাকারীদের গোলাবারুদ ছিল আমাদের চেয়ে বেশি। চারদিকে অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে আমি ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে গিয়ে একটি গাছে আরোহণ করি। পরদিন সকালে আমি অন্য ছয় জন পাঠানের লাশ দেখতে পাই। গুলি ফুরিয়ে গেলে বিদ্রোহীরা রাতে তাদের হত্যা করেছিল। বিদ্রোহীরা আমাদের বন্দুক নিয়ে যায়।...'

(৩) **তৃতীয় সাক্ষীর বিবরণ:** ৩৬ বছরের চাঁন মিয়া জানান, ১৯৭১ সালের ১৭ মার্চ বিদ্রোহীরা তার বস্তি ঘর জ্বালিয়ে দেয় এবং ৯ বছর বয়সের শিশু পুত্রকে হত্যা করে। চাঁন মিয়া ঢাকায় বেঙ্গল রাবার ইন্ডাস্ট্রিজে চাকরি করতেন। তিনি তেজগাঁয়ের নাখালপাড়ায় একটি বস্তি ঘরে বাস করতেন। ১৯৭৪ সালের জানুয়ারিতে তিনি ঢাকা থেকে করাচিতে প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি তার সাক্ষ্যে বলেছেন:

www.pathagar.com

'নাখালপাড়া ছিল আমার ফ্যাক্টরির খুব কাছে। আমি কিছু অর্থ সঞ্চয় করেছিলাম। সঞ্চিত অর্থ দিয়ে পাশে এক খণ্ড জমি ক্রয় করি। পাকা বাড়ি নির্মাণের সামর্থ্য না থাকায় জমিতে একটি বস্তি ঘর তুলেছিলাম। স্ত্রী ও ৯ বছরের পুত্র সন্তান নিয়ে আমি সেই ঘরে বাস করতাম। বাঙালি প্রতিবেশীদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক ছিল বন্ধুত্বপূর্ণ। আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের উত্তেজনাপূর্ণ ভাষণে মার্চের প্রথম সপ্তাহ থেকে চাপা উত্তেজনা বিরাজ করছিল। অবাঙালি হত্যাকাণ্ডের গুজব শোনা যাচ্ছিল।...

'১৭ মার্চ আমি বস্তি ঘর থেকে দূরে ফ্যাক্টরিতে অবস্থান করার সময় আওয়ামী লীগের একদল গুণ্ডা নাখালপাড়ায় অবাঙালিদের ঘর-বাড়ি আক্রমণ করে। তারা ঘরবাড়িতে লুটতরাজ চালায় এবং অগ্নিসংযোগ করে। তারা আমার বস্তি ঘর পুড়িয়ে দেয় এবং আমার পুত্রকে হত্যা করে। শিশু হলেও আমার পুত্র আক্রমণকারীদের প্রতিহত করার চেষ্টা করে। ফিরে এসে দেখলাম আমার ঘর ভস্মীভূত। তখনো ধোঁয়া উড়ছে। আমার স্ত্রী আমার প্রিয় সন্তানের লাশের ওপর উপুড় হয়ে বিলাপ করছে।'

(৪) **চতুর্থ সাক্ষীর বিবরণ:** ২৬ বছরের মোহাম্মদ ফরিদের হিসেব মতে, ১৯৭১ সালের ১৯ মার্চ ঢাকার আদমজী নগর নিউ কলোনিতে মাত্র ৩ ঘণ্টায় এক হাজারের বেশি অবাঙালিকে হত্যা অথবা আহত করা হয়। ফরিদ আদমজী ফ্যাক্টরিতে স্পিনিং সেকশনে সহকারী সুপারভাইজার হিসেবে চাকরি করতেন। তিনি সেখানকার হত্যাকাণ্ড প্রত্যক্ষ করেন। ভাগ্যক্রমে তিনি বেঁচে যান। ১৯৭৪ সালের জানুয়ারিতে ফরিদ ঢাকা থেকে করাচিতে প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি তার সাক্ষ্যে বলেছেন:

'অতীতে আদমজী নগরে বাঙালি ও অবাঙালি শ্রমিকদের মধ্যে বহু সংঘর্ষ হয়। এতে বহু অবাঙালি হতাহত হয়েছে। আওয়ামী লীগ বাঙালি শ্রমিকদের মধ্যে নিজেদের প্রভাব প্রতিষ্ঠা করে। ১৯৭১ সালে মার্চের প্রথম সপ্তাহ থেকে দলীয় ক্যাডাররা অবাঙালিদের বিরুদ্ধে বাঙালি শ্রমিকের উসকানি দিতে থাকে।...

'১৯ মার্চ আওয়ামী লীগের একদল জঙ্গি কর্মী বন্দুক, ছোরা, চাকু ইত্যাদি অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে আমাদের ফ্যাক্টরিতে হামলা চালায়। বাঙালি নিরাপত্তা প্রহরীরা তাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে মিল এবং অবাঙালিদের বাড়িঘরে তাণ্ডব চালায়।...

'জঙ্গিরা ওয়েভিং সেকশনে হামলা চালায় এবং মাত্র আধা ঘণ্টার মধ্যে কয়েক শত অবাঙালি শ্রমিককে হত্যা করে। আমি কয়েক ডজন আহত শ্রমিককে আমার স্পিনিং সেকশনের দিকে দৌড়ে যেতে দেখি। আমি হলের শেষ প্রান্তে একটি বিরাট মেশিনের নিচে আত্মগোপন করি। জঙ্গিরা আমার ইউনিটে প্রবেশ করে অবাঙালি শ্রমিকদের ওপর হামলা চালায়। আহত কয়েক জন দৌড়ে পালিয়ে যায় এবং জঙ্গিরা তাদের ধাওয়া করে। তাদের ওপর গুলি চালানো হয়। প্রায় তিন ঘণ্টা হত্যাকাণ্ড অব্যাহত থাকে। রাতে আমি আত্মগোপন অবস্থা থেকে বের হয়ে ফ্যাক্টরির এখানে সেখানে শত শত লাশ পড়ে থাকতে দেখি। জঙ্গিরা অবাঙালিদের বাড়িঘর লুট করে এবং বহু বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করে। তারা শত শত নির্দোষ নারী-পুরুষ ও শিশুকে হত্যা করে এবং তাদের মৃতদেহ জ্বলন্ত বাড়িঘরে নিক্ষেপ করে।...

'পানির ট্যাংকের কাছাকাছি বহু অবাঙালি মেয়ের লাশ ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকে। আমি জানতে পারি যে, বিদ্রোহীরা তাদেরকে ধর্ষণ করার পর হত্যা করে। এ দৃশ্য ছিল অসহনীয়।'

www.pathagar.com

(৫) **পঞ্চম সাক্ষীর বিবরণ:** ২২ বছরের রওশনারা বেগম জানান, একজন বাঙালি প্রতিবেশী তাকে ও তার বৃদ্ধা শাশুড়িকে আশ্রয় দেয়। রওশনারা ঢাকার উপকণ্ঠে টঙ্গীতে একটি বাড়িতে বসবাস করতেন। ২৩ মার্চ তাদের বাড়ি আক্রান্ত হয়। বাঙালি বিদ্রোহীরা তাদের বাড়িতে অগ্নিসংযোগ এবং তার কিশোরী বোনকে অপহরণ করে। ১৯৭৩ সালের ডিসেম্বরে করাচি পৌঁছে তিনি নিচে উল্লেখিত হৃদয়বিদারক বর্ণনা দেন:

> 'আমার পিতামাতার জন্ম ভারতের বিহার রাজ্যে। কিন্তু আমার ভাই-বোন ও আমার জন্ম ঢাকায়। আমার পিতা পোস্টাল বিভাগে চাকরি করতেন। ১৯৪৭ সালে উপমহাদেশ বিভক্ত হওয়ার সময় তিনি পূর্ব পাকিস্তানে নিয়োগ লাভের আগ্রহ প্রকাশ করেন। তিনি টঙ্গীতে এক খণ্ড জমি ক্রয় করেন এবং সেখানে একটি ছোট্ট বাড়ি নির্মাণ করেন। আমরা শান্তিতে বসবাস করছিলাম এবং বাঙালি প্রতিবেশীদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক ছিল চমৎকার।...
>
> 'মার্চের প্রথম সপ্তাহ থেকে আওয়ামী লীগের জঙ্গি সমর্থকরা বাঙালিদের মধ্যে অবাঙালিদের বিরুদ্ধে ঘৃণা ছড়াতে থাকে। পরিস্থিতি ছিল উত্তপ্ত এবং আমরা ঢাকা নগরীর বিভিন্ন জায়গায় অবাঙালিদের বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগের খবর পাচ্ছিলাম। তবে আমাদের প্রতিবেশীরা ছিল চমৎকার মানুষ এবং তারা আমাদেরকে নিরাপত্তার আশ্বাস দেয়। আমরা সবাই চমৎকার বাংলা বলতে পারতাম। তবে আমাদের মাতৃভাষা ছিল উর্দু। তাই আমরা বিহারী হিসেবে পরিচিত ছিলাম। স্কুলে আমার শিক্ষার মাধ্যম ছিল বাংলা।...
>
> '১৯৭১ সালের ২৩ মার্চ রাতে আওয়ামী লীগের একদল সশস্ত্র দুষ্কৃতকারী আমাদের বাড়ি আক্রমণ করে। তারা লুট করার পর বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করে। আমাদের কোনো বন্দুক ছিল না। আক্রমণকারীরা আমার পিতা, স্বামী এবং দু'ভাইকে কাবু করার পর গুলিতে তাদের হত্যা করে। তারা আমার কিশোরী বোনকে অপহরণ করে। আমার পুরুষ আত্মীয়-স্বজন এবং দুষ্কৃতকারীদের মধ্যে সংঘর্ষের সময় আমি ও আমার মা বাড়ির পেছন দিক দিয়ে পালিয়ে যাই এবং একজন ভদ্র ও ধর্মভীরু বাঙালি প্রতিবেশীর বাড়িতে আশ্রয় নিতে সক্ষম হই। এ বাঙালি প্রতিবেশী ছিলেন আমাদের প্রতি সহানুভূতিশীল। তিনি আমাদেরকে তার বাড়িতে লুকিয়ে রাখেন। আমার ১৫ বছর বয়সী বোন ছিল নবম শ্রেণীর ছাত্রী। ২৬ মার্চ সেনাবাহিনী বিদ্রোহীদের তাড়িয়ে দেয়ার পর আমি তাকে খুঁজে বের করার জন্য অনেক চেষ্টা করি। কিন্তু তার খোঁজ পাইনি। বাঙালি বিদ্রোহীরা ঢাকায় শত শত অবাঙালি মেয়েকে অপহরণ করে এবং সেনাবাহিনী বিদ্রোহ নির্মূল করে দেয়ার আগে তারা অপহৃত মেয়েদের হত্যা করে। আড়াই বছরের পুত্র হচ্ছে আমার প্রিয়তম স্বামীর স্মৃতি। আমার স্বামী ফিরোজ আহমদ নিহত হওয়ার কয়েক মাস পর সে ভূমিষ্ঠ হয়।'

(৬) **ষষ্ঠ সাক্ষীর বিবরণ:** ২৪ বছরের জাহিদ আবদি বলেছে, সে একটি উর্দুভাষী মেয়ের আর্তনাদ শুনতে পায়। বাঙালি অপহরণকারীরা তাকে ধর্ষণ করছিল। কিন্তু জাহিদ এত আতঙ্কিত ছিল যে, সে আত্মগোপন অবস্থা থেকে বের হওয়ার সাহস পায়নি। জাহিদ ঢাকায় একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে চাকরি করতো। ১৯৭১ সালের ২৩ মার্চ সে ঢাকার জনাকীর্ণ নিউ মার্কেট এলাকায় অবাঙালি হত্যাযজ্ঞ থেকে রক্ষা পায়। একজন ধর্মভীরু বাঙালি তাকে তার নিজ দোকানে আশ্রয় দেন। ঘাতকরা দোকানের পেছনে একটি অবাঙালি অপহৃত

www.pathagar.com

কিশোরীকে ধর্ষণ করে। পরে ধর্ষিতা কিশোরীকে হত্যা করা হয়। জাহিদ আবদির হিসেব অনুযায়ী নিউ মার্কেট এবং তার আশপাশের এলাকায় আনুমানিক ২ হাজার অবাঙালিকে হত্যা করা হয়। ১৯৭৩ সালের অক্টোবরে করাচিতে ফিরে এসে জাহিদ তার সাক্ষ্যে বলেছে:

> '২৩ মার্চ আমি বাসে করে নিউ মার্কেটে যাচ্ছিলাম। গন্তব্যের কাছাকাছি পৌঁছে আমি আওয়ামী লীগের একদল গুণ্ডাকে দেখতে পাই। বন্দুক ও ড্যাগার সজ্জিত এসব গুণ্ডা লুটপাট করছিল। থামার আগেই আমি বাস থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ি এবং একটি লেনের দিকে দৌড়াতে থাকি। আমি শুনতে পেয়েছিলাম যে, আওয়ামী লীগের গুণ্ডারা কয়েক জন অবাঙালিকে নির্যাতন করে হত্যা করেছে। লেনের দিকে যাবার সময় আমি কয়েকজন আহত লোককে রাস্তায় এলোপাতাড়ি পড়ে থাকতে দেখি। আমি একজন বাঙালি দোকানদারকে চিনতাম। আমাকে দেখে তার দয়া হয় এবং তিনি আমাকে তার দোকানে লুকিয়ে রাখেন। কয়েকজন গুণ্ডাকে এগিয়ে আসতে দেখতে পেয়ে তিনি আমাকেসহ দোকানে তালা লাগিয়ে পাহারা দিতে থাকেন। গুণ্ডারা এগিয়ে এলে তিনি তাদের জানান, তিনি বাঙালি এবং বেচা কেনা শেষে দোকান বন্ধ করে দিচ্ছেন।...
>
> 'বাড়ি ফেরার রাস্তা নিরাপদ না হওয়ায় দোকানদারের পরামর্শে আমি তার দোকানে রাত কাটানোর সিদ্ধান্ত নেই। গভীর রাতে আমি উর্দুভাষী একটি মেয়ের আর্তনাদ শুনতে পাই। সে সাহায্যের জন্য চিৎকার করছিল। আমি যে দোকানে আত্মগোপন করেছিলাম সেই দোকানের পেছনে একটি অন্ধকার জায়গায় অপহরণকারীরা মেয়েটিকে ধর্ষণ করছিল। চারজন অপহরণকারী পালাক্রমে তাকে ধর্ষণ করে। পৈশাচিকতা শেষে গুণ্ডার দল তাকে গুলি করে হত্যা করে। তারপর তারা রাতের অন্ধকারে মিলিয়ে যায়। দোকান ছিল তালাবন্ধ। সকালে আমার রক্ষাকর্তা দোকান খুললে আমি তাকে বিগত রাতের বৃত্তান্ত শোনাই। আমরা মেয়েটির লাশের অনুসন্ধান করছিলাম। তার লাশের কোনো সন্ধান পাইনি। তবে ঘটনাস্থলে রক্তের দাগ এবং একটি মেয়ের পোশাকের ছিন্নভিন্ন অংশ পড়ে থাকতে দেখি। আমি বুঝতে পারলাম মেয়েটিকে ধর্ষণ করে হত্যা করা হয়েছে। আমার বাঙালি রক্ষাকর্তা অশ্রুসজল চোখে জানালেন যে, শত শত অবাঙালি মেয়ে একই নির্মম পরিণতি ভোগ করেছে এবং পিশাচের প্রেতাত্মারা শহরের সর্বত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে। গুণ্ডারা এ এলাকায় অবাঙালিদের কোনো দোকান অথবা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে ছাড় দেয়নি। তারা প্রতিটি দোকানের যাবতীয় লুট করে।...'

(৭) **সপ্তম সাক্ষীর বিবরণ::** ২৬ বছর বয়স্ক আনিসুর রহমান জানিয়েছেন, আওয়ামী লীগের জঙ্গি সমর্থকরা ১৯৭১ সালে মার্চের প্রথম সপ্তাহে সরকারি কর্তৃত্ব অগ্রাহ্য করায় আমি চাই-ছিলাম সেনাবাহিনী তাদের নির্মূল করে দিক। তিনি ঢাকায় একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে কাজ করতেন। আনিসুর রহমান ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট। তিনি নবাবপুর এলাকায় বসবাস করতেন। ১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে তিনি করাচিতে প্রত্যাবর্তন করেন। আনিসুর রহমান তার সাক্ষ্যে বলেছেন:

> '২৩ মার্চ আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে একদল উন্মত্ত জনতা নবাবপুর এলাকায় হামলা চালায়। তাদের অনেকের হাতেই ছিল অস্ত্র। তারা অবাঙালিদের ঘরবাড়ি

www.pathagar.com

লুট করে, অনেককে গুলি করে হত্যা করে এবং ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেয়। তারা অবাঙালিদের প্রতিটি দোকান লুট করে। এলাকায় আমার বেশ কয়েকজন আত্মীয় নিহত হয়। আমার পলায়ন অলৌকিক ঘটনা ছাড়া আর কিছু ছিল না।...

'আওয়ামী লীগের জঙ্গি সমর্থকদের পর্যাপ্ত অস্ত্র ও গোলাবারুদ ছিল। তাদের মধ্যে ছিল বহু হিন্দু। অস্ত্রধারী হিন্দুদের আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারে প্রশিক্ষিত বলে মনে হচ্ছিল। ৯ মার্চ আওয়ামী লীগাররা অবাঙালিদের সব অস্ত্র কেড়ে নেয়। অস্ত্র কেড়ে নেয়ায় আমরা অরক্ষিত হয়ে পড়ি। ঢাকায় আওয়ামী লীগের বিদ্রোহকালে মুক্তিপণ আদায়ে অবাঙালিদের অপহরণ এবং পরে তাদেরকে হত্যা করা একটি সাধারণ নিয়মে পরিণত হয়। শহরে শত শত ভুঁইফোড় ছাত্র সংগঠনের জন্ম হয়। এসব ছাত্র সংগঠনের গুণ্ডা-পাণ্ডারা রাস্তায় মাস্তানি করতো এবং অবাঙালিদের ঘরবাড়ি লুট করতো। আওয়ামী লীগ হাইকমান্ড অবাঙালিদের ব্যাংক একাউন্ট জব্দ করে এবং অর্থ উত্তোলনে তাদের অধিকারের ওপর বিধি নিষেধ আরোপ করে। অবাঙালিদের নগদ অর্থ উত্তোলনে নিষেধাজ্ঞা কার্যকরের ক্ষমতা পেয়ে আওয়ামী লীগের ক্যাডাররা লাভবান হয়। অপহরণকারীরা মুক্তিপণ হিসেবে অবস্থাপন্ন পশ্চিম পাকিস্তানিদের গাড়িগুলো কেড়ে নেয়। ১ থেকে ২৫ মার্চ পর্যন্ত ঢাকায় কোনো সরকার ছিল না। উল্লেখ করার মতো কোনো প্রশাসন ছিল না। সর্বত্র ছিল গুণ্ডাদের রাজত্ব। সরকারের প্রতি অনুগত কতিপয় বাঙালি বেসামরিক আমলা নিজ নিজ অফিসে যেতে চাইতেন। আওয়ামী লীগ ক্যাডাররা তাদেরকে হুঁশিয়ার করে দেয় যে, ধর্মঘট পালনে শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশ অমান্য করলে প্রিয়জনসহ তাদেরকে হত্যা করা হবে।...

(৮) **অষ্টম সাক্ষীর বিবরণ:** ৫৫ বছরের মোহাম্মদ তাহা বলেছেন, ১৯৭১ সালে মার্চের তৃতীয় সপ্তাহে ঢাকা ছিল একটি সন্ত্রাস ও অগ্নিসংযোগের নগরী। তিনি এ দুঃস্বপ্নের সময়টিতে ঢাকার মোহাম্মদপুরে নূরজাহান রোডে নিজ বাসায় অবস্থান করছিলেন। পূর্ব পাকিস্তানে তিনি মুক্তিবাহিনীর হাত থেকে পালিয়ে যান। ১৯৭৪ সালের মার্চে তিনি পাকিস্তানে প্রত্যার্বতন করেন। তিনি তার সাক্ষ্যে বলেছেন:

'১৯৭১ সালে মার্চের দ্বিতীয় সপ্তাহে আওয়ামী লীগের সহিংসতার মাত্রা আকস্মিকভাবে বৃদ্ধি পায় এবং লাখ লাখ অবাঙালির জীবন দুঃস্বপ্নে পরিণত হয়। অবাঙালিরা কখনো রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামাতো না।'

'অগ্নিসংযোগ, ধর্ষণ ও হত্যাকাণ্ড নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়ায়। হত্যাযজ্ঞের সময় আমার তিনজন আত্মীয় নিহত হয়। নরপিশাচের দল রাস্তায় ও বাড়িঘরে অবাঙালিদের হত্যা করে। বাঙালি পুলিশ উধাও হয়ে যায়। নিষ্ঠুর বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী অভিযান শুরু করলে অবাঙালিরা আল্লাহকে ধন্যবাদ দেয়। কিন্তু ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর ভারতীয় সৈন্য ও মুক্তিবাহিনী ঢাকা দখল করে নিলে অবাঙালিদের ওপর আবার নারকীয় তাণ্ডব নেমে আসে। বিজয়ী মুক্তিবাহিনী ও তাদের ট্রিগার হ্যাপি সহযোগীরা হাজার হাজার নির্দোষ মানুষকে হত্যা করে।'

www.pathagar.com

(৯) **নবম সাক্ষীর বিবরণ:** ৩০ বছরের শাহ ইমাম ঢাকায় ব্যবসা করতেন। তিনি বিক্রমপুর এলাকায় বসবাস করতেন। ১৯৭৪ সালের মার্চে তিনি করাচিতে প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি তার সাক্ষ্যে বলেছেন:

> '১৯৭১ সালে মার্চের তৃতীয় সপ্তাহে বাঙালি বিদ্রোহীরা আমার মামা, আমার বড় ভাই ও তার কিশোর পুত্রকে বরিশাল থেকে ঢাকা আসার পথে একটি স্টীমারে হত্যা করে।...
> 'আমি বাঙালি বার্জম্যানের কাছ থেকে জানতে পারি যে, মাঝ নদীতে প্রায় ৫০ জন সশস্ত্র বাঙালি 'জয় বাংলা' শ্লোগান দিয়ে অবাঙালি যাত্রীদের ওপর হামলা চালায়। তারা সারেংকে নদীর একটি নির্জন তীরে স্টীমার থামাতে বাধ্য করে। বিদ্রোহীরা অবাঙালি যাত্রীদের নদীর তীরে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে গুলি করে হত্যা করে। বিদ্রোহীরা নিহত নর-নারী ও শিশুদের শরীর থেকে মূল্যবান সামগ্রী কেড়ে নিয়ে লাশগুলো নদীতে ফেলে দেয়। সেনাবাহিনী বিদ্রোহীদের নির্মূল করে দেয়ার পর আমি আমার নিহত আত্মীয়-স্বজনের মৃতদেহ খুঁজে বের করার চেষ্টা করি। আমি বধ্যভূমি দেখতে যাই। নদীর তীরে রক্তের দাগ দেখতে পেলেও আমি তাদের খুঁজে পাইনি।...

(১০) **দশম সাক্ষীর বিবরণ:** ৪৩ বছরের মোখতার আহমেদ খান জানান, তার একমাত্র মেয়ের স্বামীকে হত্যা করা হয়। স্বামীকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করার দৃশ্য দেখতে বাধ্য করায় তার মেয়ে পাগল হয়ে যায়। ১৯৭৪ সালের জানুয়ারিতে মোখতার আহমেদ করাচিতে ফিরে আসেন। তিনি তার সাক্ষ্যে বলেছেন:

> 'আমরা ঢাকার আবদুল আজিজ লেনে একটি ভাড়া বাসায় বসবাস করতাম। আমি ব্যবসা করতাম। আমার ব্যবসায় উন্নতি হচ্ছিল। আমি একজন প্রতিশ্রুতিশীল তরুণের সঙ্গে আমার মেয়েকে বিয়ে দেই।...
> '১৯৭১ সালে মার্চের তৃতীয় সপ্তাহে একদল সশস্ত্র বাঙালি বিদ্রোহী আমার জামাতার বাড়িতে আক্রমণ চালায় এবং তাকে পর্যুদস্ত করে। সে ছিল একজন সাহসী তরুণ। সে আক্রমণকারীদের প্রতিহত করার চেষ্টা করে। আমার মেয়েও আক্রমণকারীদের প্রতিরোধ করার চেষ্টা করে। কিন্তু আক্রমণকারীরা সংখ্যায় ছিল বেশি এবং তারা ছিল সশস্ত্র। তারা আমার মেয়ে জামাই ও মেয়েকে দড়ি দিয়ে বাঁধে। আক্রমণকারীরা আমার মেয়ের স্বামীর গলা কেটে ফেলে এবং কসাইয়ের স্টাইলে তার পেট চিঁড়ে ফেলে। আমার মেয়েকে এ নির্মম দৃশ্য দেখতে বাধ্য করা হয়। আমার মেয়ে মূর্ছা গিয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। সেই ভয়াবহ দিন থেকে আমার মেয়ে মানসিকভাবে অসুস্থ। এ স্মৃতি মনে হলে সে থর থর করে কাঁপে এবং আর্তনাদ করে উঠে।'

(১১) **একাদশ সাক্ষীর বিবরণ:** ২২ বছরের আয়েশা খাতুন জানায়, তারা ঢাকার উপকণ্ঠে টঙ্গীতে তাদের আহত পিতাকে নিয়ে জঙ্গলে আশ্রয় নিয়েছিল। সেখানে তারা তিনদিন পানি ও বন্য ফলমূল খেয়ে বেঁচে থাকে। ১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে আয়েশা করাচিতে প্রত্যাবর্তন করে। সে তার সাক্ষ্যে বলেছে:

> '১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ একদল বিদ্রোহী আমাদের বাড়িতে প্রবেশ করে এবং আমাদের মূল্যবান সবকিছু লুট করে। তারা ট্রাকে করে লুণ্ঠিত মালামাল নিয়ে যায়। আমার ব্যবসায়ী পিতা নূরুদ্দিন হামলাকারীদের প্রতিরোধ করার চেষ্টা করেন। বাঙালি বিদ্রোহীরা তার বুকে ছরিকাঘাত করে এবং মালামাল নিয়ে পালিয়ে যায়।...

www.pathagar.com

'বিদ্রোহীরা বলে গিয়েছিল তারা আবার ফিরে আসবে। তাই আমি ও আমার ভাই আমার পিতাকে নিকটবর্তী জঙ্গলে নিয়ে যাই। আমরা একটি বিছানার চাদর বিছিয়ে দেই। আমার পিতা বিছানার চাদরে শুয়ে পড়েন। আমি তার ক্ষত স্থান ব্যান্ডেজ করে দেই। কিন্তু আমাদের কোনো খাবার ছিল না। আমার ভাই পুকুর থেকে পানি এবং কিছু বন্য ফলমূল নিয়ে আসে। এসব খেয়ে আমরা তিনদিন ছিলাম। ২৮ মার্চ আমরা কয়েকজন পাকিস্তানি সৈন্যকে দেখতে পাই। আমার ভাই তাদের দিকে দৌড়ে যায়। সৈন্যরা আমাদেরকে পুনরায় বাড়িতে নিয়ে আসে। আরোগ্য লাভ না করা পর্যন্ত আমি আমার পিতার সেবা করি।...

'তবে আমাদের জন্য আরো দুর্ভাগ্য অপেক্ষা করছিল। ৯ মাসের কম সময়ের মধ্যে মুক্তিবাহিনী ঢাকায় অবাঙালিদের বিরুদ্ধে অভিযান চালায়। ১৯৭১ সালে ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে একদল সশস্ত্র বাঙালি আমাদের বাড়িতে আসে এবং আমার স্বামী জাফর আলমকে ধরে ফেলে। তারা নগদ অর্থ ও আমার অলঙ্কার তাদের কাছে অর্পণ করার নির্দেশ দেয়। আমার কাছে দেয়ার মতো কিছুই ছিল না। তারা জানায় যে, আমার পিতা বিদ্রোহী দলের প্রধানের নামে বাড়ি লিখে দেয়ার ভুয়া দলিলে স্বাক্ষর দিলে তারা আমার স্বামীকে ছেড়ে দেবে। আমার স্বামীর জীবন বাঁচাতে আমার পিতা তৎক্ষণাৎ দলিলে স্বাক্ষর দিতে সম্মত হন। বিদ্রোহীরা আমার স্বামীকে জিজ্ঞাসাবাদ করার পর ফিরিয়ে দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। পুরো দু'বছর হয়ে গেলো। তার কোনো খোঁজ পাইনি। আমার মনে হয় বিদ্রোহীরা তাকে হত্যা করেছে। আমি বুঝতে পারছি যে, ১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তান দখল করে নেয়ার পর বিদ্রোহীরা আমাদের সঙ্গে যে আচরণ করেছিল, তারা অন্যান্য অবাঙালির সঙ্গেও অনুরূপ আচরণ করেছে। বিদ্রোহীরা আমাদেরকে বাড়ি থেকে বের করে দেয় এবং আমরা ঢাকায় রেডক্রস ক্যাম্পে বসবাস করেছি।...

(১২) **দ্বাদশ সাক্ষীর বিবরণ:** ৪০ বছরের আলিয়া বিবি তার পুত্র নিয়ে ঢাকার মোহাম্মদপুরে বসবাস করতেন। ১৯৭৪ সালের জানুয়ারিতে তিনি করাচিতে প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি তার সাক্ষ্যে বলেছেন:

'১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ আওয়ামী লীগের একদল জঙ্গি সমর্থক আমাদের বাড়িতে হামলা চালায় এবং লুটতরাজ করে। তারা কোনো মূল্যবান সামগ্রী লুট করতে ভুল করেনি। আমার ১৬ বছর বয়সের ছেলে একটি আমগাছে আরোহণ করায় বিদ্রোহীরা তাকে দেখতে পায়নি।...

'তবে ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে মুক্তিবাহিনী তাকে হত্যা করে। তখন থেকে আমার জীবন বিষাদময়।...

(১৩) **ত্রয়োদশ সাক্ষীর বিবরণ:** ৩৫ বছরের সায়রা খাতুন ঢাকার মিরপুরে বসবাস করতেন। ১৯৭১ সালের মার্চে তার স্বামী আবদুল হামিদ নিহত হন। তিনি তার সাক্ষ্যে বলেছেন:

'২৫ মার্চ আমার স্বামী শহরে একটি সমাবেশে যোগ দেয়ার জন্য মিরপুরে আমাদের বাসা থেকে বের হন। পথে বাঙালি বিদ্রোহীরা ওঁৎ পেতে থাকে এবং তাকে হত্যা করে।...

'তার লাশ খুঁজে না পাওয়ায় আমি আমার স্বামীকে জীবিত অথবা মৃত যে কোনো অবস্থায় খুঁজে বের করে দেয়ার জন্য সেনাবাহিনীকে অনুরোধ করি। কিন্তু সেনাবাহিনী চেষ্টা

www.pathagar.com

করেও তার কোনো সন্ধান পায়নি। তখন আমার এ ধারণা হয় যে, ঢাকা এবং পূর্ব পাকিস্তানের অন্যান্য জায়গায় আমার পুরুষ আত্মীয়-স্বজনের যে পরিণতি হয়েছে, তার পরিণতিও হয়েছে একই।...

'আমি বিশ্বাস করতে বাধ্য যে, ১৯৭১ সালের মার্চে বিদ্রোহীরা আমার স্বামীকে হত্যা করেছে। এসময় শত শত অবাঙালি কিশোরীকে অপহরণ, ধর্ষণ ও হত্যা করা হয়।'

(১৪) **চতুর্দশ সাক্ষীর বিবরণ:** ৩৩ বছরের জেবুন্নিসা ঢাকার মোহাম্মদপুরে নূরজাহান রোডে একটি ফ্ল্যাটে বসবাস করতেন। তার স্বামী আবদুস সালাম পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল এয়ার-লাইন্সের ঢাকা অফিসে একজন ড্রাইভার হিসেবে চাকরি করতেন। বাঙালি বিদ্রোহীরা তাদের বাড়িতে হামলা করে তার স্বামীকে হত্যা করে। ১৯৭৩ সালের ডিসেম্বরে জেবুন্নিসা তার পুত্র নিয়ে ঢাকা থেকে করাচিতে প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি তার সাক্ষ্যে বলেছেন:

'১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ আওয়ামী লীগের একদল চরমপন্থী আমাদের বাসায় হামলা করে। আমার স্বামী তাদের প্রতিহত করে এবং তাদের সঙ্গে তার ধস্তাধস্তি হয়। হামলাকারীরা ছিল সশস্ত্র এবং তারা তাকে পরাজিত করে। তারা তাকে ছুরিকাঘাত করে এবং পরে আমাদের বাড়ি লুট করে। হামলাকারীরা বিদায় নেয়ার পর আমি আমার স্বামীর দেহে জীবনের স্পন্দন লক্ষ্য করি। পরদিন সকালে তাকে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাই। বিদ্রোহীরা বিতাড়িত হলেও হাসপাতালের বাঙালি স্টাফ ছিল আতঙ্কিত। বাঙালি স্টাফ অধিক মনোযোগ দিতে না পারায় আমার স্বামী মারা যান।...

'১৯৭১ সালে ১৬ ডিসেম্বরের পর আমার ১০ বছরের পুত্র এবং আমি আবার দুর্ভোগের মুখোমুখি হই। মুক্তিবাহিনী আমার পুত্রকে অপহরণ করার চেষ্টা করে। তাই আমরা রেডক্রস শিবিরে আশ্রয় লাভ করা নাগাদ তাকে কয়েক দিন লুকিয়ে রাখি। মুক্তিবাহিনী রেডক্রস শিবির থেকেও অবাঙালি পুরুষ ও মেয়েদের অপহরণ করতো।...

(১৫) **পঞ্চদশ সাক্ষীর বিবরণ:** ২৮ বছরের শামিম আখতারের স্বামী ফসিহউদ্দিন ঢাকায় রেলওয়ে অফিসে কেরাণী হিসেবে চাকরি করতেন। মিরপুরে ছোট্ট একটি বাড়িতে তারা বাস করতেন। স্থানীয় বিহারী তরুণরা শক্তিশালী প্রতিরোধ গড়ে তোলায় তারা ১৯৭১ সালের গণহত্যা থেকে রক্ষা পান। কিন্তু ১৯৭১ সালে ডিসেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে ভারতীয় সেনাবাহিনী ও মুক্তিবাহিনী পূর্ব পাকিস্তান দখল করে নেয়ার পর শামিম, তার স্বামী ও তিন সন্তানের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠে। ১৯৭৪ সালের জানুয়ারিতে শামিম ঢাকা থেকে পাকিস্তানে প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি তার সাক্ষ্যে বলেছেন:

'১৯৭১ সালের ১৭ ডিসেম্বর মুক্তিবাহিনী আমাদের বাড়ির পানি সরবরাহ বিচ্ছিন্ন করে দেয়। আমরা নিকটবর্তী একটি পুকুর থেকে পানি সংগ্রহ করতাম। পুকুরের পানি ছিল দূষিত এবং দুর্গন্ধযুক্ত। আমি ছিলাম ৯ মাসের অন্তঃসত্ত্বা। ১৯৭১ সালের ২৩ ডিসেম্বর আমার একটি মেয়ে শিশু জন্ম নেয়। কোনো ধাত্রী পাওয়া না যাওয়ায় প্রসবে আমার স্বামী আমাকে সহায়তা করে। গভীর রাতে একদল সশস্ত্র বাঙালি আমাদের বাড়িতে হামলা করে আমার স্বামীকে ধরে নিয়ে যায়। আমি আল্লাহর দোহাই দিয়ে তাকে ছেড়ে দেয়ার জন্য তাদের কাকুতি-মিনতি করি। আমার সন্তানরা ছিল খুব ছোট। আমি হাঁটতে

www.pathagar.com

পারতাম না। হামলাকারীরা ছিল হৃদয়হীন। আমি জানতে পারি আমার স্বামীকে হত্যা করা হয়েছে। ৫ দিন পর হামলাকারীরা ফিরে আসে এবং তারা আমাকে ও আমার সন্তানদের বাড়ি খালি করার নির্দেশ দেয়। তারা দাবি করে এই বাড়ি এখন তাদের সম্পত্তি।...

'হামলাকারীদের নেতা বললো, বিহারীদের বাংলাদেশে বাস করার কোনো অধিকার নেই। বন্দুকের নলের মুখে তারা আমাকে আমার সন্তানসহ একটি খোলা মাঠে তাড়িয়ে নিয়ে যায়। আমরা শীতের রাতে সেই মাঠে খোলা আকাশের নিচে তিনদিন অবস্থান করি। আমার সন্তানরা ছিল ক্ষুধার্ত। আমি এত দুর্বল ছিলাম যে, তাদের জন্য এক মুঠো খাবার যোগাড় করতে পারিনি। একটি বিদেশি রেডক্রস টিমের দয়া হয় এবং এ টিম আমাদেরকে মোহাম্মদপুরে একটি ত্রাণ শিবিরে নিয়ে যায়।...

(১৬) **ষোড়শ সাক্ষীর বিবরণ:** ৩০ বছরের জেবুন্নিসা হকের স্বামী ছিলেন সাংবাদিক। তার নাম ছিল ইজহারুল হক। ইজহারুল হক ঢাকায় দৈনিক ওয়াতানে একজন কলামিস্ট হিসেবে চাকরি করতেন। ১৯৭৪ সালের জানুয়ারিতে জেবুন্নিসা হক পাকিস্তানে প্রত্যাবাসন করেন। তিনি তার সাক্ষ্যে বলেছেন:

'আমরা ঢাকার মোহাম্মদপুরে রাজিয়া সুলতানা রোডে আমাদের নিজেদের বাসায় বসবাস করতাম। আমার স্বামী আগে দৈনিক পাসবানে চাকরি করতেন। তিনি একজন উর্দু লেখক ও সাংবাদিক হিসেবে সুপরিচিত ছিলেন।...

'১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ আওয়ামী লীগের একদল সশস্ত্র কর্মী আমাদের এলাকায় হামলা করে এবং আমাদের বাড়ি লুট করে। আমার স্বামী বাসায় ছিলেন না। নয়তো হামলাকারীরা তাকে অপহরণ করতো।...

'১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর ভারতীয় সেনাবাহিনী ও মুক্তিবাহিনী ঢাকা দখল করে নেয়ার পর অবাঙালি বিশেষ করে মোহাম্মদপুর ও মিরপুরে বসবাসকারীদের ওপর ত্রাস ও মৃত্যুর রাজত্ব কায়েম হয়। হামলাকারীদের নিবৃত্ত করার জন্য আমার স্বামীসহ এলাকার এক ডজন তরুণ বিহারী রাতে টহল দিতো। ১৯ ডিসেম্বর রাতে একদল সশস্ত্র বাঙালি আমাদের এলাকায় হামলা করে এবং আমার স্বামীকে গুলি করে হত্যা করে। তার লাশ দেখার পর আমার পৃথিবী অন্ধকার হয়ে আসে। তিনি জনপ্রিয় হওয়ায় এবং দুরন্ত সাহসের সঙ্গে প্রতিবেশীদের নিরাপত্তা রক্ষা করায় গোটা এলাকার লোকজন তার জন্য কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে।...

'২১ ডিসেম্বর মুক্তিবাহিনীর একদল সদস্য এবং আরো কয়েকজন সশস্ত্র লোক শানিত অস্ত্র উঁচিয়ে গাড়িতে চড়ে আমাদের এলাকায় প্রবেশ করে এবং বাড়ি ত্যাগ করার জন্য আমাদের নির্দেশ দেয়। তারা বললো, বাংলাদেশে কোনো বিহারীর বাড়ি থাকতে পারে না। আমরা দু'দিন খোলা আকাশের নিচে একটি উন্মুক্ত জায়গায় কাটাই। আমাদের কোনো খাবার ছিল না। পরবর্তীতে রেডক্রস আমাদেরকে একটি ত্রাণশিবিরে তুলে নিয়ে যায়।'

(১৭) **সপ্তদশ সাক্ষীর বিবরণ:** ৪০ বছরের ফাতিমা বিবির স্বামী টঙ্গীতে একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে চাকরি করতেন। ১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে ফাতিমা বিবি করাচিতে প্রত্যাবাসন করেন। তিনি তার সাক্ষ্যে বলেছেন:

www.pathagar.com

'১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ আওয়ামী লীগের সশস্ত্র লোকজন আমাদের বাড়ি লুট করে এবং আমার স্বামী আবদুর রহমানকে মারধর করে। আমার স্বামী তাদের প্রতিরোধ করার চেষ্টা করেন। ঘটনার সময় আমার তিন তরুণ সন্তান বাড়ির বাইরে ছিল। আমার সন্তানরা ছিল সাহসী। তারা লুণ্ঠনকারীদের শাস্তি দেয়ার শপথ গ্রহণ করে। ১৯৭১ সালের এপ্রিলে তারা রাজাকার বাহিনীতে যোগদান করে এবং সংশ্লিষ্ট বাঙালিদের উপযুক্ত শাস্তি দেয়।...

'১৯৭১ সালে ডিসেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে ভারতীয় সেনাবাহিনী ও মুক্তিবাহিনী ঢাকা দখল করে নেয়ার পর আমার তিন ছেলে নিহত হয়। ১৯৭১ সালের ১৭ ডিসেম্বর ৩০ জনের একটি সশস্ত্র বাঙালি গ্রুপ আমাদের বাড়িতে হামলা করে এবং আমার স্বামীকে নির্মমভাবে হত্যা করে। তারা বন্দুকের ডগার মুখে আমাকে তিন সন্তান নিয়ে বাড়ি ত্যাগের হুকুম দেয়। আমরা নিকটবর্তী জঙ্গলে আশ্রয় নেই। আমরা পানি ও বন্য ফলমূল খেয়ে বেঁচে থাকি। আমরা ঘাসের ওপর ঘুমাতাম। আমার ক্ষুধার্ত সন্তানদের চিৎকারে আমার হৃদয় ভেঙ্গে যেতো। আমি আত্মহত্যার কথা ভাবতে থাকি। আত্মহত্যার জন্য রেলওয়ে লাইনে এগিয়ে যাই। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা ছিল অন্য রকম। রেডক্রসের একটি টিম জীপে করে আমাদেরকে অতিক্রম করছিল। তারা আমাদেরকে থামার ইঙ্গিত দেয়। আমরা তাদের কাছে আমাদের অবস্থা বর্ণনা করায় তারা আমাদেরকে মোহাম্মদপুরে রেডক্রস শিবিরে নিয়ে যায়। রেডক্রস শিবিরে আমরা দু'বছরের বেশি অবস্থান করেছি।'

(১৮) **অষ্টাদশ সাক্ষীর বিবরণ:** ৩৩ বছরের নূর জাহানের স্বামী মোখতার আহমেদ ঢাকায় টিএন্ডটিতে চাকরি করতেন। নূর জাহান গুলিস্তান কলোনিতে সরকারি স্টাফ কোয়ার্টারে বসবাস করতেন। ১৯৭৪ সালের জানুয়ারিতে তিনি করাচিতে প্রত্যাবাসন করেন। তিনি তার সাক্ষ্যে বলেছেন:

'আমরা ঢাকায় ১৯৭১ সালের মার্চে অবাঙালি গণহত্যা থেকে বেঁচে যাই। কিন্তু ১৯৭১ সালে ডিসেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে ভারতীয় বাহিনী ও মুক্তিবাহিনী ঢাকা দখল করে নেয়ার পর একদল সশস্ত্র বাঙালি আমার স্বামীকে হত্যা করে। তাকে হত্যা করার পর প্রায় ২০জন সশস্ত্র ব্যক্তির একটি দল আমাদের বাড়িতে হামলা চালায় এবং যাবতীয় মূল্যবান সামগ্রী লুট করে। তারা বন্দুকের নলের মুখে আমাদেরকে বাড়ি থেকে বের করে দেয়। আমরা রাস্তায় এসে দাঁড়াই। আরেকদল সশস্ত্র বাঙালি আমাদেরকে একটি বিরাট ভবনে নিয়ে যায়। সেখানে আরো ৫ শত বিহারী নারী ও শিশু অবস্থান করছিল। এসব বিহারী মহিলার স্বামীদের হত্যার উদ্দেশ্যে অপহরণ করা হয়েছিল। হুঁশিয়ার করে দেয়া হয় যে, আমাদের কেউ পালানোর চেষ্টা করলে গুলি করে হত্যা করা হবে। আমরা আমাদের সন্তানদের নিরাপত্তার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করতাম। ৫ দিন অনাহার ও নির্যাতন সহ্য করার পর রেডক্রসের একটি টিম আমাদেরকে ঢাকার মোহাম্মদপুরে ত্রাণ শিবিরে নিয়ে যায়। প্রতি সপ্তাহে মুক্তিবাহিনী অসংখ্য বিহারী তরুণ ও নারীকে অপহরণ করায় ত্রাণ শিবিরে আমাদের জীবন দুঃস্বপ্নে পরিণত হয়। মৃত্যুভয় আমাদেরকে গ্রাস করে। পরদিন ভোরে আমরা জীবিত থাকবো কিনা তা জানতাম না। অনেকে ভয়ে রাতে ঘুমাতো না। শিবিরে অবস্থানরত বহু মহিলা রাতে আতকে উঠতো। তাদের চোখের সামনে হয়তো তাদের স্বামী নয়তো পুত্রকে হত্যা করা হয়েছিল। এ নির্মম স্মৃতি তাদেরকে সারাক্ষণ তাড়া করতো।'

www.pathagar.com

(১৯) **উনিশতম সাক্ষীর বিবরণ:** ৩০ বছরের আনোয়ারী বেগমের স্বামী সৈয়দ মোস্তফা হোসেন ঢাকায় টিএন্ডটিতে চাকরি করতেন। তারা মিরপুরে নিজেদের বাড়িতে বসবাস করতেন। আনোয়ারী বেগম ১৯৭৩ সালের অক্টোবরে সন্তানসহ করাচিতে প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি তার সাক্ষ্যে বলেছেন:

> '১৯৭১ সালের মার্চে পূর্ব পাকিস্তানে অবাঙালি গণহত্যার সময় দিনাজপুরে পিতামাতাসহ আমার পরিবারের সকল সদস্যকে হত্যা করা হয়। দিনাজপুরে আমার পিতার একটি বাড়ি এবং কিছু জমি ছিল। ১৯৭১ সালে মার্চের তৃতীয় সপ্তাহে একদল সশস্ত্র বাঙালি মিরপুরে আমাদের বাড়ি লুট করে। তবে ডিউটিতে থাকায় আমার স্বামী হত্যাকাণ্ড থেকে রক্ষা পান।...
>
> '১৯৭১ সালে ডিসেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে মুক্তিবাহিনী আমার স্বামীকে হত্যা করে এবং আমাদের এলাকায় মোতায়েন ভারতীয় সৈন্যরা তার লাশ আমাদের বাড়িতে পৌঁছে দেয়। তার গলা ছিল কাটা এবং তার শরীরের বেশ কয়েকটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছিল ক্ষত-বিক্ষত।...
>
> 'পরবর্তীতে মুক্তিবাহিনী আমাদেরকে বাড়ি থেকে বের করে দিলে আমরা রেডক্রস শিবিরে এসে আশ্রয় নেই।...

(২০) **বিশতম সাক্ষীর বিবরণ:** ৪৫ বছর বয়সের আল্লাহ রাখির স্বামী ছিলেন ঢাকার একজন উঠতি ব্যবসায়ী। আল্লাহ রাখি মিরপুরে ডি-ব্লকে নিজেদের বাড়িতে বসবাস করতেন। তিনি তার জীবনের ট্রাজেডি সম্পর্কে বলেছেন:

> '১৯৭১ সালে মার্চের তৃতীয় সপ্তাহে আওয়ামী লীগের একদল স্বেচ্ছাসেবক আমাদের বাড়ি লুট করে। এসময় আমি ছিলাম একা। স্বেচ্ছাসেবকরা বললো, তারা আমার স্বামী ও আমার অপ্রাপ্ত বয়স্ক দু'ছেলেকে অপহরণ করবে। কিন্তু সেনাবাহিনী বিদ্রোহীদের বিতাড়িত করায় আমরা ৯ মাস শান্তিতে ছিলাম।...
>
> 'ভারতীয় সেনাবাহিনী ও মুক্তিবাহিনী ঢাকা দখল করে নেয়ার পর ১৭ ডিসেম্বর বেশ কয়েকজন সশস্ত্র বাঙালি আমাদের বাড়িতে হামলা চালায়। তারা আমার বয়স্ক স্বামীকে আমাদের বাড়ির প্রাঙ্গণে গুলি করে। আমি আমার দু'ছেলেকে টয়লেটে লুকিয়ে রাখি। যে সময় সশস্ত্র বিদ্রোহীরা বিদায় নিচ্ছিল ঠিক তখন তাদের একজন টয়লেটে প্রবেশ করে। সে সেখানে আমার দু'ছেলেকে দেখতে পায়। আমার ছেলেরা বাঁচার জন্য চিৎকার করছিল। এ সশস্ত্র বাঙালি বিদ্রোহী সহায়তার জন্য চিৎকার করে উঠলে গোটা বাহিনী ভেতরে প্রবেশ করে এবং আমার ছেলেদের পরাস্ত করে। সশস্ত্র লোকজন আমার দু'ছেলেকে টেনে হিঁচড়ে বাড়ির উঠানে নিয়ে আমার চোখের সামনে গুলি করে হত্যা করে। সশস্ত্র বিদ্রোহীরা আমাকে চড়-থাপ্পর মারে। বেয়নেটের মুখে তারা আমাকে ট্রাকে উঠিয়ে রেডক্রস শিবিরে নিয়ে যায়। আমার বড় ছেলে পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে যোগদান করেছিল। তার কোনো খোঁজ পাচ্ছিলাম না। আমি জানতে পারি যে, মুক্তিবাহিনী আমার স্বামী ও দু'ছেলের লাশ নদীতে ফেলে দিয়েছে।...

(২১) **একুশতম সাক্ষীর বিবরণ:** ২৫ বছরের সালমা খাতুনের স্বামী নজর আলম খান ঢাকায় স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তানে চাকরি করতেন। ১৯৭৪ সালের জানুয়ারিতে সালমা

www.pathagar.com

ঢাকা থেকে করাচিতে প্রত্যাবাসন করেন। তিনি তার সাক্ষ্যে বলেছেন:

> '১৯৭১ সালে মার্চের তৃতীয় সপ্তাহে বাঙালি বিদ্রোহীরা রংপুরে আমার স্বামীর পিতামাতা ও বড় ভাইকে হত্যা করে। মার্চের তৃতীয় সপ্তাহে কয়েকজন সশস্ত্র বাঙালি বাসাবোতে আমার বাড়ি লুট করে। কিন্তু আমার স্বামী তাদের হাত থেকে বেঁচে যেতে সক্ষম হন।...
> '১৯৭১ সালে ডিসেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে যে সময় ভারতীয় সেনাবাহিনী ও মুক্তিবাহিনী ঢাকা শাসন করছিল সে সময় আমার স্বামী অফিসে যান। কিন্তু তিনি আর ফিরে আসেননি। ১৮ ডিসেম্বর রাতে একদল সশস্ত্র বাঙালি আমাদের বাড়ি লুট করে এবং আমাকে বাড়ি ছাড়ার জন্য শাসায়। তৃতীয় দিনেও আমার স্বামী বাড়ি ফিরে না আসায় আমি তার অফিসে যাই। অফিস ছিল বাইরে থেকে তালাবন্ধ। জানালা দিয়ে উঁকি দিয়ে আমি কঠোর দর্শন একদল লোককে পুরনো রেকর্ড, ব্যাংক নোট ও রেজিস্টার পুড়িয়ে ফেলতে দেখি। আমি একটি অন্ধকার স্টোর রুমেও উঁকি দেই। রুমটিতে ছিল রক্তের দাগ এবং ছিন্ন ভিন্ন কাপড়ের টুকরো। আমার মনে হলো অবাঙালি ব্যাংক কর্মচারীদের হত্যার জন্য রুমটি একটি কসাইখানা হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। আমি নিকটবর্তী স্টাফ কোয়ার্টারে আমার স্বামীর এক বাঙালি সহকর্মীর স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করি। তিনি আমাকে জানান যে, আমার স্বামী যেদিন নিখোঁজ হয়েছেন সেদিন মুক্তিবাহিনী ব্যাংকে হামলা করে এবং তারা ব্যাংকে কর্তব্যরত সকল অবাঙালি কর্মচারীকে হত্যা করে। তিনি আরো জানান, মুক্তিবাহিনী ব্যাংকের পেছনে তড়িঘড়ি করে খোড়া একটি গণকবরে এসব লাশ চাপা দিয়েছে।...
> 'আমি ও আমার এতিম সন্তানরা রেডক্রস শিবিরে দু'বছর অবস্থান করেছি। মুক্তিবাহিনী আমার বাড়ি দখল করে নেয় এবং আমাকে জানায় যে, বাংলাদেশে বিহারীরা এক ইঞ্চি জমির মালিকও থাকতে পারবে না।...

(২২) **বাইশতম সাক্ষীর বিবরণ:** ২২ বছরের কায়সার জাহান ও তার স্বামী ব্যবসায়ী আজিজ হোসেন ঢাকার মোহাম্মদপুরে নূরজাহান রোডে নিজেদের বাড়িতে বসবাস করতো। ১৯৭১ সালের মার্চে তারা অবাঙালি হত্যাযজ্ঞ থেকে রক্ষা পায়। বন্দুকধারীরা তাদের বাসায় গুলিবর্ষণ করলেও লুট করেনি। কিন্তু ১৯৭১ সালে ডিসেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে ভারতীয় বাহিনী ও মুক্তিবাহিনী পূর্ব পাকিস্তান দখল করে নিলে তাদের দুর্ভাগ্য শুরু হয়। ডিসেম্বরের প্রথমদিকে তার স্বামী ব্যবসায়িক প্রয়োজনে চট্টগ্রামে যায়। কয়েক সপ্তাহ কেটে যায়। তার কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি। কায়সার জাহান ১৯৭১ সালের ১৭ ডিসেম্বর চট্টগ্রামে অবাঙালি হত্যাকাণ্ডের কথা শুনেছিল। পরদিন মধ্যরাতে সশস্ত্র মুক্তিবাহিনী মোহাম্মদপুরে হামলা করে। তারা ভোর পর্যন্ত তার বাড়িতে গোলাগুলি অব্যাহত রাখে। আতংকিত কায়সার জাহান খুলনা যাবার সিদ্ধান্ত নেয়। সেখানে তার কিছু আত্মীয়-স্বজন বাস করতো। সে ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ থেকে নেপালে পালিয়ে যায়। ১৯৭৩ সালের ডিসেম্বরে নেপাল থেকে করাচিতে ফিরে যায়। কায়সার জাহান তার সাক্ষ্যে বলেছে:

> 'আমি আমার সোনার হার ও বালা বিক্রি করেফেলি এবং আমাদেরকে কলকাতা নিয়ে যেতে একজন দালালকে অতিরিক্ত ফি দেই। আরেকজন দালাল ভারত থেকে নেপালে মানুষ পাচার করতো। এই দালাল আমাদেরকে কাঠমন্ডু নিয়ে যেতে আরো বেশি অর্থ

www.pathagar.com

দাবি করে। কাঠমন্ডুতে আমরা কয়েক মাস চরম কষ্টে ছিলাম। ১৯৭৩ সালের ডিসেম্বরে জাতিসংঘ আমাদেরকে করাচিতে প্রত্যাবাসন করে।...

(২৩) **তেইশতম সাক্ষীর বিবরণ:** ৪০ বছরের কুলসুমের স্বামী আবদুল করিমের ঢাকায় নিজের সামান্য ব্যবসা ছিল। জগন্নাথ সাহা রোডে তারা তাদের নিজস্ব বাড়িতে বসবাস করতেন। ১৯৭১ সালের শুরুতে কুলসুম বিধবা হন। তার ২৪ বছরের পুত্র ইয়াসিন মধ্য ঢাকায় একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে চাকরি করতো। ১৯৭১ সালে মার্চের তৃতীয় সপ্তাহে আওয়ামী লীগের একদল সশস্ত্র লোক তার বাড়িতে হামলা চালিয়ে লুটপাট করে। হামলার সময় তার ছেলে বাড়িতে ছিল না। কিন্তু ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে কুলসুমের ক্ষুদ্র জীবন তছনছ হয়ে যায়। তিনি তার সাক্ষ্যে বলেছেন:

> '১২ ডিসেম্বর আমার পুত্র মোহাম্মদ ইয়াসিন তার অফিসে যায়। আমার পুত্র ছিল নির্ভীক। আমার পুত্র বলতো সে ভারতের বিমান হামলাকে ভয় পায় না। তাই সে কাজে যাবে। সন্ধ্যায় সিভিল ডিফেন্সের কর্মীরা আমার ছেলের ক্ষত-বিক্ষত লাশ নিয়ে এলে আমার মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ে। ইয়াসিন যে ভবনে কাজ করতো সেই ভবনে ভারতীয় বিমানের বোমাবর্ষণে সে নিহত হয়।...
>
> 'আমার ছেলের মৃত্যুতে আমি হতবুদ্ধি হয়ে পড়ি। ১৯৭১ সালে ডিসেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে মুক্তিবাহিনী আমার বাড়িতে হানা দেয় এবং আমার বাড়ি লুট করে। আমাকেও আমার ছোট তিন সন্তানকে রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দেয়। আমরা ঢাকায় রেডক্রস শিবিরে দু'বছরের অধিক বসবাস করেছি। ১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে আমরা পাকিস্তানে প্রত্যাবর্তন করি।'

(২৪) **চব্বিশতম সাক্ষীর বিবরণ:** ৪০ বছরের আয়েশা বেগম ১৯৭৩ সালের ডিসেম্বরে তিন এতিম সন্তান নিয়ে ঢাকা থেকে করাচিতে প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি তার সাক্ষ্যে বলেছেন:

> '১৯৭১ সালে মার্চের তৃতীয় সপ্তাহে আওয়ামী লীগের একদল সশস্ত্র লোক ঢাকার মিরপুরে আমাদের বাড়িতে গুলিবর্ষণ করে। কিন্তু সেনাবাহিনীর একটি টহল দল দেখে তারা পালিয়ে যায়।...
>
> '৯ মাস আমার স্বামী ব্যাংক কর্মচারী আবদুল বারী মিরপুরে আমাদের বাড়িতে শান্তিতে বসবাস করেন। কিন্তু ১৯৭১ সালে ডিসেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে আমাদের এলাকার কয়েকজন গ্যাংস্টারের নেতৃত্বে মুক্তিবাহিনীর একদল ছেলে আমাদের বাসায় প্রবেশ করে লুট করে। তারা আমাদেরকে তৎক্ষণাৎ বাড়ি ত্যাগ এবং রেডক্রস শিবিরে যাবার নির্দেশ দেয়। ঠিক তখন আমার স্বামী কাজ থেকে ফিরে আসেন। কয়েক মিনিটের মধ্যে মুক্তিবাহিনী তাকে ধরে ফেলে এবং বুকে গুলি করে তাকে হত্যা করে। আমি স্তম্ভিত ও নির্বাক হয়ে যাই। তাদের একজন আমাকে থাপ্পর মারে এবং হুমকি দেয় যে, অবিলম্বে আমি বাড়ি ত্যাগ না করলে আমাকে গুলি করে হত্যা করা হবে। আমার স্বামীকে কবর দেয়ার জন্য আমি তাদের কাছে কিছু সময় চাই। কিন্তু তারা আমাকে সময় দিতে অস্বীকৃতি জানায়। আমি আল্লাহর দোহাই দেই। তাদের দু'জন আমার স্বামীকে কবর দিতে আমাকে সহায়তা করতে রাজি হয়। আমরা কাছাকাছি একটি খোলা জায়গায়

www.pathagar.com

কবর খুড়ি। সেখানে আমার স্বামীকে চিরনিদ্রায় শায়িত করি। আমি ও আমার সন্তান রেডক্রস শিবিরে গিয়ে আশ্রয় নেই। সেখানে আমরা দু'বছর বসবাস করেছি।'

(২৫) **পঁচিশতম সাক্ষীর বিবরণ:** ৩০ বছরের নাজমুন্নিসা ১৯৭৪ সালের জানুয়ারিতে ঢাকা থেকে তিন এতিম সন্তান নিয়ে করাচিতে পৌছান। তারা মোহাম্মদপুরে রেডক্রস শিবিরে দু'বছর অবস্থান করেছিল। তার স্বামী পূর্ব পাকিস্তান সরকারের একজন কর্মচারী ছিলেন। মিরপুরে তার স্বামীর একটি বাড়ি ছিল। সেখানে তারা বসবাস করতেন। ১৯৭১ সালে মার্চের তৃতীয় সপ্তাহে নাজমুন্নিসার স্বামী ডিউটিতে থাকা অবস্থায় একদল বাঙালি তাদের বাড়ি লুট করে। ১৯৭১ সালে ডিসেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে অফিসে যাবার পথে মুক্তিবাহিনী তার স্বামীকে হত্যা করে। ১৮ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় মুক্তিবাহিনীর একটি দল নাজমুন্নিসার বাড়িতে হামলা করে এবং তাকে জানায় যে, তার স্বামীকে হত্যা করা হয়েছে। তারা তার স্বামীর লাশের কোনো সন্ধান দেয়নি। তারা স্টেনগান উঁচিয়ে অবিলম্বে তাকে বাড়ি খালি করার নির্দেশ দিয়ে বললো, বাঙালি শরণার্থীরা ভারত থেকে ফিরে আসছে। তাদেরকে ঠাঁই দিতে হবে। নাজমুন্নিসা তার সাক্ষ্যে বলেছেন:

> 'আমি ছিলাম বিধবা। আমার সন্তানরা ছিল এতিম। মুক্তিবাহিনী আমার সামনে অস্ত্র উঁচিয়ে আমাকে বাড়ি ছেড়ে দিতে বললো। আমরা রাস্তায় এসে দাঁড়াই। মুক্তিবাহিনীর মনোভাবে পরিবর্তন আসে। তারা আমাদেরকে একটি বিরাট ভবনে নিয়ে আসে। সেখানে আরো শত শত অসহায় অবাঙালি মহিলা ও শিশু গাদাগাদি করে বাস করছিল। মুক্তিবাহিনী তাদের পরিবারের পুরুষ সদস্যদের হত্যা করে। মুক্তিবাহিনীর এ কারাগারে আমাদের জীবন ছিল নরকতুল্য। রেডক্রসের একটি টিম আমাদের সন্ধান পায় এবং আমাদেরকে মোহাম্মদপুরের একটি শিবিরে আশ্রয় দেয়। রেডক্রসের লোকজন আমাদের জানায় যে, মুক্তিবাহিনী আমাদের হত্যা করার পরিকল্পনা করছে। এসময় আমরা নাটকীয়ভাবে রক্ষা পাই।'

ঢাকার কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শী জানিয়েছেন যে, শহরের অদূরে বেশ কয়েকটি স্থানে আওয়ামী লীগের চরমপন্থীরা তাদের আত্মীয়-স্বজনের ওপর সহিংসতা চালিয়েছে। এসব প্রত্যক্ষদর্শী যেসব জায়গার নাম উল্লেখ করেছেন সেগুলো হলো: কেরাণীগঞ্জ, জয়দেবপুর, মুন্সীগঞ্জ, রূপগঞ্জ, মাদারীপুর, পূবাইল, টঙ্গিবাড়ী, চাঁদপুর, মতলব বাজার, হাজীগঞ্জ ও বৈদ্যের বাজার। ১৯৭১ সালে মার্চের তৃতীয় ও চতুর্থ সপ্তাহে আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসী তৎপরতা চরম মাত্রায় পৌছলে এসব ছোট শহরে বসবাসকারী অবাঙালি পরিবারগুলো ঢাকায় পালিয়ে আসে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, ১৯৭১ সালে মার্চের শেষ সপ্তাহে বাঙালি বিদ্রোহীদের হাতে মুষ্টিমেয় অবাঙালি পরিবার নিহত হয়েছে। অবাঙালিদের বাড়িঘর লুণ্ঠিত হয়। এসব শহরের অবস্থাপন্ন অবাঙালি ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে মুক্তিপণ আদায় করা হয়। ১৯৭১ সালের ১৯ মার্চ ঢাকা থেকে ২২ মাইল দূরে জয়দেবপুরে আওয়ামী লীগের জঙ্গি কর্মীদের নেতৃত্বে জনতা সৈন্য চলাচল ব্যাহত করতে রেললাইন ও মূল সড়কে প্রতিবন্ধকতা স্থাপন করে। পাকিস্তানি সৈন্যদের সঙ্গে বিদ্রোহী বন্দুকধারীদের গুলিবিনিময় হয়। গুলিবিনিময়ে একজন বিদ্রোহী নিহত এবং দু'জন সৈন্য আহত হয়।

www.pathagar.com

১৯৭১ সালে মার্চের শেষ সপ্তাহে লুণ্ঠনকারীরা কেরাণীগঞ্জ ও মুন্সীগঞ্জে বহু অবাঙালির বাড়িঘর লুট করে এবং কয়েকজন অবাঙালিকে হত্যা করে। ১৯৭১ সালে মার্চের তৃতীয় ও চতুর্থ সপ্তাহে চাঁদপুরে অবাঙালিদের বিরুদ্ধে সহিংসতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। তবে সেখানে মৃতের সংখ্যা তত বেশি ছিল না। বৈদ্যের বাজারে বিদ্রোহীরা এক ডজন অবাঙালি পরিবারকে নিশ্চিহ্ন করে দেয় এবং তাদের সম্পদ লুট করে। কয়েকজন অবাঙালি ব্যবসায়ীকে জিম্মি করা হয়। পূবাইল ও টঙ্গিবাড়ীতে আওয়ামী লীগের চরমপন্থী ও তাদের সহযোগীরা কয়েক ডজন অবস্থাপন্ন বিহারীকে হত্যা করে। হামলার জন্য বিহারীদের দোকানপাট ছিল চমৎকার টার্গেট। এসব জায়গা থেকে কিশোরীদের অপহরণ করার সংবাদও পাওয়া যায়। সেনাবাহিনী তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার আগে এসব জায়গায় আওয়ামী লীগের জঙ্গি ও বিদ্রোহীরা অপহৃত অবাঙালি কিশোরীদের ধর্ষণ এবং হত্যা করে। নিজেদের অপরাধের প্রমাণ ধ্বংসে এসব ঘৃণ্য কাজ করা হতো। তবে ভারত সীমান্তের কাছে পশ্চাদপসরণকারী বিদ্রোহীরা অপহৃত অবাঙালি কিশোরীদের সঙ্গে করে নিয়ে যায়।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অধ্যায়

নারায়ণগঞ্জে সন্ত্রাস

(২৬) **ছাব্বিশতম সাক্ষীর বিবরণ:** ৩৮ বছরের আসগর আলী খান নারায়ণগঞ্জে পাকিস্তান ফ্যাব্রিক কোম্পানিতে ওভারশিয়ার হিসেবে চাকরি করতেন। তার মতো আরো কয়েকজন সাক্ষী জানান, আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ বাঙালি শ্রমিকদের বলেছিল যে, অবাঙালি শ্রমিকদের নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার পর তাদের শূন্যপদগুলোতে বেকার বাঙালিদের নিয়োগ দেয়া হবে। আসগর আলী তার সাক্ষ্যে বলেছেন:

> 'নারায়ণগঞ্জে অবাঙালিদের সংখ্যা বেশি ছিল না। অবাঙালিদের অনেকে দিনে সেখানে কাজ করতো এবং সন্ধ্যায় ঢাকায় ফিরে যেতো। মার্চের প্রথম সপ্তাহ থেকেই আওয়ামী লীগের চরমপন্থীরা নারায়ণগঞ্জে অবাঙালিদের বিরুদ্ধে বাঙালি মিল শ্রমিকদের প্ররোচিত করছিল। মার্চের মাঝামাঝি তারা অবাঙালিদের বাড়িঘর চিহ্নিত করে।'
>
> '২১ মার্চ আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে একদল উন্মত্ত জনতা কোম্পানির ফ্যাক্টরি ও কোয়ার্টারে হামলা চালায়। এসব কোয়ার্টারে অবাঙালি শ্রমিক ও তাদের পরিবার বসবাস করতো। তারা ফ্যাক্টরির কোনো ক্ষতি করেনি। তবে তারা অবাঙালি শ্রমিক ও তাদের পরিবারকে হত্যা করে। আমি ছিলাম আমার কোয়ার্টারে একা। আওয়ামী লীগ হামলা শুরু করলে আমি আমার এক অত্যন্ত প্রিয় বাঙালি বন্ধুর বাড়িতে পালিয়ে যাই। আমার বাঙালি বন্ধু আমাকে লুকিয়ে রাখায় আমি রক্ষা পাই।'
>
> '২৬ মার্চ বিকালে সেনাবাহিনী আমাদের ফ্যাক্টরি পরিদর্শন করে এবং ১৬০ জন অবাঙালির লাশ গণকবর দেয়ার ব্যবস্থা করে। অবাঙালিদের এসব লাশ তাদের কোয়ার্টারে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। বাঙালি উন্মত্ত জনতা প্রতিটি অবাঙালির বাড়ি লুট করে এবং সব মূল্যবান সামগ্রী নিয়ে চম্পট দেয়। আমি জানতে পারি যে, আমাদের ফ্যাক্টরির প্রতিটি অবাঙালিকে হত্যা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। অবাঙালি শ্রমিকরা বিহারী হিসেবে পরিচিত ছিল।'

(২৭) **সাতাইশতম সাক্ষীর বিবরণ:** ৩৮ বছরের গুলজার হোসেন ১৯৭১ সালের ২১ মার্চ নারায়ণগঞ্জে একটি বাস স্ট্যান্ডের কাছে ২২ জন অবাঙালি পুরুষ, মহিলা ও শিশুকে হত্যা করার দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেন। ১৯৭৩ সালের নভেম্বরে তিনি করাচিতে প্রত্যাবাসন করেন। গুলজার হোসেন তার সাক্ষ্যে বলেছেন:

> 'আমি নারায়ণগঞ্জে পাট ব্যবসায় নিয়োজিত ছিলাম। আমি একটি ভাড়া করা বাসায় বসবাস করতাম। আমার বাসা শহরের কেন্দ্রস্থল থেকে বেশি দূরে ছিল না। ১৯৭১ সালে মার্চের প্রথম সপ্তাহ থেকে আওয়ামী লীগাররা নারায়ণগঞ্জে গোলযোগ পাকানোর চেষ্টা করছিল। অবাঙালি জনগোষ্ঠীকে নির্মূল করা ছিল তাদের লক্ষ্য।'

www.pathagar.com

'২১ মার্চ শহরের কেন্দ্রস্থল ত্যাগ করতে না করতে ঢাকা অভিমুখী আমাদের বাস রাস্তায় থামানো হয়। আমি বাসের সামনের অংশে একটি সিটে বসা ছিলাম। ঠিক তখন আমি একদল লোকের হাতে বন্দুক, কিরিচ ও ছোরা দেখতে পাই। বন্দুকধারীরা 'জয় বাংলা' ও পাকিস্তান বিরোধী শ্লোগান দেয়। চালক তাদের ইঙ্গিতে বাস থামায়। বন্দুকধারীরা যাত্রীদের নামতে বাধ্য করে। একজন বন্দুকধারী বাঙালি ও অবাঙালিদের দু'টি পৃথক সারিতে দাঁড়ানোর নির্দেশ দেয়। আমি ঢাকার বিশুদ্ধ আঞ্চলিক উচ্চারণে বাংলা বলতে সক্ষম হওয়ায় বাঙালি যাত্রীদের সারিতে দাঁড়িয়ে যাই। বন্দুকধারীরা আমাদেরকে কয়েকটি বাংলা বাক্য উচ্চারণ করতে বললো। আমরা বাংলা বাক্য আওড়াই। আমি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হই। সশস্ত্র লোকজন বাঙালিদের সরে যাবার নির্দেশ দেয়। তারপর বন্দুকধারীরা সব ক'জন অবাঙালি পুরুষকে গুলি করে হত্যা করে। চারজন বন্দুকধারী দু'জন অবাঙালি যুবতীকে টেনে হিঁচড়ে ফাঁকা বাসের ভেতরে নিয়ে ধর্ষণ করে। ধর্ষণ করার পর বন্দুকধারীরা গুলি করে তাদেরকে এবং আরো অর্ধ ডজন নারী ও শিশুকে হত্যা করে। একইদিন দাঙ্গাবাজরা নারায়ণগঞ্জে অবাঙালি মালিকানাধীন কয়েকটি দোকান লুট করে।

(২৮) **আটাইশতম সাক্ষীর বিবরণ:** ২৫ বছরের নাসিমা খাতুন নারায়ণগঞ্জের পঞ্চবটিতে বসবাস করতেন। তার স্বামী মোহাম্মদ কামরুল হাসান একটি ভেজিটেবল অয়েল ম্যানুফ্যাকচারিং ফ্যাক্টরিতে চাকরি করতেন। ১৯৭৪ সালের জানুয়ারিতে ৪ বছরের এতিম কন্যা নিয়ে তিনি ঢাকার রেডক্রসের একটি শিবির থেকে করাচিতে প্রত্যাবর্তন করেন। নাসিমা তার সাক্ষ্যে বলেছেন:

'৩ মার্চ থেকে নারায়ণগঞ্জে উত্তেজনা বিরাজ করছিল। আওয়ামী লীগাররা অবাঙালি হত্যায় বাঙালিদের উত্তেজিত করছিল। ২৫ মার্চ রাতে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে একদল বাঙালি জনতা আমাদের এলাকায় অবাঙালিদের বাড়িঘর লুটপাটের চেষ্টা করে। কিন্তু সেনাবাহিনীর অভিযানের কথা প্রচারিত হওয়া মাত্র জনতা গা ঢাকা দেয়।...

'১৬ ডিসেম্বর ঢাকায় ভারতীয় সেনাবাহিনীর কাছে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্ত প্রচারিত হওয়া মাত্র ক্রুদ্ধ বাঙালি জনতা নারায়ণগঞ্জে অবাঙালিদের ওপর হামলা শুরু করে। একদল লোক আমার বাড়ি আক্রমণ করে এবং আমার সব অলঙ্কার, কাপড়-চোপড় ও আসবাবপত্র লুট করে। লুটপাটকারীরা রান্নার সামগ্রীও লুট করে। লুটপাটের সময় আমার স্বামী বাড়ির বাইরে ঢাকায় অবস্থান করছিলেন।...

'সশস্ত্র লোকজন বন্দুকের মুখে আমাদেরকে বাড়ি ছাড়তে বাধ্য করে এবং আমাদেরকে একটি খোলা চত্বরে নিয়ে যায়। সেখানে ৫শ'র বেশি অবাঙালি নারী-পুরুষ ও শিশুকে আটক রাখা হয়েছিল। প্রায় ৩০ জন বাঙালি বন্দুকধারী আমাদেরকে নদীর তীরে একটি স্কুল ভবনে নিয়ে যাচ্ছিল। আমরা অবসন্ন শরীর নিয়ে হাঁটছিলাম। পথে একটি বন্দি অসহায় মহিলার ৩ বছরের শিশু তার কোলে মারা যায়। মহিলা বন্দুকধারীদের কাছে তার মেয়েকে কবর খুঁড়ে দাফন করার অনুমতি চায়। নেতৃস্থানীয় কঠোর প্রকৃতির একটি লোক ক্রন্দনরত মায়ের কোল থেকে তার মৃত সন্তান কেড়ে নিয়ে নদীতে নিক্ষেপ করে। বন্দুকধারীরা সকল বন্দিকে স্কুল ভবনে ঠেলে দেয়। আমার শুকিয়ে যাওয়া গলা ভেজাতে একটু পানি চাই। কঠোর দর্শন একটি লোক আমাকে থাপ্পর মারে এবং রাইফেলের

www.pathagar.com

বাট দিয়ে আমার কাঁধে আঘাত করে। লোকটি আমাকে লোকে লোকারণ্য হলের ভেতর ঠেলে দেয়।...

'এক সপ্তাহ দৃশ্যত আমরা একটি নরকে বাস করেছি। প্রতি রাতে আমাদেরকে হুমকি দেয়া হতো। আটককারীরা আমাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করতো। একজন মহিলা পেটের ব্যথায় অজ্ঞান হয়ে পড়েন। তিনি চিকিৎসার জন্য ঢাকার একটি হাসপাতলে ভর্তি হওয়ার অনুমতি চান। মহিলা ছিলেন বৃদ্ধা ও ধার্মিক। বাঙালি আটককারীরা তাকে ঢাকা যাবার অনুমতি দেয়। এই বুদ্ধিমতী মহিলা মোহাম্মদপুরে ছুটে গিয়ে রেডক্রস কর্মকর্তাদের ৫শ' বন্দি বিহারী মহিলা ও শিশুর দুরবস্থা অবহিত করেন। আন্তর্জাতিক রেডক্রসের দু'টি টিম আমাদেরকে উদ্ধার করতে ছুটে আসে এবং আমাদেরকে মিরপুরে রেডক্রস শিবিরে নিয়ে যায়। মুক্তিবাহিনী দু'বার আমাদের শিবিরে হামলা করে। হামলায় দু'জন অসুস্থ তরুণীসহ কয়েকজন নিহত হয়। ১৯৭২ সালের এপ্রিল নাগাদ পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হয় এবং রাতের অন্ধকারে বিহারীদের অপহরণ করার মাত্রা কিছুটা হ্রাস পায়। রেডক্রস কর্মকর্তারা আমার নিখোঁজ স্বামীকে খুঁজে বের করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন। কিন্তু তাকে পাওয়া যায়নি। মনে হয় হাজার হাজার অবাঙালির মতো তাকেও হত্যা করা হয়েছে।'

(২৯) **ঊনত্রিশতম সাক্ষীর বিবরণ:** ৫২ বছর বয়স্ক আল্লা রাখা নারায়ণগঞ্জে একজন পাটের দালাল হিসেবে কাজ করতেন। তিনি ঢাকার পাটুয়াটুলিতে ভাড়া করা একটি বাসায় বসবাস করতেন। ১৯৭৪ সালের মার্চে তিনি করাচিতে প্রত্যাবাসন করেন। তিনি তার সাক্ষ্যে বলেছেন:

'ষাট দশকের মাঝামাঝির পর ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জের অধিকাংশ অবাঙালি ব্যবসায়ী আঁচ করতে পেরেছিলেন যে, একদিন তাদের পক্ষে পূর্ব পাকিস্তানে ব্যবসা করা কঠিন হবে। আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ পূর্ব পাকিস্তানের সহজ সরল বাঙালিদের মন পশ্চিম পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে ঘৃণায় বিষিয়ে তুলছিল।...

'১৯৭১ সালে ৩ মার্চের পর আমি উপলব্ধি করতে পারলাম যে, অবাঙালিদের বিরুদ্ধে বাঙালিদের মন বিষিয়ে তুলতে আওয়ামী লীগের প্রচারণা সফল হয়েছে এবং পাট ব্যবসায় নিয়োজিত আমার বাঙালি বন্ধুরা আমাদের সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠেন।....

'১৭ মার্চ আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত শুরু হয় এবং আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে একদল সন্ত্রাসী ইস্পাহানি জুট মিল প্রাঙ্গণে হত্যাকাণ্ডে মেতে উঠে। তারা ইস্পাহানি কলোনিতে বসবাসকারী মহিলা ও শিশুসহ শত শত অবাঙালিকে হত্যা করে। এসব মৃতদেহ শীতলক্ষ্যা নদীতে নিক্ষেপ করা হয়। একটি বন্ধ অফিস ভবনে আত্মগোপন করায় আমি রক্ষা পাই। আমি বিদ্রোহীদেরকে নারায়ণগঞ্জে কয়েক ডজন পাটের গুদাম ভস্মীভূত করতে এবং অবাঙালিদের লাশ জ্বলন্ত আগুনে নিক্ষেপ করতে দেখেছি।'

www.pathagar.com

www.pathagar.com

তৃতীয় অধ্যায়

চট্টগ্রামে কসাইখানা

১৯৭১ সালের মার্চে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে বাঙালি বিদ্রোহে জনবহুল বন্দর নগরী চট্টগ্রামে অবাঙালিদের চরম মূল্য দিতে হয়েছে। পূর্ব পাকিস্তান সংকটে ১৯৭১ সালের আগস্টে প্রকাশিত পাকিস্তান সরকারের শ্বেতপত্রে চট্টগ্রাম ও তার আশপাশের এলাকায় অবাঙালিদের মৃত্যুর সংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছিল ১৫ হাজারের নিচে। কিন্তু এ বই প্রকাশের প্রয়োজনে গৃহীত শত শত প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্য থেকে জানা গেছে যে, ১৯৭১ সালের মার্চে চট্টগ্রাম হত্যাযজ্ঞে ৫০ হাজারের বেশি অবাঙালি নিহত হয়েছে। হাজার হাজার মৃতদেহ কর্ণফুলি নদী ও বঙ্গোপসাগরে নিক্ষেপ করা হয়। বাঙালি বিদ্রোহীরা এ শহর এবং শহরের উপকণ্ঠে ১৭টি কসাইখানায় বহু নির্দোষ অবাঙালিকে হত্যা ও নির্যাতন করেছিল। এসব নির্যাতিত অবাঙালির লাশ ভস্মীভূত করা হয়।

মনে হচ্ছে বাঙালি বিদ্রোহীদের লক্ষ্য ছিল ১২ বছরের বেশি সব অবাঙালিকে হত্যা করা। অবাঙালি পুরুষদের হত্যা করার পাশাপাশি ১৯৭১ সালে মার্চের শেষ দিনগুলোতে এবং এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে বাঙালি বিদ্রোহীরা বহু নারী ও শিশুকে হত্যা করে। প্রদেশের অন্য যে কোনো জায়গার চেয়ে চট্টগ্রামে অবাঙালি হত্যাকাণ্ডের ভয়াবহতা ছিল প্রচণ্ড। খুলনা, যশোর, দিনাজপুর ও ময়মনসিংহ ছিল ব্যতিক্রম।

আওয়ামী লীগ হাইকমান্ড ঢাকায় বিদ্রোহের সূচনা ঘটানোর ঠিক পরক্ষণে ৩ মার্চ পাহাড়, নদী ও বনভূমি শোভিত নৈসর্গিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি এ নগরীতে অগ্নিকাণ্ড ও মৃত্যুর আগ্নেয়গিরির উদ্‌গিরণ ঘটে। গভীর রাতে আওয়ামী লীগের বন্দুকধারী সন্ত্রাসীদের নেতৃত্বে উন্মত্ত জনতা শহরে অবাঙালি বসতি আক্রমণ করে এবং হাজার হাজার ঘরবাড়িতে অগ্নিসংযোগ করে। বিদ্রোহীদের হামলায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় ওয়ারলেস কলোনি ও ফিরোজশাহ কলোনি। এককভাবে ফিরোজশাহ কলোনিতে ৭ শত ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেয়া হয় এবং এসব বাড়ির অধিকাংশ পুরুষ, মহিলা ও শিশুকে পুড়িয়ে হত্যা করা হয়। অনেকে তাদের জ্বলন্ত ঘরবাড়ি থেকে রক্ষা পায়। কিন্তু পালিয়ে যাবার সময় পথে সশস্ত্র বিদ্রোহীদের হাতে তারা নিহত হয়।

নির্বিচার হত্যাকাণ্ড থেকে যে ক'জন বেঁচে গেছে তারা এ নিষ্ঠুরতাকে মর্তের দোযখ হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। মুক্তিপণের জন্য অবস্থাপন্ন অবাঙালিদের অপহরণ করা হয়। পরে অপহৃতদের কসাইখানায় নির্যাতন চালিয়ে হত্যা করা হয়। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন যে, আওয়ামী লীগের ঊর্ধ্বতন নেতা এম. আর. সিদ্দিকী ছিলেন এ হত্যাকাণ্ডের পরিকল্পনাকারী এবং তিনি চট্টগ্রামে ঘৃণ্য অবাঙালি হত্যাকাণ্ড তত্ত্বাবধান করেছেন। ৩ মার্চ রাতে প্রথম অগ্নিসংযোগের পর শহরের অন্যান্য অবাঙালি বসতিতে হামলা চালাতে বিদ্রোহীদের

www.pathagar.com

সাহস বৃদ্ধি পায়। বিদ্রোহীরা রৌফাবাদ, হালিশহর, দোতলা, কালুরঘাট, হামজাবাদ ও পাহাড়তলীতে শত শত অবাঙালি বাড়িঘরে লুটপাট চালায় ও অগ্নিসংযোগ করে। বাড়ি থেকে অপহৃত অবাঙালিদের কসাইখানায় হত্যা করা হয়।

মার্চের প্রথম পক্ষকালে চট্টগ্রাম ও তার আশপাশে অবাঙালি পুরুষদের পর্যায়ক্রমে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার প্রক্রিয়া অব্যাহত ছিল। আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ তাদের স্বেচ্ছাসেবকদের অস্ত্রের প্রশিক্ষণ দেয়। কিছু অস্ত্র লুট করা হয়েছিল আগ্নেয়াস্ত্রের দোকান ও পুলিশের অস্ত্রাগার থেকে এবং আরো অস্ত্র এসেছিল ভারত থেকে। আক্রান্ত হওয়া নাগাদ গুলিবর্ষণ না করার জন্য সেনা ও নৌবাহিনীকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। স্থানীয় পুলিশ বাহিনী নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। চট্টগ্রামে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি পুরোপুরি ভেঙ্গে পড়ে। অধিকাংশ কর্মী বাঙালি হওয়ায় অগ্নিনির্বাপক বাহিনী ছিল স্থবির। অগ্নিনির্বাপক গাড়ি জ্বলন্ত বস্তির আগুন নেভাতে যেতে চেষ্টা করে। কিন্তু বের হওয়া মাত্র বিদ্রোহীরা এসব গাড়ি পুড়িয়ে দেয়।

মার্চের তৃতীয় সপ্তাহে চট্টগ্রামে বিদ্রোহীরা এতটুকু শক্তি সঞ্চয় করে যে, তারা এলাকায় সামরিক বাহিনীকেও চ্যালেঞ্জ করতে শুরু করে। ১৮ মার্চ রাতে সশস্ত্র ব্যক্তিরা প্রতিটি অবাঙালি আবাসিক কলোনিতে হামলা চালায়। হাজার হাজার অবাঙালির জন্য রাতটি ছিল বিভীষিকাময়। বন্দুকধারীরা কোনো প্রশ্ন না করে বাড়িঘরে ঢুকে বাসিন্দাদের ওপর গুলিবর্ষণ করে। কোনো কিছু নড়াচড়া করতে দেখলেই তারা গুলি করতো।

২৩ মার্চ পাকিস্তান দিবসকে আওয়ামী লীগ 'প্রতিরোধ দিবস' হিসেবে নামকরণ করে। সেদিন বিদ্রোহীরা তাদের ব্যাপক শক্তিপ্রদর্শন করে। বেশ কয়েকটি জায়গায় পাকিস্তানের পতাকা টুকরো টুকরো করা হয়। রাতে অবাঙালিদের ওপর ফের হামলা হয়। ইপিআর, আনসার ও স্থানীয় পুলিশ বিদ্রোহ করায় আওয়ামী লীগের শক্তি বৃদ্ধি পায়। বিদ্রোহীরা ছিল সুসজ্জিত এবং তাদের গোলাবারুদ সরবরাহের কোনো ঘাটতি ছিল না। ২৫ মার্চ বিদ্রোহীরা চট্টগ্রাম বন্দর এলাকায় সেনা ও নৌবাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয় এবং শহর অভিমুখী সকল রাস্তা অবরোধ করার চেষ্টা করে। তারা ক্যান্টনমেন্টে সৈন্য ও অস্ত্র পরিবহন রোধে আগ্রাবাদ থেকে চট্টগ্রাম বন্দর পর্যন্ত মহাসড়কে বিরাট বিরাট ব্যারিকেড স্থাপন করে। তারা মূল সড়কে পরিখা খনন করে এবং যানবাহন চলাচল বন্ধে মহাসড়ক বরাবর দগ্ধ ট্রাক ও লরি এবং বিটুমিনের ড্রাম স্তূপ করে রাখে। বিদ্রোহীরা বন্দরে গুদামজাতকৃত গোলাবারুদ লুট করে। ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের বাঙালি সৈন্যরা বিদ্রোহ করে বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দেয়। ২৬ মার্চ ছিল আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সশস্ত্র অভ্যুত্থান ঘটানোর এবং ঢাকা ও চট্টগ্রাম সেনানিবাসের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ গ্রহণের চূড়ান্ত দিন।

পাকিস্তান সেনাবাহিনী ২৫ মার্চ মধ্যরাতে ঢাকা এবং পূর্ব পাকিস্তানের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ শহরে পূর্বাহ্নে আঘাত হেনে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করে। কিন্তু এই চ্যালেঞ্জ এবং ১ লাখ ৭৬ হাজারের বেশি বাঙালি বিদ্রোহীর বিদ্রোহ নিয়ন্ত্রণে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর হাতে প্রদেশে শক্তি ছিল অপর্যাপ্ত। এজন্য বহু জায়গায় বিদ্রোহী নিয়ন্ত্রিত এলাকা পুনরুদ্ধারে সেনাবাহিনীর কোথাও কোথাও এক সপ্তাহ থেকে এক মাস সময় লেগেছিল। চট্টগ্রামে সেনাবাহিনী ক্ষিপ্রগতিতে বন্দর এবং বিমানবন্দরের মতো শহরের কৌশলগত অংশগুলোর ওপর নিয়ন্ত্রণ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে। কিন্তু ১৯৭১ সালের ৯ এপ্রিল নাগাদ বহু আবাসিক এলাকা

www.pathagar.com

সশস্ত্র বন্দুকধারীদের আওতায় থেকে যায়। এ নারকীয় মুহূর্তে হাজার হাজার অবাঙালিকে গণহারে হত্যা করা হয়। ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টাল সেন্টার ছিল চট্টগ্রামে বিদ্রোহীদের অপারেশনাল হেডকোয়ার্টার এবং শহরে আওয়ামী লীগের প্রধান কার্যালয় ছিল মূল কসাইখানা। এ কসাইখানায় নির্যাতন করার সেল ও চেম্বার ছিল। নির্যাতনের সেলগুলোতে আটক অবাঙালিদের শরীর থেকে সিরিঞ্জ দিয়ে রক্ত বের করে নেয়া হতো। রক্ত বের করা হয়ে গেলে অবাঙালিদের হত্যা করা হতো। উসমানিয়া গ্লাস ওয়ার্কস, হাফিজ জুট মিল, ইস্পাহানি জুট মিল ও অন্যান্য ফ্যাক্টরি এবং বিবিরহাটে আমিন জুট মিল এবং চন্দ্রঘোনায় কর্ণফুলি পেপার মিলে অবাঙালি কর্মচারী এবং তাদের পরিবারবর্গের হত্যাকাণ্ডে প্রদর্শিত নিষ্ঠুরতা প্রাচীন চীনের অসভ্য হুনদের বর্বরতাকে ছাড়িয়ে যায়। ১৯৭১ সালে মার্চের শেষ ৫ দিন এবং এপ্রিলের গোড়ার দিকে বিদ্রোহীরা এসব জায়গায় অধিকাংশ হত্যাকাণ্ড চালায়। বিদ্রোহীদের বর্ণবাদী গণহত্যা থেকে খুব কমসংখ্যক অবাঙালি রক্ষা পেয়েছিল।

চট্টগ্রামে গভর্নমেন্ট রেস্ট হাউজের কুখ্যাত কসাইখানায় প্রায় চার হাজার অবাঙালিকে হত্যা করা হয়। তাদের শরীর থেকে রক্ত বের করে নেয়া হয়। বাঙালি ডাক্তাররা তাদের চোখ থেকে কর্নিয়া তুলে নেয়। তড়িঘড়ি করে খোড়া অগভীর গর্তে এসব লাশ চাপা দেয়া হয়। কারো মধ্যে বেঁচে থাকার ক্ষীণ সম্ভাবনা দেখা দিলে তার মাথার খুলিতে গুলি করা হতো।

আওয়ামী লীগের জঙ্গিরা মসজিদের কয়েকজন ইমামকে বিহারীদের হত্যা করা বাঙালি মুসলমানদের ধর্মীয় কর্তব্য হিসেবে ফতোয়া দিতে বাধ্য করে। চট্টগ্রামে ফায়ার ব্রিগেড অফিসের কাছে একটি মসজিদে অর্ধ ডজন অবাঙালিকে হত্যা করা হয়। বিদ্রোহীরা তাদেরকে বাড়ি থেকে অপহরণ করেছিল। কালুরঘাট শিল্প এলাকায় বাঙালি বিদ্রোহীরা তিন শত মহিলাসহ প্রায় ৫ হাজার অবাঙালিকে জবাই করে। কালুরঘাট হত্যাকাণ্ড থেকে খুব কমসংখ্যক অবাঙালি রক্ষা পেয়েছিল। আটক অবাঙালি মহিলাদের ধর্ষণ করা হয়। কাউকে কাউকে ধর্ষণ করা হয়েছিল প্রকাশ্য দিবালোকে রাস্তায়।

হালিশহর, কালুরঘাট ও পাহাড়তলীতেও বর্বর হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল। এসব এলাকায় বাঙালি বিদ্রোহী সৈন্যরা গোটা বসতির চারদিকে পেট্রোল ও কেরোসিন ছিটিয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়। তারপর অগ্নিকুণ্ড থেকে পালিয়ে যাওয়া অবাঙালিদের হত্যা করা হয়। ১৯৭১ সালে মার্চের শেষ সপ্তাহ এবং এপ্রিলের শুরুতে এই নির্বিচার হত্যাকাণ্ডে চট্টগ্রাম ও তার আশপাশের এলাকায় প্রায় ৪০ হাজার অবাঙালি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। মৃতদেহগুলো পুড়িয়ে দেয়ায় অথবা নদী কিংবা সাগরে নিক্ষেপ করায় নিহতদের সঠিক সংখ্যা কখনো জানা যাবে না। হিংস্র বিদ্রোহীদের অনেকেই ছিল হিন্দু। এসব হিন্দু বিদ্রোহী মসজিদ ও মুসলমানদের মাজার অপবিত্র এবং পবিত্র কোরআনের কপিতে অগ্নিসংযোগ করে।

এ বইয়ের জন্য গৃহীত সাক্ষাৎকারগুলোতে প্রত্যক্ষদর্শীরা এম. আর. সিদ্দিকীকে 'চট্টগ্রামের কসাই' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তারা অভিযোগ করেছে যে, তার ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে শহরে আওয়ামী লীগের প্রধান কার্যালয়ে কসাইখানায় হত্যাকাণ্ড চালানো হতো। নিরীহ অবাঙালিদের হত্যা করতে তিনি তার অনুসারীদের নির্দেশ দিয়ে বলেছিলেন, 'এই জারজদের হত্যা করো।' পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সঙ্গে লড়াইয়ে বিদ্রোহীদের হতাহতের

www.pathagar.com

সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকায় বাঙালি ডাক্তার রক্ত সরবরাহের আহ্বান জানান। এ আহ্বানে সাড়া দিয়ে এম. আর. সিদ্দিকী কসাইখানায় বন্দি অসহায় অবাঙালিদের শরীর থেকে রক্ত বের করে নিতে তার লোকদের নির্দেশ দেন। এমনকি তিনি পঙ্গু বাঙালি সৈন্যদের দেহে প্রয়োজনীয় অঙ্গ সংযোজনে অবাঙালিদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছেদনের নির্দেশ দিয়েছিলেন। ১৯৭১ সালে মার্চের শেষ দিনগুলোতে কসাইখানায় স্তূপীকৃত লাশগুলো হয়তো গর্তে পুঁতে ফেলা হয় নয়তো মাটি ও আর্বজনা দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়।

পাকিস্তান সেনাবাহিনীর চাপ সহ্য করতে না পেরে বিদ্রোহীরা পিছু হটার সময় মসজিদ ও স্কুল ভবনে সমবেত শত শত অসহায় নারী ও শিশুকে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রের গুলিতে হত্যা করে। চট্টগ্রামে অবাঙালি পুরুষদের পাইকারীহারে হত্যা করার পাশাপাশি কয়েক হাজার অবাঙালি মেয়ে ও তরুণীকে অপহরণ এবং ধর্ষণ করা হয়। কখনো কখনো বাঙালি বিদ্রোহীদের ঘাঁটিগুলোর কাছাকাছি সুরক্ষিত বাড়িগুলোতে গণধর্ষণের ঘটনা ঘটতো। নৈরাশ্যবাদী বিদ্রোহীরা সন্তান অথবা স্বামীকে হত্যা করার অসহনীয় দৃশ্য দেখতে অবাঙালি মহিলাদের বাধ্য করতো। পাকিস্তান সেনাবাহিনী বিদ্রোহীদের দানবীয় শাসন থেকে চট্টগ্রামকে মুক্ত করার পর জীবিত অবাঙালিরা তাদের বিধ্বস্ত জীবন নতুন করে শুরু করে এবং তাদের ভস্মীভূত ঘরবাড়ি মেরামত করে। তবে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বিজয়ী ভারতীয় সেনাবাহিনী ও মুক্তিবাহিনী পূর্ব পাকিস্তান দখল করে নেয়ার পর তাদের ভগ্ন জীবন আবার ভেঙ্গে পড়ে। হাজার হাজার অবাঙালি নিহত হয়, অবাঙালি পরিবারগুলোকে তাদের মেরামত করা ঘরবাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়া হয় এবং জীবিতদের ঠাঁই হয় রেডক্রসের ত্রাণ শিবিরে।

১৯৭১ সালের মে মাসে ৬ জন বিদেশি সাংবাদিক পূর্ব পাকিস্তান সফর করেন। মর্ট রোসেনবাম ছিলেন তাদের একজন। ১৯৭১ সালের ১২ মে ওয়াশিংটনের ইভিনিং স্টারে তার প্রেরিত একটি রিপোর্টে বলা হয়:

> 'বন্দর নগরী চট্টগ্রামে একটি জুট মিলের বিনোদন ক্লাবে কাপড়ের স্তূপের ভেতর রক্তমাখা একটি পুতুল গড়াগড়ি খাচ্ছিল। এ ক্লাবে বাঙালিরা ১৮০ জন মহিলা ও শিশুকে হত্যা করে। বাঙালিরা দেশপ্রেমের উত্তেজনায় মত্ত হয়ে কয়েকজন পশ্চিম পাকিস্তানিকে হত্যা করে। বাঙালি বেসামরিক লোক ও মুক্তি ফৌজ ভারতের বিহার রাজ্য থেকে আগত (ভারতীয় অভিবাসী) বিহারীদের গণহত্যায় লিপ্ত হয় এবং হাটবাজার ও বসতবাড়ি তছনছ করে, ছুরিকাঘাত, গুলিবর্ষণ এবং অগ্নিসংযোগ করে। কখনো কখনো ধর্ষণ ও লুটপাটেও লিপ্ত হয়।...'

১৯৭১ সালের ১২ মে আমেরিকান বার্তা সংস্থা এপি প্রেরিত একটি রিপোর্টের উদ্ধৃতি দিয়ে ওয়াশিংটনের ইভিনিং স্টারে আরো বলা হয়:

> 'গতকাল গুরুত্বপূর্ণ এ বন্দর নগরী সফরকারী সাংবাদিকরা জানিয়েছেন যে, তারা ব্যাপক গোলা ও গুলিবর্ষণে ক্ষয়ক্ষতির এবং বিদ্রোহীদের হাতে ব্যাপক বেসামরিক লোক নিহত হওয়ার প্রমাণ দেখতে পেয়েছেন।'
>
> 'প্রভাবশালী ইস্পাহানি পরিবারের মালিকানাধীন জুট মিলগুলোতে সাংবাদিকরা মিলের বিনোদন ক্লাবে গত মাসে বিচ্ছিন্নতাবাদী বিদ্রোহীদের হাতে নিহত ১৫২ জন অবাঙালি মহিলা ও শিশুর গণকবর দেখতে পেয়েছেন।'

www.pathagar.com

'বুলেটে ক্ষত-বিক্ষত এ ক্লাবের মেঝেতে এখনো রক্তমাখা জামা-কাপড় ও খেলনা পড়ে রয়েছে। দায়িত্বশীল সূত্রগুলো জানিয়েছে, ২৫ মার্চ থেকে ১১ এপ্রিল পর্যন্ত চট্টগ্রামে পশ্চিম পাকিস্তানি ও ভারতীয় অভিবাসীদের (১৯৪৭ সাল থেকে পূর্ব পাকিস্তানে বসতি স্থাপনকারী মুসলমান) হত্যা করা হয়েছে।....
'অধিবাসীরা একটি ভস্মীভূত ডিপার্টমেন্ট ভবন দেখিয়ে বলেছে, সেখানে বাঙালিরা পশ্চিম পাকিস্তানের সাড়ে তিন শ' পাঠানকে হত্যা করেছে।'

১৯৭১ সালের ১০ মে চট্টগ্রাম থেকে ম্যালকম ব্রাউন প্রেরিত নিউইর্য়ক টাইমসে প্রকাশিত এক সংবাদে বলা হয়:

'সেনাবাহিনী এসে পৌছানোর আগে যে সময় বিচ্ছিন্নতাবাদী আওয়ামী লীগ ও তার মিত্ররা চট্টগ্রাম নিয়ন্ত্রণ করছিল তখন ভারত থেকে আগত বিহারী অভিবাসীদের তুলনামূলক সমৃদ্ধিতে দৃশ্যত ঈর্ষান্বিত বাঙালি শ্রমিকরা ব্যাপক সংখ্যায় বিহারীদের হত্যা করে।...'

১৯৭১ সালে এপ্রিলের প্রথম পক্ষকালে লন্ডনের সানডে টাইমসের পাকিস্তানি প্রতিনিধি এন্থনি মাসকারেনহাস পূর্ব পাকিস্তানে বিদ্রোহ কবলিত এলাকা সফর করেন। ১৯৭১ সালের ২ মে সানডে টাইমসে মাসকারেনহাস প্রেরিত এক রিপোর্টে বলা হয়:

`চট্টগ্রামে মিলিটারি একাডেমির কর্নেল কমান্ডিংকে হত্যা করা হয়। এসময় তার আট মাসের অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীকে ধর্ষণ করে তলপেটে বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করা হয়। চট্টগ্রামের আরেকটি অংশে জীবন্ত অবস্থায় ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলসের একজন অফিসারের চামড়া ছিঁলে ফেলা হয়। তার দু'পুত্রের শিরশ্ছেদ করা হয়। তার স্ত্রীর তলপেটে বেয়নেট চার্জ করে হত্যা করে তার উন্মুক্ত শরীরের ওপর পুত্রদের মাথা রেখে যাওয়া হয়। বাংলাদেশের পতাকা উড়ানো বাঁশ দিয়ে জরায়ু বিদীর্ণ বহু যুবতী মেয়ের মৃতদেহ খুঁজে পাওয়া যায়।'
'চট্টগ্রাম এবং খুলনা ছিল সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত শহর। সেখানে পশ্চিম পাকিস্তানিরা সমবেত হয়েছিল।....'

১৯৭১ সালের ৭ এপ্রিল ডারহামের ডার্লিংটনের নর্দার্ন ইকো'তে প্রকাশিত একটি রিপোর্টে বলা হয়:

'আমেরিকান সহায়তা প্রকল্পে কর্মরত মার্কিন প্রকৌশলী লিও লামন্সডেন বলেছেন যে, গত সপ্তাহে সেনাবাহিনী এগিয়ে আসার আগে দু'সপ্তাহ পর্যন্ত বাঙালি অধ্যুষিত চট্টগ্রামে বন্দর এলাকায় আতঙ্কিত পশ্চিম পাকিস্তানিদের ভিড় ছিল।'

১৯৭১ সালে মার্চের তৃতীয় সপ্তাহে আওয়ামী লীগের সন্ত্রাস কবলিত চট্টগ্রাম থেকে প্রায় ৫ হাজার অবাঙালি করাচি এসে পৌছে। এসব অবাঙালি শরণার্থী অবাঙালিদের বিরুদ্ধে পরিচালিত গণহত্যার লোমহর্ষক বর্ণনা দেয়। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার স্থানীয় বাঙালিদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধমূলক হামলা প্রতিরোধে পশ্চিম পাকিস্তানি পত্রপত্রিকায় তাদের বর্ণনা প্রকাশের ওপর বিধি নিষেধ আরোপ করে।

www.pathagar.com

(৩০) **ত্রিশতম সাক্ষীর বিবরণ:** ৪০ বছরের মোহাম্মদ ইসরাইল চট্টগ্রামের পাহাড়তলীতে ইস্পাহানি নিউ কলোনির ২৮ নম্বর কোয়ার্টারে বসবাস করতেন। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর ভারত পূর্ব পাকিস্তান দখল করে নিলে মোহাম্মদ ইসরাইল নতুন করে দুর্ভোগে পতিত হন। ১৯৭৩ সালের ডিসেম্বরে তিনি করাচিতে প্রত্যাবর্তন করেন। ১৯৭১ সালের ৩ মার্চ অবাঙালি গণহত্যাকালে তার বোন, ভগ্নিপতি এবং শিশু ভাগিনা নিহত হয়। ইসরাইল তার সাক্ষ্যে বলেছেন:

> 'আমরা বহু বছর ধরে চট্টগ্রামে বসবাস করতাম এবং আমাদের প্রত্যেকে বাংলা বলতে পারতাম। আমি ব্যবসায় নিয়োজিত ছিলাম এবং পাহাড়তলীতে আমি আমার বোন ও ভগ্নিপতির সঙ্গে তাদের বাসায় বসবাস করতাম।....
>
> '৩ মার্চ বিকালে আওয়ামী লীগের জঙ্গি সমর্থকদের নেতৃত্বে প্রায় ৫শ' বাঙালি ইস্পাহানি কলোনি আক্রমণ করে। এ কলোনিতে অধিকসংখ্যক অবাঙালি বসবাস করতো। আক্রমণকারীদের সঙ্গে ছিল জ্বলন্ত মশাল ও কয়েকটি বন্দুক। আমাদের পক্ষ থেকে কোনো প্রকার প্ররোচনা ছাড়া জনতা উন্মত্ততায় লিপ্ত হয়। তারা বাড়িঘরে কেরোসিন ও পেট্রোল ছিটিয়ে অগ্নিসংযোগ করে। লোকজন ঘর থেকে বের হলে আক্রমণকারীরা গুলিতে তাদের হত্যা করে।. ..
>
> '১০ জন সশস্ত্র বিদ্রোহী আমাদের ঘরের দরজা ভেঙ্গে ফেলে এবং উদ্যত বন্দুক নিয়ে ভেতরে প্রবেশ করে। তারা আমার ভগ্নিপতিকে গুলি করে। তিনি ঘটনাস্থলে নিহত হন। আমি আহত হই এবং মৃত্যু যন্ত্রণায় কাতরাতে থাকি। আমার বোন আক্রমণকারীদের বাধা দিতে গেলে তাকে বেয়নেট চার্জ করা হয়। আক্রমণকারীরা তার কোল থেকে তার দুগ্ধপোষ্য শিশুকে কেড়ে নেয়। আমার বোন যখন মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করছিল তখন আমার ভাগিনাকে গুলি করে হত্যা করা হয়। পরে আক্রমণকারীরা আমাদের বাড়ি লুট করে আগুন ধরিয়ে দেয়। আমি হামাগুড়ি দিয়ে একটি ভবনে যেতে সক্ষম হই। এ ভবনে আমি কয়েকদিন লুকিয়ে থাকি। আক্রমণকারীরা দু'হাজার অবাঙালির বসতি এ কলোনির প্রতিটি ঘর পুড়িয়ে দেয়। তারা জ্বলন্ত বাড়িঘরে বহু মৃত দেহ নিক্ষেপ করে।...'
>
> 'কয়েকজন দয়ালু বাঙালি আওয়ামী লীগের এই ঘৃণ্য আচরণ এবং নির্বিচারে অবাঙালি হত্যাকাণ্ডে মর্মাহত হয়। কিন্তু তারা ছিল অসহায়। কেননা আক্রমণকারীদের সঙ্গে ছিল বন্দুক। ৩ মার্চের পৈশাচিকতায় আওয়ামী লীগ সফল হওয়ায় উৎসাহিত এবং নিশ্চিত হয় যে, অবাঙালি নিধনে তাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে পুলিশ এবং সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে তারা কোনো বাধার মুখোমুখি হবে না।'

(৩১) **একত্রিশতম সাক্ষীর বিবরণ:** ২৩ বছরের নূর মোহাম্মদ সিদ্দিকী চট্টগ্রামে ফিরোজশাহ কলোনিতে একটি ভাড়া করা বাসায় পিতামাতার সঙ্গে বসবাস করতো। ১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তানে সংঘটিত হত্যাযজ্ঞে সে তার অধিকাংশ আত্মীয়-স্বজনকে হারায়। ১৯৭১ সালের এপ্রিলে নূর মোহাম্মদ চট্টগ্রাম ত্যাগ করে করাচিতে এসে পৌছায়। সে তার মর্মস্পর্শী সাক্ষ্যে বলেছে:

> '৩ মার্চ দুপুরে আওয়ামী লীগের প্রায় ৫ হাজার সশস্ত্র কর্মী এবং তাদের সমর্থক ফিরোজশাহ কলোনি আক্রমণ করে। তাদের সঙ্গে ছিল ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলসের

www.pathagar.com

কয়েকজন সশস্ত্র বিদ্রোহী। তাদের পরণে ছিল ডিউটিকালীন ইউনিফর্ম। অবাঙালিদের পক্ষ থেকে কোনো ধরনের প্ররোচনা ছাড়া উন্মত্ত জনতা উন্মাদ হয়ে উঠে। আওয়ামী লীগের জঙ্গি সমর্থকরা শত শত ঘরবাড়ি লুট করে এবং পেট্রোল ও কেরোসিন ছিটিয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়। বাসিন্দারা দৌড়ে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করলে সশস্ত্র লোকেরা খুব কাছ থেকে তাদের গুলি করে। আমি আল্লাহর বিশেষ রহমতে হত্যাযজ্ঞ থেকে রক্ষা পাই।

'আক্রমণকারীরা এগিয়ে এলে আমি একটি স্টোর রুমে আত্মগোপন করি। আত্মগোপন থেকে বের হয়ে আমি আমাদের এলাকায় শত শত ভস্মীভূত ঘরবাড়ি দেখতে পাই। এলাকার সর্বত্র ছিল লাশের দুর্গন্ধ। আক্রমণকারীরা কাউকে কাউকে মৃত ভেবে ফেলে রেখে যায়। এসব অর্ধমৃত লোকগুলো কাতরাচ্ছিল। কিন্তু সহায়তা করার মতো কেউ ছিল না। পুলিশ উধাও হয়ে যায়। পরদিনও আমাদের এলাকায় আক্রমণকারীরা ঘোরাফেরা করছিল। যেসব অবাঙালি কলোনি থেকে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করে তাদেরকে রাস্তায় গুলি করে হত্যা করা হয়। রাতে বহু অবাঙালি মেয়েকে অপহরণ এবং খালি ঘরে ধর্ষণ করা হয়। বহু শিশুকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হয়। মায়েদেরকে শিশুদের করুণ মৃত্যু প্রত্যক্ষ করতে বাধ্য করা হয়। দু'দিনের ধ্বংস ও হত্যাযজ্ঞে ফিরোজশাহ কলোনি আণবিক বোমায় বিধ্বস্ত একটি লোকালয়ের রূপ ধারণ করে।...'

'এ ভয়াবহ মাসের স্মৃতি আমি কোনোদিন ভুলতে পারিনি। মনে হচ্ছিল সবগুলো লোক যেন হত্যা, লুট ও ধর্ষণের জন্য উন্মাদ হয়ে গিয়েছিল। এ রক্তগঙ্গায় নিহতদের সবাই ছিল অবাঙালি। কয়েকজন পাকিস্তানপন্থী বাঙালি তাদের অবাঙালি বন্ধুদের বাঁচানোর চেষ্টা করে। এসব পাকিস্তানপন্থী বাঙালিকে চরম শাস্তি দেয়া হয়। এমনকি হত্যা করা হয়।'

(৩২) **বত্রিশতম সাক্ষীর বিবরণ:** ১৯৭১ সালের ৩ মার্চ ৪০ বছরের শরিফানের চোখের সামনে তার দু'পুত্র ও স্বামীকে হত্যা করা হয়। তিনি তার সাক্ষ্যে বলেছেন:

'আমার স্বামী শামসুল হক চট্টগ্রামে একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে চাকরি করতেন। আমি আমার দু'ছেলেকে নিয়ে চট্টগ্রামের লতিফাবাদে একটি ছোট ঘরে বসবাস করতাম। ৩ মার্চ একদল উন্মত্ত বাঙালি-অবাঙালি বস্তি এবং আমাদের এলাকায় হামলা চালায়। তারা শত শত বস্তিঘর ও বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করে। আক্রমণকারীরা হয়তো অবাঙালি পুরুষদের হত্যা করে। নয়তো বন্দি হিসেবে ট্রাকে করে নিয়ে যায়। কয়েকজন অবাঙালি জ্বলন্ত ঘরবাড়ি ছেড়ে পালানোর চেষ্টা করছিল। কিন্তু তাদেরকে রাইফেলের গুলিতে হত্যা করা হয়। ব্যাপক অগ্নিকাণ্ডে অনেকে প্রাণ হারায়।...'

'একদল লোক আমার ঘর লুট করে এবং পরে তাতে আগুন ধরিয়ে দেয়। আমরা দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করলে একজন বন্দুকধারী আমাদের ওপর গুলি চালায়। আমার দু'পুত্র আহত হয়। আমি এবং আমার স্বামী হতবুদ্ধি হয়ে যাই। আমি আমার শাড়ি ছিঁড়ে তাদের ক্ষত স্থানে ব্যান্ডেজ করে দেয়ার চেষ্টা করি। কিন্তু ১০ মিনিটের মধ্যে তাদের শরীর নিথর হয়ে যায়। বুক ভরা যন্ত্রণা নিয়ে আমরা নিকটবর্তী একটি মসজিদে আশ্রয় নেই। আমার স্বামী ভেঙ্গে পড়েছিলেন। তিনি হাঁটু গেড়ে বসে আল্লাহর কাছে দোয়া করেন। আমি শাড়ি থেকে আমার পুত্রদের রক্তের দাগ ধুয়ে ফেলি। ঠিক এসময় আমি একটি বিকট আর্তনাদ শুনতে পাই এবং আক্রমণকারীরা

www.pathagar.com

মসজিদে প্রবেশ করে। তারা জানালো, মসজিদে আশ্রয় গ্রহণকারী সকল অবাঙালি পুরুষকে হত্যা করা হবে। পুরুষরা বয়স্ক হওয়ায় আমি বন্দুকধারীদের পায়ে পড়ে তাদের জীবন ভিক্ষা চাই। একজন আক্রমণকারী তার পায়ের বুট দিয়ে আমাকে আঘাত করে। একটি রাইফেলের গুলির শব্দ হয়। আমি অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখলাম আমার প্রিয় স্বামী মাটিতে লুটিয়ে পড়ে গেছেন। তার বুক থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরুচ্ছে। আমি অজ্ঞান হয়ে যাই এবং কয়েক ঘন্টা অচেতন থাকি।....

'মসজিদে অবস্থানকারী মহিলাদের প্রিয়জনকে গুলি করে হত্যা করা হয়। এসব মহিলা তাদের প্রিয়জনদের লাশ মসজিদের একটি কোণায় সরিয়ে রাখে। তারা নিজ নিজ শাড়ি দিয়ে চাদর বানিয়ে লাশগুলো ঢেকে রাখে। আমাদের কাছে কবর খোড়ার মতো কোনো শাবল অথবা খুন্তি ছিল না। আমরা অশ্রুজল, ভীতি ও সন্ত্রাসের মধ্যে মসজিদে তিন সপ্তাহের বেশি অবস্থান করি। মার্চের শেষদিকে পাকিস্তান সেনাবাহিনী আমাদেরকে একটি স্কুল ভবনে ত্রাণ শিবিরে নিয়ে যায়। ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে ভারতীয় সেনাবাহিনী পূর্ব পাকিস্তান দখল করে নেয়ার পর মুক্তিবাহিনী আমাদেরকে উত্যক্ত করেছিল। কিন্তু রেডক্রস আমাদেরকে রক্ষা এবং সহায়তা করে। ১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে আমরা করাচিতে প্রত্যাবাসন করি।'

(৩৩) **তেত্রিশতম সাক্ষীর বিবরণ:** ৩৭ বছরের সৈয়দ শামি আহমেদ ছিলেন ৮ জনের একটি পরিবারের সদস্য। তার পরিবারে তিনি ছাড়া আর কেউ রক্ষা পায়নি। সেনাবাহিনী চট্টগ্রামের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করার পর শামি আহমেদ হালিশহরে তার আংশিক ভস্মীভূত ব্লক নং-১-১৯৩ বাড়িতে কয়েক মাস অবস্থান করেন। ১৯৭১ সালে ডিসেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে ভারত পূর্ব পাকিস্তান দখল করে নেয়ার পর মুক্তিবাহিনী ও আওয়ামী লীগ আরো অবাঙালিকে হত্যা করে। ১৯৭৩ সালের নভেম্বরে শামি আহমেদ করাচিতে প্রত্যাবাসন করেন। ১৯৭১ সালের ২৩ মার্চ হালিশহরে সংঘটিত হত্যাযজ্ঞের বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন:

'২৩ মার্চ দুপুরের পূর্বাহ্নে আওয়ামী লীগের প্রায় ৪ হাজার সমর্থক, বিদ্রোহী সৈন্য ও অন্যরা হালিশহরে অবাঙালিদের বাড়িঘরে হামলা শুরু করে। আমি একটি কাজে শহরের অন্য প্রান্তে অবস্থান করছিলাম। লুণ্ঠনকারীরা আমার বাড়ি লুট করে এবং আমার স্ত্রী, আমার চার শিশু সন্তান, আমার কিশোরী শ্যালিকা এবং আমার ১৩ বছরের ভাইকে হত্যা করে। আক্রমণকারীরা আমার বাড়ির অর্ধেক ভস্মীভূত করে। ১৯৭১ সালের ২৩, ২৫ ও ২৭ মার্চ সংঘটিত হত্যাযজ্ঞ থেকে এ এলাকার ১৫ শতাংশের বেশি অবাঙালি রক্ষা পায়নি। আক্রমণকারীরা বলতো, তারা কোনো বিহারীকে বাঁচতে দেবে না। বিহারী বলতে তারা যে কোনো অবাঙালি মুসলমানকে বুঝাতো। হামলাকারীদের মধ্যে বহু হিন্দু ছিল। তাদের কাছে ছিল পর্যাপ্ত অস্ত্র ও গোলাবারুদ।...'

(৩৪) **চৌত্রিশতম সাক্ষীর বিবরণ:** ২০ বছরের মোহাম্মদ নবী জান চট্টগ্রামে জনবহুল ওয়ারলেস কলোনিতে এল-১৪, জি নম্বর কোয়ার্টারে বসবাস করতো। তার বিশ্বাস, ১৯৭১ সালের মার্চে বিদ্রোহীদের হাতে এ কলোনির ৭৫ শতাংশ অবাঙালি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে ভারত পূর্ব পাকিস্তান দখল করে নেয়ার পর জীবিতদের অনেককে

www.pathagar.com

হত্যা করা হয়। ১৯৭৩ সালের ডিসেম্বরে নবী জান পাকিস্তানে প্রত্যাবাসন করে। সে ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ অবাঙালি হত্যাযজ্ঞের একজন সাক্ষী। নবী জান লাশের স্তূপের ভেতর আহত অবস্থায় তিনদিন অবস্থান করছিল। সে তার হৃদয়বিদারক সাক্ষ্যে বলেছে:

> 'ওয়ারলেস কলোনিতে দীর্ঘদিন থেকে অবাঙালিদের গুচ্ছ গুচ্ছ ঘরবাড়ি ছিল। ১৯৭১ সালে মার্চের দ্বিতীয় সপ্তাহে আওয়ামী লীগের সশস্ত্র লোকজন লাল সংকেত দিয়ে প্রতিটি অবাঙালির বাড়ি চিহ্নিত করে। তারা শান্তি কমিটি গঠন করে। শান্তি কমিটির বৈঠকে ঘোষণা করা হয় যে, তারা কোনো অবাঙালির ক্ষতি করবে না। তাতে আমরা আশ্বস্ত হই। মাঝে মাঝে আওয়ামী লীগের স্বেচ্ছাসেবকরা আমাদের কাছ থেকে চাঁদা আদায় করতো। শহরের অন্যান্য অংশে অবাঙালিদের ওপর আওয়ামী লীগের হামলার কথা শুনে আমরা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠি। আমার পিতা ও বড় ভাই চট্টগ্রাম ছেড়ে চলে যেতে চাইছিলেন। কিন্তু বিদ্রোহীরা পালানোর সব রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছিল। তাই আমরা আমাদেরকে ভাগ্যের হাতে সঁপে দেই। কোনো বন্দুক না থাকায় আমরা ছিলাম অরক্ষিত।...
>
> '২৬ মার্চ রাত ৯টায় উদ্যত বন্দুক হাতে এক বিরাট বাঙালি জনতা ওয়ারলেস কলোনিতে অবাঙালি বসতি আক্রমণ করে। কয়েকদিন আগে লাল চিহ্ন দিয়ে রাখায় লক্ষ্যস্থলগুলো খুঁজে বের করতে তাদের বেগ পেতে হয়নি। হামলাকারীরা কয়েকটি ভাগে বিভক্ত হয়ে হামলা চালায়। হামলাকারীদের অনেকেই ছিল ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলসের ইউনিফর্মধারী বাঙালি বিদ্রোহী। তারা কোনো জিজ্ঞাসাবাদ করা ছাড়া ঘরে প্রবেশ করে এবং বাসিন্দাদের ওপর গুলিবর্ষণ শুরু করে। চলন্ত প্রতিটি বস্তুর ওপর গুলি চালানোর পর তারা বাড়িঘরের মালামাল লুণ্ঠন করে। এমনকি তারা মৃতদেহ থেকে মূল্যবান জিনিসও ছিনিয়ে নেয়।....
>
> 'একদল হামলাকারী আমাদের বাড়ি আক্রমণ করে এবং বন্দুক নিয়ে ভেতরে প্রবেশ করে। চোখের পলকে আমি আমার পিতা ও বড় ভাইকে মাটিতে রক্তে গড়াগড়ি খেতে দেখলাম। একটি বুলেট আমার উরুতে লাগলে আমি আর্তনাদ করে মাটিতে পড়ে যাই। হামলাকারীরা বন্দুকের মুখে আমার ভ্রাতৃবধূকে অপহরণ করে। আমি তিনদিন অজ্ঞান ছিলাম। জ্ঞান ফিরে পাওয়ার পর আমি আমার আহত পিতাকে জীবিত দেখলাম। তবে আমার ভাই ছিল মৃত। বিকালে পাকিস্তান সেনাবাহিনী এসে পৌছায়। আমাদেরকে একটি হাসপাতালে চিকিৎসা দেয়া হয়।'

(৩৫) **পঁয়ত্রিশতম সাক্ষীর বিবরণ:** ৫০ বছরের ওসমান গনি চট্টগ্রাম পোর্ট ট্রাস্টে চাকরি করতেন এবং হামজাবাদ এলাকায় বিবিরহাট কলোনিতে বসবাস করতেন। ১৯৭৩ সালের ডিসেম্বরে তিনি পাকিস্তানে প্রত্যাবাসন করেন। তার মতে, বিদ্রোহীরা মার্চের প্রথম সপ্তাহ থেকে পরিকল্পিত সশস্ত্র অভ্যুত্থান ঘটাতে অস্ত্র মজুদ করতে শুরু করে এবং ভারত ছিল অস্ত্র সরবরাহের উৎস। ২৬ মার্চ তার এলাকায় গণহত্যা চালানো হয়। তাতে তার একমাত্র ছেলে ও বড় ভাই নিহত হয়। এ ব্যাপারে সাক্ষ্য দানকালে তিনি বলেছেন:

> '২৬ মার্চ রাত ১০টায় বন্দুক ও মেশিনগান সজ্জিত আওয়ামী লীগের একটি বিরাট সশস্ত্র দল, বিদ্রোহী সৈন্য ও আরো কয়েকটি সশস্ত্র গ্রুপ বিবিরহাট কলোনিতে অবাঙালিদের বাড়িঘর আক্রমণ করে। আমরা দীর্ঘদিন ধরে আতংকের মধ্যে বসবাস করছিলাম।

www.pathagar.com

তবে এ ধরনের ভয়াবহ হামলা এবং এত লোক হামলা করবে এমন কথা ভাবতে পারেনি। আমাদের কাছে কোনো অস্ত্র ছিল না। আওয়ামী লীগ মার্চ মাসের মাঝামাঝি আমাদের ঘরবাড়িতে লাল দাগ দিয়ে রেখেছিল। আক্রমণকারীরা বন্দুক থেকে গুলিবর্ষণ, অবাঙালিদের বাড়িঘর তছনছ এবং সকল পুরুষকে গুলিতে ঝাঝরা করে দেয়। বন্দুকধারীদের একটি গ্রুপ আমাদের ঘরের দরজা ভেঙ্গে ভেতরে ঢুকে আমার বড় ভাইকে গুলি করে। আমার স্ত্রী আমাদের ১১ বছরের ছেলেকে বাঁচানোর জন্য আগলে ধরে রাখে। বন্দুকধারীদের পায়ে ধরে আমার স্ত্রী আমার সন্তানের প্রাণভিক্ষা চায়। কিন্তু নির্দয় হামলাকারীরা স্টেন গান দিয়ে আমার ছেলেকে গুলি করে। আমার স্ত্রী আমার গুলিবিদ্ধ সন্তানের ওপর লুটিয়ে পড়লে তারা রাইফেলের বাট দিয়ে তার মাথায় আঘাত করে। রাতে আমি চট্টগ্রাম বন্দর এলাকায় আটক ছিলাম। অল্পের জন্য মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাই। তিনদিন আমার বাড়িতে প্রবেশ করা ছিল দুঃসাধ্য। ২৯ মার্চ বাড়িতে প্রবেশ করে আমি বাঙালি বিদ্রোহীদের হাতে আমার পরিবার নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার দৃশ্য দেখে ঢুকরে কেঁদে উঠি।'

(৩৬) **ছত্রিশতম সাক্ষীর বিবরণ:** ৩৬ বছরের ফাহমিদা বেগমের স্বামী গোলাম নবী চট্টগ্রামে একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে চাকরি করতেন। ১৯৭১ সালের ২৩ মার্চ চট্টগ্রামের হালিশহরে নিজ বাড়িতে তিনি তার স্বামী, তিন পুত্র ও ছোট মেয়েকে হত্যা করার যন্ত্রণাদায়ক দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেন। ফাহমিদা চট্টগ্রামে একটি ত্রাণ শিবিরে আশ্রয় লাভ করেন এবং ১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে করাচিতে প্রত্যাবাসন করেন। অশ্রুসজল চোখে তিনি তার সাক্ষ্যে বলেছেন:

'২৩ মার্চ রাতে আমাদের কলোনিতে সর্বাত্মক হামলাকালে সন্ত্রাসীরা আমাদের ঘরের তালা ভেঙ্গে ফেলে। তারা আমার স্বামীকে গুলি করে। গুলিতে আমার স্বামী মাটিতে পড়ে যান। তার বুক থেকে রক্তের ধারা গড়িয়ে পড়ছিল। হামলাকারীরা আমার তিন সন্তানের দিকে ফিরে তাকালে তাদের সঙ্গে আমার ধস্তাধস্তি বেধে যায়। আমি তাদের একজনের হাত থেকে বন্দুক কেড়ে নেই। কিন্তু কিভাবে বন্দুক চালাতে হয় আমি তা জানতাম না। একজন বিদ্রোহী রাইফেলের বাট দিয়ে আমার মাথায় আঘাত করলে আমি মাটিতে পড়ে যাই। তারা দড়ি দিয়ে আমাকে বেঁধে বললো, তারা আমার চোখের সামনে আমার সন্তানদের হত্যা করবে। একে একে তারা আমার তিন সন্তানের মাথা কেটে ফেলে এবং ছিন্ন মস্তকগুলোতে লাথি মারে। হত্যাকারীরা আমার ছোট মেয়েকে বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করলে আমি মূর্ছা যাই। এ মর্মান্তিক দৃশ্য আমি জীবনে কখনো ভুলবো না। আমি এখনো দেখতে পাচ্ছি আমার ছোট শিশু মেয়ের আতঙ্কিত নির্দোষ চোখের চাহনি। বেয়নেটের তীক্ষ্ণ ফলা তার কচি গলা স্পর্শ করার সময় সে চিৎকার দিয়ে আমার কাছে ছুটে আসতে চাইছিল। আর্তনাদ করে বলছিল, 'আম্মি বঁ-াচাও।' আল্লাহ নিশ্চয়ই ঐ ঘাতকদের শাস্তি দেবেন। তারা মানুষ নয়, তারা ছিল পশু।'

(৩৭) **সাঁইত্রিশতম সাক্ষীর বিবরণ:** ৪৭ বছর বয়স্ক বশির হোসেন চট্টগ্রামের হালিশহরের তেজপাড়ায় একটি ছোট্ট ঘরে বাস করতেন। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ এ এলাকায় হত্যাযজ্ঞকালে তিনি তার দু'পুত্রকে হারান। তিনি নিজে গুরুতর আহত হন।

www.pathagar.com

আক্রমণকারীরা তাকে মৃত ভেবে ফেলে রেখে যায়। দু'দিন পর তিনি জ্ঞান ফিরে পান। ১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে তিনি চট্টগ্রাম থেকে করাচিতে প্রত্যাবাসন করেন। বশির হোসেন তার সাক্ষ্যে বলেছেন:

> '১৫ থেকে ২৬ মার্চ পর্যন্ত হালিশহর ছিল বিদ্রোহীদের হামলার বিশেষ টার্গেট। তারা প্রতিদিন এ শহরতলীর বিভিন্ন এলাকায় অবাঙালিদের বিরুদ্ধে গণহত্যা পরিচালনা করতো।...
> '২৫ মার্চ বিদ্রোহীরা আমার বাড়ি আক্রমণ করে এবং আমাকে ও আমার দু'ছেলেকে গুলি করে। আমি আমার স্নেহের দু'ছেলেকে মাটিতে রক্তে গড়াগড়ি খেতে দেখে জ্ঞান হারিয়ে ফেলি। আমার নিতম্ব ও উরুতে গুলি করা হয়। পঞ্চম দিনে সেনাবাহিনী আমাকে উদ্ধার করে। একটি হাসপাতালে আমার চিকিৎসা করা হয়। তবে আমার দু'পুত্র মারা যায়।....
> 'বিদ্রোহীরা আমাদের এলাকায় অবাঙালি পরিবারের পুরুষ সদস্যদের নিধনে তাদের লক্ষ্য অর্জনে অনেকটা সফল হয়। তারা হাজার হাজার অবাঙালি তরুণীকে অপহরণ করে। অপহৃতদের অনেককে ধর্ষণ করা হয় এবং কাউকে কাউকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়।....'

(৩৮) **আটত্রিশতম সাক্ষীর বিবরণ:** ২৪ বছরের শহীদ হোসেন আবদির পিতা চট্টগ্রামে ইস্পাহানি জুট মিলে স্টোর অফিসার হিসেবে চাকরি করতেন। ১৯৭৩ সালের মাঝামাঝিতে শহীদ হোসেন নেপাল থেকে করাচিতে ফিরে আসে। ১৯৭২ সালে সে চট্টগ্রাম থেকে কাঠমন্ডুতে পালিয়ে যায়। তার হিসেব অনুযায়ী ১৯৭১ সালের মার্চে ইস্পাহানি জুট মিলের ৭৫ শতাংশ অবাঙালি নিহত হয়। মিল এলাকায় নিহত বহু অবাঙালিকে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অভিযান শুরু হওয়ার কয়েক ঘন্টা আগে গণকবর দেয়া হয়। ১৯৭১ সালের মার্চে মিলের বিনোদন ক্লাবে বিদ্রোহীদের হাতে অবাঙালি হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে শহীদ হোসেন আবদি তার সাক্ষ্যে বলেছে:

> 'আমরা ইস্পাহানি জুট মিলের স্টাফ কোয়ার্টারে বসবাস করতাম। স্টোর অফিসার হিসেবে আমার পিতা ছিলেন বাঙালি-অবাঙালি নির্বিশেষে মিলের সকল কর্মচারীর প্রতি দয়ালু। অবাঙালি কর্মচারী ও তাদের পরিবারের সদস্য সংখ্যা ছিল ৩ হাজারের কাছাকাছি। অবাঙালিদের অধিকাংশই মিল এলাকায় বসবাস করতো। মার্চের মাঝামাঝি থেকে আওয়ামী লীগের কর্মী এবং বাঙালি শ্রমিকদের মধ্যে আওয়ামী লীগের সমর্থকরা ছিল অবাঙালিদের প্রতি চরম বৈরি। ২৩ থেকে ২৮ মার্চ পর্যন্ত তারা অবাঙালিদের বাড়িতে হামলা করে, বন্দুকের মুখে অবাঙালি পুরুষদের ছিনতাই করে এবং ফ্যাক্টরির বিনোদন ক্লাবে স্থাপিত কসাইখানায় তাদের হত্যা করে। শিরশ্ছেদ করার আগে বন্দিদের ওপর অকল্পনীয় নির্যাতন চালানো হয়। বন্দিদের শরীর থেকে রক্ত বের করে নেয়ার জন্য সিরিঞ্জ ব্যবহার করা হয়। এসব রক্ত কন্টেইনারে জমা করে রাখা হয়। বিদ্রোহীরা এসব রক্ত তাদের হাসপাতালে ভর্তি আহত সৈন্য ও অন্য জঙ্গিদের কাছে নিয়ে যায়। সেনাবাহিনী এ এলাকা দখল করে নেয়ার কয়েকদিন আগে বিদ্রোহীরা কসাইখানায় শত শত মহিলা ও শিশুকে হত্যা করে।...'

www.pathagar.com

(৩৯) **উনচল্লিশতম সাক্ষীর বিবরণ:** ৪০ বছরের মোহাম্মদ শরাফউদ্দিন চট্টগ্রামের হালিশহরে এ-ব্লকের ৬৭৩ নম্বর বাসায় বসবাস করতেন। মোটর মেকানিক হিসেবে তিনি কাজ করতেন। ১৯৭১ সালের মার্চে অবাঙালি গণহত্যায় তিনি তার দু'ভাইকে হারান। ১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে তিনি চট্টগ্রাম থেকে করাচিতে প্রত্যাবাসন করেন। শরাফউদ্দিন তার সাক্ষ্যে বলেছেন:

> 'হালিশহরের আনুমানিক ৫০ হাজার বাসিন্দার অর্ধেকের সামান্য বেশি ছিল অবাঙালি। বিগত ২৪ বছর ধরে তারা এসব বসতিতে বসবাস করতো। বাঙালিদের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ছিল আন্তরিক। তাদের সকলেই অনর্গল বাংলায় কথা বলতে পারতো। তবে তারা তাদের বাড়িতে কথা বলতো উর্দুতে। এ এলাকায় বসবাসকারীদের অনেকের জন্ম হয়েছিল ভারতের বিহার রাজ্যে। তবে পাঞ্জাবী ও পাঠানসহ বহু পশ্চিম পাকিস্তানি পরিবারও ছিল। বাঙালিরা তাদেরকেও বিহারী বলতো।...
>
> '১৮ মার্চ রাতে আওয়ামী লীগের জঙ্গি সমর্থক ও বাঙালি বিদ্রোহী সৈন্যরা কলোনিতে আমাদের বসতি আক্রমণ করে, আমাদের বাড়িঘর লুট করে এবং অবাঙালি পরিবারের সকল পুরুষ সদস্যকে হত্যা করে। আমাদের বাড়িতে তারা আমার দু'ভাইকে গুলি করে এবং তাদের যুবতী স্ত্রীদের অপহরণ করে। সেনাবাহিনী চট্টগ্রামের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করার পর আমি আমার নিখোঁজ ভ্রাতৃবধূদ্বয়কে খুঁজে বের করার জন্য চট্টগ্রামের প্রতিটি আনাচে-কানাচে ঘুরে বেরিয়েছি। কিন্তু তাদের কোনো খোঁজ পাইনি। ১৯৭১ সালের মার্চে হালিশহরে অবাঙালি পুরুষদের কমপক্ষে ৭৫ শতাংশকে হত্যা করা হয়।...'

(৪০) **চল্লিশতম সাক্ষীর বিবরণ:** ৩৫ বছরের মোশাররফ হোসেন ছিলেন চট্টগ্রামে একটি জুট বেইলিং প্রেসের মালিক। তিনি আগ্রাবাদ কলোনিতে বসবাস করতেন। ১৯৭১ সালের মার্চে সংঘটিত ঘটনাবলীর বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন:

> '১৯৫০ সালে আমি ভারত থেকে পূর্ব পাকিস্তানে অভিবাসন করি। আমি চট্টগ্রামে আমার ১০ লাখ রুপি মূল্যের সম্পদ স্থানান্তর করি। পাটের ব্যবসায় আমি উন্নতি করছিলাম। আমি একটি জুট বেইলিং প্রেস ক্রয় করি। এ বেইলিং প্রেসের বাজার মূল্য ছিল ২০ লাখ রুপি। ২১ মার্চ আওয়ামী লীগের জঙ্গি সমর্থকদের নেতৃত্বে উন্মত্ত জনতা আমার জুট বেইলিং প্রেস আক্রমণ করে এবং তারা তা ভস্মীভূত করে। তারা পাটের স্টক এবং চট্টগ্রামের বাণিজ্যিক কেন্দ্রস্থলে আমার দোকানও পুড়িয়ে দেয়।...
>
> 'দু'বছরের বেশি সময় আমি চরম দরিদ্র অবস্থায় বসবাস করেছি। অতি কষ্টে আমি ১৯৭৩ সালের ডিসেম্বরে পাকিস্তানে আসতে সক্ষম হই। ভাগ্য এবং আল্লাহর দয়ায় আমি ও আমার পরিবার ১৯৭১ সালের মার্চে অবাঙালি হত্যাকাণ্ড থেকে রক্ষা পাই।...'

(৪১) **একচল্লিশতম সাক্ষীর বিবরণ:** ২৮ বছরের ইউনূস আহমেদ চট্টগ্রামে একটি ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিতে চাকরি করতেন। তিনি ১৯৭১ সালের মার্চে ফিরোজশাহ কলোনিতে অবাঙালি হত্যাযজ্ঞের সময় তার ২২ বছরের ভাইকে হারান। ১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে ইউনূস আহমেদ করাচিতে প্রত্যাবাসন করেন। তিনি তার সাক্ষ্যে বলেছেন:

www.pathagar.com

'১৯৪৯ সালে শিশু হিসেবে আমি আমার পিতামাতার সঙ্গে ভারত থেকে চট্টগ্রামে আসি। চট্টগ্রাম ছিল আমাদের নিজ শহর। আমরা এ শহরকে ভালোবাসতাম। পিতার ইন্তেকালের পর আমি আমার ছোট দু'ভাইকে লালন-পালন করতাম। ১৯৭১ সালে তারা ছিল ছাত্র।

'১৮ মার্চ রাতে আওয়ামী লীগ ও বিদ্রোহী সৈন্যদের একটি দল রাইফেল ও স্টেনগান সজ্জিত হয়ে আমাদের এলাকা আক্রমণ করে হাজার হাজার অবাঙালি পুরুষকে হত্যা করে। আমার এক ভাই বাড়িতে ছিল। জঙ্গিরা আমাদের বাড়িতে প্রবেশ করে আমার ভাইকে গুলি করে। আমার অন্য ভাই শহরের আরেক জায়গায় অবস্থান করছিল। আমার ভাইকে হত্যা করার সময় আমি বাড়িতে ছিলাম না। তারা শত শত বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেয়। ৩ মার্চও আমাদের এলাকায় হামলা হয়েছিল। তবে ১৮ মার্চ আক্রমণকারীরা ছিল স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র ও বিস্ফোরকে সজ্জিত এবং সেদিনের হত্যাকাণ্ড ছিল বীভৎস। তারা শত শত অবাঙালি যুবতী মহিলা বিশেষ করে কিশোরীদের অপহরণ করে। এপ্রিলের গোড়ার দিকে ব্যাপক নির্যাতন এবং যৌন হয়রানির চেম্বার হিসেবে ব্যবহৃত বাড়িতে তাদের অনেকের লাশ পাওয়া যায়।'

(৪২) **বিয়াল্লিশতম সাক্ষীর বিবরণ:** ২৫ বছরের বাঙালি বিধবা রহিমার স্বামী শহীদ আলী ছিলেন অবাঙালি। তিনি চট্টগ্রামের শেরশাহ কলোনির একটি বাড়িতে তার স্বামী ও চার সন্তান নিয়ে বসবাস করতেন। রহিমা তার বিড়ম্বিত জীবনের যন্ত্রণার সাক্ষ্য দিতে গিয়ে বলেছেন:

'জন্মগতভাবে আমি বাঙালি। আমার জন্ম ফরিদপুরে। আমার স্বামী শহীদ আলীর জন্ম ভারতের লক্ষ্ণৌতে। আমি তাকে পছন্দ করতাম। সেই সূত্র ধরে তার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়। শহীদ আলী ছিল অত্যন্ত ভদ্র। সে চট্টগ্রামকে ভীষণ ভালোবাসতো এবং আমাদের বাঙালি বন্ধু-বান্ধবদের শ্রদ্ধা করতো।...

'১৯৭১ সালে মার্চের তৃতীয় সপ্তাহে শেরশাহ কলোনিতে আমাদের বাড়িতে হামলার সময় আক্রমণকারীরা আমার স্বামীকে হত্যা করে। তার প্রাণভিক্ষা দেয়ার জন্য আমি তাদের পায়ে পড়ি। কিন্তু তারা ছিল রক্তের নেশায় উন্মাদ। আক্রমণকারীদের মধ্যে কয়েকজন ছিল হিন্দু। অবাঙালিদের প্রতি হিন্দুদের ঘৃণা ছিল সীমাহীন।

'সরকার ১৯৭১ সালে মার্চের প্রথম সপ্তাহে আওয়ামী লীগের জঙ্গি সমর্থকদের সহিংসতা ও সন্ত্রাস ত্বরিত গতিতে নির্মূল করে দিতে পারলে সম্ভবত এ গোলযোগ অঙ্কুরেই বিনষ্ট করে দেয়া যেতো। দীর্ঘ সময় ক্ষেপণ করে সরকার তাদের সাহস বাড়িয়ে দেয় এবং ধ্বংস, হত্যা ও লুণ্ঠন সাধনে তারা তাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে পর্যাপ্ত সময় পেয়ে যায়।...

'১৯৭১ সালের মার্চে চট্টগ্রামে নিহত হাজার হাজার লোকের মধ্যে বহু বাঙালি ছিল। এসব বাঙালি ছিল পাকিস্তানের প্রতি অনুগত। যেসব বাঙালি অবাঙালিদের রক্ষা করার চেষ্টা করেছে বিদ্রোহীরা তাদেরকে হত্যা করে। আমার চার সন্তান হলো আমার স্বামীর উত্তরাধিকারী। পাকিস্তানি হিসেবে জন্ম হওয়ায় আমি তাদের নিয়ে পাকিস্তানে এসেছি।...'

www.pathagar.com

(৪৩) **তেতাল্লিশতম সাক্ষীর বিবরণঃ** ৪০ বছরের মিসেস রহিমা আব্বাসী চট্টগ্রামে লায়ন্স স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। ১৯৭৪ সালের মার্চে তিনি, তার স্বামী ও তিন সন্তান পাকিস্তানে প্রত্যাবাসন করে। মিসেস আব্বাসী ১৯৭১ সালের ২১ মার্চ তার স্কুলে হামলার ব্যাপারে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে বলেছেনঃ

> 'আমরা এম. এ. জিন্নাহ রোডে আমাদের নিজস্ব বাসায় বসবাস করতাম। আমার স্বামী ব্যবসা করতেন এবং আমি লায়ন্স স্কুলে শিক্ষকতা করতাম। লায়ন্স ছিল ইংরেজি মাধ্যমের একটি স্কুল। আমাদের স্কুলের ছাত্ররা ছিল বাঙালি ও অবাঙালি মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান।...
>
> '২১ মার্চ আওয়ামী লীগের জঙ্গি সমর্থকদের নেতৃত্বে একদল উন্মত্ত জনতা আমাদের স্কুলে হামলা চালায়। চৌকিদার স্কুলের সামনের প্রবেশপথ বন্ধ করে দেয়ায় তারা তাকে আহত করে। বাঙালি হিসেবে সে স্কুলে কোনো গোলমাল না করার জন্য তাদের প্রতি অনুরোধ জানায়। একজন আক্রমণকারী তার পায়ে গুলি করলে সে মাটিতে পড়ে যায়। তারপর ক্রোধোন্মত্ত জনতা আমাদের অফিস ও ক্লাসরুমে প্রবেশ করে। তারা মহিলা শিক্ষিকা ও ছাত্রদের নাজেহাল করে। ছাত্রীদের অপহরণে তাদের পরিকল্পনা বুঝতে পেরে আমরা শোরগোল শুরু করি এবং সহায়তার জন্য প্রতিবেশীদের মনোযোগ আকর্ষণ করি। আমাদের এলাকার পাকিস্তানপন্থী একজন প্রভাবশালী নেতার নেতৃত্বে ৫০ জন প্রতিবেশী আমাদের সহায়তায় এগিয়ে এসে হামলাকারীদের সঙ্গে ধস্তাধস্তিতে লিপ্ত হয়। সংঘর্ষে তিনজন হামলাকারী নিহত হয় এবং অন্যরা পালিয়ে যায়। ছাত্র ও শিক্ষকদের মধ্যে কেউ হতাহত হয়নি। এ ঘটনার পর স্কুল কয়েকদিনের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়।...

(৪৪) **চুয়াল্লিশতম সাক্ষীর বিবরণঃ** রহিম আফেন্দি চট্টগ্রামে একটি শিপিং প্রতিষ্ঠানে চাকরি করতেন। চট্টগ্রাম বন্দর এলাকায় বাঙালি বিদ্রোহীদের হাতে অবাঙালি হত্যাকাণ্ড থেকে তিনি রক্ষা পান। জাহাজের ক্যাপ্টেন তাকে কয়েকদিন লুকিয়ে রাখেন। ১৯৭৪ সালে তিনি পাকিস্তানে প্রত্যাবাসন করেন। রহিম আফেন্দি নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করেন যে, ১৯৭১ সালের মার্চে চট্টগ্রাম ও তার আশপাশের এলাকায় হত্যাযজ্ঞে ৫০ হাজারের বেশি অবাঙালি নিহত হয়েছে। তিনি তার সাক্ষ্যে বলেছেনঃ

> 'আমি চট্টগ্রামে মেসার্স ইয়াকুব আলী এন্ড সন্সের শিপিং ফার্মে চাকরি করতাম। ফার্মের মালিক ইয়াকুব আলী ছিলেন একজন বাঙালি ধার্মিক মুসলমান এবং ইসলামের প্রতি অনুরক্ত। তিনি পাকিস্তানের আদর্শে বিশ্বাস করতেন। ইয়াকুব আলী পূর্ব বাংলায় পাকিস্তান আন্দোলনে জড়িত ছিলেন। তিনি মুসলিম লীগের বহু প্রবীণ বাঙালি নেতৃবৃন্দকে চিনতেন। তিনি ছিলেন পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের এককালীন স্পীকার ফজলুল কাদের চৌধুরীর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। তার ফার্মে বহু অবাঙালি কর্মচারী ছিল। তিনি বাঙালি কর্মচারীদের সঙ্গে যে ধরনের আচরণ করতেন, অবাঙালি কর্মচারীদের সঙ্গেও অনুরূপ আচরণ করতেন।...
>
> '২০ মার্চ জনাব ইয়াকুব আলী আমাকে চট্টগ্রাম পোতাশ্রয়ে নিয়ে যান। সেখানে তার প্রতিষ্ঠানের একটি জাহাজ থেকে মাল খালাস করার কথা ছিল। ঐ জাহাজটি পোতাশ্রয়ে ভিড়েছিল। আমরা জাহাজে আরোহণ করি এবং জনাব ইয়াকুব আলী ক্যাপ্টেনের সঙ্গে আলাপ করেন। হঠাৎ করে আমরা সহায়তার জন্য আর্তনাদ এবং নিচে গুলির আওয়াজ

www.pathagar.com

শুনতে পাই। আমরা ক্যাপ্টেনের কেবিন থেকে ডকে ছুটে যাই। সেখানে গিয়ে আমরা অস্ত্র সজ্জিত একদল উন্মত্ত জনতাকে জেটিতে লোকজনকে হত্যা করতে দেখতে পাই। জনাব ইয়াকুব আলী আমাকে ক্যাপ্টেনের সঙ্গে জাহাজে অবস্থান করতে বলেন। তিনি গ্যাংওয়ে দিয়ে নিচে জেটিতে ছুটে যান। এ সাহসী লোকটি জনতার ভেতর দৌড়ে গিয়ে আল্লাহর দোহাই দিয়ে নির্দোষ মানুষকে হত্যা না করার জন্য তাদের প্রতি অনুরোধ জানান। উন্মত্ত জনতার মধ্য থেকে কে একজন চিৎকার দিয়ে বললো, ইয়াকুব আলী পাকিস্তানপন্থী এবং তিনি একজন মুসলিম লীগার। কয়েক মিনিটের মধ্যে আক্রমণকারীরা তাকে টুকরো টুকরো করে হত্যা করে সাগরে নিক্ষেপ করে। পরবর্তীতে আমি জানতে পেরেছি যে, হত্যা করার আগে আক্রমণকারীরা তাকে 'জয় বাংলা' শ্লোগান দিতে নির্দেশ দিলে তিনি 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' উচ্চারণ করেছিলেন।....

(৪৫) **পঁয়তাল্লিশতম সাক্ষীর বিবরণঃ** একজন সুপরিচিত মুসলিম লীগ নেতার ছেলে ২২ বছরের নাসিম আহমেদ চট্টগ্রাম এলাকায় পাহাড়তলীতে নিজেদের বাড়িতে বসবাস করতো। বিদ্রোহীরা তার পিতাকে হত্যা করে। নাসিম আহমেদ ও তার বিধবা মাকে একটি বাঙালি ধার্মিক পরিবার আশ্রয় দিলে তারা হত্যাকাণ্ড থেকে রক্ষা পায়। ১৯৭৩ সালের সেপ্টেম্বরে তারা পাকিস্তানে প্রত্যাবাসন করে। নাসিম আহমেদের মতে, ১৯৭১ সালের মার্চ-এপ্রিলে চট্টগ্রাম ও তার আশপাশের এলাকায় ৭৫ হাজারের বেশি অবাঙালিকে হত্যা করা হয়। তার মতে, ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর ভারতের হাতে পূর্ব পাকিস্তানের পতন ঘটলে আরো ১০ হাজার অবাঙালি নিহত হয়। সে জানিয়েছে, স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রধারী বাঙালি বিদ্রোহী সৈন্য ও স্থানীয় হিন্দুরা সবচেয়ে নৃশংস হত্যাকাণ্ড চালিয়েছে। নাসিম আহমেদ তার পিতার হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে বলেছেঃ

> 'আমার পিতা ওয়াসিম আহমেদ ছিলেন চট্টগ্রামের একজন সুপরিচিত ও ধনাঢ্য ব্যবসায়ী। তিনি পাকিস্তানের আদর্শের প্রতি একনিষ্ঠ এবং মুসলিম লীগের স্থানীয় রাজনীতিতে সক্রিয় ছিলেন। সাহস ও সততার জন্য বাঙালি-অবাঙালি নির্বিশেষে সবাই তাকে শ্রদ্ধা করতো। তিনি বহু সেবামূলক প্রতিষ্ঠানকে সহায়তা করেছেন।
>
> '১৯৭১ সালের ২০ মার্চ বিশিষ্ট নাগরিকদের একটি বৈঠকে যোগদানে তিনি আমাদের এলাকার প্রধান কমিউনিটি সেন্টারে যাচ্ছিলেন। শহরে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার উপায় খুঁজে বের করতে এ বৈঠক ডাকা হয়েছিল। পথে একদল বিদ্রোহী জনতা তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে কুপিয়ে হত্যা করে। একটু পরে উন্মত্ত জনতা বেপরোয়া হয়ে উঠে এবং অবাঙালিদের ঘরবাড়ি লুট ও অগ্নিসংযোগ করে।'

(৪৬) **ছিচল্লিশতম সাক্ষীর বিবরণঃ** ৪২ বছরের জামদাদ খান চট্টগ্রামের আগ্রাবাদে গুল আহমেদ জুট মিলে নিরাপত্তা প্রহরী হিসেবে কাজ করতেন। তিনি তার সাক্ষ্যে বলেছেনঃ

> 'আমি ১৯৭১ সালের জুলাইয়ে গুল আহমদ জুট মিলে একজন নিরাপত্তা প্রহরী হিসেবে যোগদান করি। তার আগে আমি উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে বাস করতাম। চট্টগ্রামে আমি নাসিরাবাদ আবাসিক এলাকায় একটি কোয়ার্টারে বাস করতাম। বাঙালি বিদ্রোহীরা ১৯৭১ সালের মার্চে চট্টগ্রামে অবাঙালি হত্যাকাণ্ডে মেতে উঠে। আমি এ হত্যাকাণ্ডের কথা শুনেছিলাম। একদিন জুট মিলে যাবার পথে একটি পরিত্যক্ত বাড়ির বাইরে মানুষের

www.pathagar.com

মাথার একটি ছোট্ট খুলি দেখতে পাই। একটি ভাঙা জানালার ফাঁক দিয়ে ভেতরে তাকাই। তালাবদ্ধ এ কক্ষের ভেতর বহু শিশুর মাথার খুলি ও হাড়ের স্তূপ দেখে অবাক হই। মেঝেতে কিছু কাপড়-চোপড় ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকতে দেখলাম। কাপড়-চোপড়গুলো দেখতে অবাঙালি শিশুদের পরিহিত বস্ত্রের মতো মনে হলো। কয়েকজন বন্ধুর সহযোগিতায় আমি একটি কবর খুড়ি এবং গণকবর থেকে নির্দোষ মানুষের দেহাবশেষ উদ্ধার করি। পরবর্তীতে আমি জানতে পারি যে, ১৯৭১ সালের মার্চে বিদ্রোহীরা এ বাড়িটিকে একটি কসাইখানা হিসেবে ব্যবহার করেছিল এবং সেখানে তারা বহু মহিলা ও শিশুকে হত্যা করে।

'১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পূর্ব পাকিস্তানের পতন ঘটলে মুক্তিবাহিনী ও আওয়ামী লীগ ফের অবাঙালি হত্যাযজ্ঞে মেতে উঠে। এসময় যারা নিহত হয় তাদের মধ্যে ছিল শত শত পাঞ্জাবী ও পাঠান। এসব পশ্চিম পাকিস্তানি চট্টগ্রামে ব্যবসা করতো অথবা সরকারি কিংবা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করতো। অবাঙালিদের রেডক্রস শিবিরে আশ্রয় দেয়া হয়। এসব শিবির থেকে প্রচুর অবাঙালিকে অপহরণ করা ছিল মুক্তিবাহিনী ও আওয়ামী লীগের দৈনন্দিন কাজ। অপহৃতদের কারাগারে নির্যাতন করে হত্যা করা হয়। মৃতদেহগুলো সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হয়। চট্টগ্রামে অবস্থানকারী ভারতীয় সামরিক অফিসারদের সহানুভূতি আকর্ষণে স্থানীয় আওয়ামী লীগাররা অগভীর গণকবর থেকে শত শত অবাঙালির লাশ উত্তোলন করে দাবি করতো যে, এগুলো পাকিস্তান সেনাবাহিনীর গুলিতে নিহত বাঙালিদের কঙ্কাল। আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এসব কঙ্কাল বিদেশি সাংবাদিক বিশেষ করে ভারতীয় সাংবাদিকদের দেখাতো। ভারতীয় সেনাবাহিনী রেডক্রস শিবির থেকে যত খুশি অবাঙালি অপহরণে মুক্তিবাহিনীকে অবাধ অধিকার দিয়েছিল। শিবিরগুলোর পরিস্থিতি ছিল ভয়াবহ। আমরা দূষিত পানি পান করতাম এবং পচা রুটি খেতাম।'

(৪৭) **সাতচল্লিশতম সাক্ষীর বিবরণঃ** ৩০ বছরের জেবুন্নিসার স্বামী মোহাম্মদ আহমেদ চট্টগ্রামে পোস্টম্যান হিসেবে চাকরি করতেন। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ বাঙালি বিদ্রোহীরা তার স্বামীকে হত্যা করে। এ ঘটনার স্বাক্ষ্য দিতে গিয়ে জেবুন্নিসা বলেছেনঃ

'২৫ মার্চ সকাল ১০টায় এক ডজন সশস্ত্র বাঙালি চট্টগ্রামের ষোলশহরে আমাদের বাড়িতে প্রবেশ করে। আক্রমণকারীদের মধ্যে দু'জন ছিল হিন্দু। তাদের সহযোগীদের কাছ থেকে আমি তাদের নাম শুনতে পাই। তিনজন বন্দুকধারী আমার স্বামীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং তারা তাকে গুলি করে হত্যা করে। অন্যান্য বন্দুকধারী আমাদের বাড়ি লুট করে। একজন বন্দুকধারী আমার ছোট সন্তানের দিকে বন্দুক তাক করলে আমি তাকে ধরে ফেলি। আমি তার কাছ থেকে বন্দুক কেড়ে নেই। কিন্তু কিভাকে গুলি করতে হয় আমি তা জানতাম না। সব বন্দুকধারী আমাকে ঝাপটে ধরে এবং চড়-থাপ্পর ও লাথি মারতে থাকে। বন্দুকধারীরা আমার স্বামীর লাশ টেনে হিঁচড়ে একটি গর্তে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। আমাদের বাঙালি প্রতিবেশীরা নীরব দর্শক হয়ে আমাদের বাড়িতে হামলার দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে। তারা জানায় যে, তারা ভয়ে এগিয়ে আসতে পারেনি। তবে আমার বাঙালি প্রতিবেশীরা আমার স্বামীকে কবর দিতে সহায়তা করে। ---

'২৬ মার্চ একজন সশস্ত্র বিদ্রোহী আমার বাড়িতে এসে আমাকে বললো যে, আমাদের এলাকার প্রত্যেক অবাঙালি পুরুষকে হত্যা করার জন্য তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

www.pathagar.com

সে আমাকে কোনো অবাঙালি বন্ধুকে আশ্রয় না দেয়ার হুকুম দেয়। সে আমাকে জানালো যে, এ কথার অন্যথা হলে আমাকে এবং আমার সন্তানদের হত্যা করা হবে। আমরা খুব ভয় পেয়ে যাই। ২৭ মার্চ পেছনের দরজা দিয়ে আমরা পালিয়ে যাই। তিন মাইল দূরে একটি জায়গায় গিয়ে পৌঁছাই। সেখানে কয়েকটি বর্মী পরিবার বসবাস করতো। আমি একটি পরিবারের কাছে আশ্রয় চাই। তারা আমাদেরকে ফেরেশতার মতো যত্ন করতো। পাকিস্তান সেনাবাহিনী চট্টগ্রাম ও আমাদের এলাকায় নিজেদের নিয়ন্ত্রণ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করলে ৯ এপ্রিল আমরা আমাদের বাড়িতে ফিরে আসি। ভারত পূর্ব পাকিস্তান কব্জা করে নিলে মুক্তিবাহিনী আমাদেরকে ভীতসন্ত্রস্ত করে তোলে এবং বাড়ি থেকে আমাদের বের করে দেয়। তারপর আমরা রেডক্রস শিবিরে বসবাস করতাম। ১৯৭৪ সালের জানুয়ারিতে আমি আমার চার সন্তান নিয়ে পাকিস্তানে প্রত্যাবাসন করি।...

(৪৮) আটচল্লিশতম সাক্ষীর বিবরণঃ ৫০ বছরের মুজিবা খাতুন চট্টগ্রামের সেগুন বাগান এলাকায় ৭৮/ কে নম্বর কোয়ার্টারে বসবাস করতেন। ১৯৭৪ সালের জানুয়ারিতে চট্টগ্রামে রেডক্রসের একটি শিবির থেকে তিনি পাকিস্তানে প্রত্যাবাসন করেন। পূর্ব পাকিস্তানে বসবাসকারী মুজিবা খাতুনের সকল আত্মীয়-স্বজন নিহত হয়। তিনি জানান যে, ১৯৭১ সালের ৩ মার্চ উন্মত্ত জনতা তাদের বাড়িতে হামলা ও লুট করার সময় তার বড় ছেলে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। সে মারা গেছে কিনা আক্রমণকারীরা তার শরীর পরীক্ষা করে তা নিশ্চিত হয়। মুজিবা খাতুন আরো জানান, আক্রমণকারীরা তাকে জানায়, বৃদ্ধ হওয়ায় তারা তাকে রেহাই দিচ্ছে। তার আরেক পুত্র সান্তাহরে অবাঙালি হত্যাকাণ্ডের দৃশ্য দেখতে পেয়ে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে।

(৪৯) **উনপঞ্চাশতম সাক্ষীর বিবরণঃ** ৭০ বছরের নবিহুন বিবি চট্টগ্রামের রৌফাবাদ এলাকায় ১০০ নম্বর কোয়ার্টারে বসবাস করতেন। ১৯৭১ সালের মার্চে বাঙালি বিদ্রোহীরা তার বৃদ্ধ স্বামীকে হত্যা করে। এ হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে নবিহুন বিবি তার সাক্ষ্যে বলেছেনঃ

'৩ মার্চ থেকে বিদ্রোহীরা বেশ কয়েকবার আমাদের এলাকায় হামলা চালায়। ২৫ মার্চ তারা আমাদের কলোনিতে সর্বাত্মক হামলা করে। একদল সশস্ত্র বাঙালি বিদ্রোহী আমাদের বাড়িতে প্রবেশ করে এবং আমার বৃদ্ধ ও অসুস্থ স্বামী আবদুল মজিদকে হত্যা করে। আমি তার মতো একজন বৃদ্ধ ও অসুস্থ লোককে রেহাই দেয়ার জন্য তাদের কাছে অনুনয় বিনয় করি। কিন্তু তারা জানায় যে, তাদেরকে প্রত্যেক অবাঙালি পুরুষকে হত্যা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তাদের একজন আমাকে বললো, আমরা তোমাকে হত্যা করছি না। কেননা কোনো একদিন তুমি আমাদের বাড়িতে চাকরানী হিসেবে কাজ করতে আসবে।...

'সেনাবাহিনী চট্টগ্রামে নিয়ন্ত্রণ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করলে আমরা ৯ মাস শান্তিতে বসবাস করেছি। কিন্তু ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর ভারত পূর্ব পাকিস্তান দখল করে নেয়ার পর মুক্তিবাহিনী ও আওয়ামী লীগের স্বেচ্ছাসেবকরা দ্বিতীয় দফা অবাঙালি হত্যাযজ্ঞে মেতে উঠে। তারা আমাকে আমার বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়ে বললো, অবাঙালি হিসেবে বাংলাদেশের এক ইঞ্চি জমির ওপর আমার কোনো মালিকানা নেই। আমি চট্টগ্রামে একটি ত্রাণ শিবিরে দু'বছর বসবাস করেছি। ১৯৭৪ সালে পাকিস্তানে প্রত্যাবাসন করি।'

www.pathagar.com

(৫০) **পঞ্চাশতম সাক্ষীর বিবরণ:** ২৭ বছরের তাহমিনা খাতুন চট্টগ্রামের ফিরোজশাহ কলোনিতে বাস করতেন। তার স্বামী আমিন জুট মিলে চাকরি করতেন। ১৯৭১ সালের মার্চে বাঙালি বিদ্রোহীরা তার স্বামীকে হত্যা করে। তিনি তার স্বামী হত্যাকাণ্ডের সাক্ষ্য দিতে গিয়ে বলেছেন:

> '১৫ মার্চ একদল বাঙালি আমাদের দরজার কড়া নাড়ে এবং আমার স্বামী আমানতউল্লাহর নাম ধরে ডাকতে থাকে। তিনি তাদের সঙ্গে দেখা করেন এবং তারা তাকে জানায় যে, আমিন জুট মিলে জরুরি প্রয়োজনে তাকে যেতে হবে। আগন্তুকদের একজন ছিল মিলের শ্রমিক। তাকে আমার স্বামী চিনতেন। আমি তাকে বাড়ি থেকে বের না হওয়ার অনুরোধ করি। কেননা আমি শুনতে পেয়েছিলাম বাঙালি বিদ্রোহীরা অবাঙালিদের ছল ছুঁতায় অপহরণ করে এবং পরে তাদের হত্যা করে। আমার স্বামী আমার অনুরোধ উপেক্ষা করে তাদের সঙ্গে বের হয়ে যান। এক ঘন্টা পর তাদের একজন ফিরে এসে আমাকে জানালো যে, আমি তাকে ৫০০ রুপি প্রদান করলে আমার স্বামীকে রেহাই দেয়া হবে। আমি আমার সব নগদ অর্থ বের করে তার হাতে তুলে দেই। আমার স্বামীকে কোথায় আটক রাখা হয়েছে তা দেখার জন্য আমি তার সঙ্গে ছুটে যাই। কিন্তু সে আমাকে ফাঁকি দিয়ে উধাও হয়ে যায়। আমি বাড়িতে ফিরে আসার পর দু'ট্রাক বোঝাই সশস্ত্র বাঙালি এসে পৌঁছায় এবং তারা আমাদের বাড়ির সব মূল্যবান জিনিস লুট করে। তারা রান্নার হাড়ি-পাতিল ও আসবাবপত্র পর্যন্ত তুলে নিয়ে যায়। পরদিন আমি শুনতে পাই যে, বিদ্রোহীরা আমার স্বামীকে হত্যা করেছে। আমি আমার বাপের বাড়িতে যাবার চেষ্টা করি। কিন্তু আমার বাপের বাড়ির এলাকাটি ছিল বিদ্রোহীদের নিয়ন্ত্রণে। দু'দিন পর আমি শুনতে পাই এলাকায় বিদ্রোহীদের এক হামলায় আমার পিতাও নিহত হয়েছেন।'

(৫১) **একান্নতম সাক্ষীর বিবরণ:** ২৭ বছরের হালিমা বিবি ১৯৭১ সালের ২৮ মার্চ চট্টগ্রামের রৌফাবাদ এলাকায় অবাঙালিদের বাড়িঘরে হামলার সময় বাঙালি বিদ্রোহীদের হাতে তার স্বামী মোহাম্মদ ওয়াকিলের নির্মম হত্যাকাণ্ড প্রত্যক্ষ করেন। ১৯৭১ সালের মার্চে পূর্ব পাকিস্তানে হত্যাযজ্ঞে তার এক ডজনের বেশি আত্মীয়-স্বজন নিহত হয়। ১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে হালিমা বিবি চট্টগ্রামে রেডক্রসের একটি শিবির থেকে পাকিস্তানে প্রত্যাবাসন করেন। তিনি তার সাক্ষ্যে বলেছেন:

> '২৮ মার্চ একদল আততায়ী আমাদের এলাকা আক্রমণ করে এবং অবাঙালিদের বাড়িঘর তছনছ করে। তারা এসব বাড়ির মূল্যবান সবকিছু লুট করে এবং ট্রাকে তুলে নিয়ে যায়। তারা আমার বাড়ি লুট করে আগুন ধরিয়ে দেয়। আমি ও আমার স্বামী জ্বলন্ত বাড়ি থেকে পালানোর সময় দু'জন বন্দুকধারী গুলি করে আমার স্বামীকে ঝাঁঝরা করে দেয়। ঘটনাস্থলে তার মৃত্যু হয়। চট্টগ্রামে আমার কোনো আত্মীয়-স্বজন না থাকায় আমাকেও শেষ করে দেয়ার জন্য বন্দুকধারীদের অনুরোধ করি। বন্দুকধারীরা বললো, 'কিছুদিন পরে আমরা তোমাকে আমাদের চাকরানী হিসেবে পাবো।' আমি আমার স্বামীকে একটি অগভীর গর্তে কবর দেই এবং কাদা মাটি দিয়ে গর্তটি ঢেকে দেই। আমি একদিনের জন্য মসজিদে আশ্রয় নেই। পরে আমি আংশিকভাবে পুড়ে যাওয়া আমার বাড়িতে ফিরে যাই। ১৯৭১ সালে এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে পাকিস্তানি সৈন্যরা এসে পৌঁছে এবং আমাকে

www.pathagar.com

একটি ত্রাণ শিবিরে স্থানান্তর করার প্রস্তাব দেয়। সান্তাহারে বসবাসকারী আমার পিতা জীবিত আছেন কিনা তা তাদের নিশ্চিত হতে বললাম। সেনাবাহিনী দ্রুত অনুসন্ধান শুরু করে। তারপর গভীর দুঃখের সঙ্গে আমাকে জানানো হয় যে, বাঙালি বিদ্রোহীরা আমার পিতাকেও হত্যা করেছে।...

(৫২) **বায়ান্নতম সাক্ষীর বিবরণ:** ৩৫ বছরের রোমাইশা খাতুন চট্টগ্রামের হালিশহর হাউজিং কমপ্লেক্সের বি-ব্লকের ৭৬৩ নম্বর কোয়ার্টারে বসবাস করতেন। তার স্বামী আনজারুল হক ছিলেন রেলওয়ের একজন কর্মচারী। ২৫ মার্চ বাঙালি বিদ্রোহীরা বাড়ি থেকে আনজারুল হককে অপহরণ করে। বিদ্রোহীরা তাকে গভর্নমেন্ট রেস্ট হাউজের কসাইখানায় হত্যা করে। ১৯৭৩ সালের ডিসেম্বরে তিন সন্তান নিয়ে রোমাইশা চট্টগ্রাম থেকে পাকিস্তানে প্রত্যাবাসন করেন। সাক্ষ্য দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন:

'৩ মার্চ বাঙালি বিদ্রোহীরা আমাদের এলাকায় প্রথম রক্তক্ষয়ী হামলা চালায়। তবে তারা আমাদের বাড়িতে প্রবেশ করেনি। ২৩ মার্চ একদল লোক আমাদের বাড়ি আক্রমণ করে এবং আমাদের হাড়ি-পাতিল ও আসবাবপত্রসহ যাবতীয় জিনিস ট্রাকে উঠিয়ে নিয়ে যায়। তারা আমাদেরকে পালানোর চেষ্টা না করার জন্য হুঁশিয়ার করে দিয়ে বললো, পালানোর সবগুলো রাস্তা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। আমরা ছিলাম অরক্ষিত। তারা আমাদের বাড়ি থেকে রান্না করার সামগ্রীও লুট করে নিয়ে যায়।...

'২৫ মার্চ রাতে আক্রমণকারীরা আবার আমাদের এলাকা আক্রমণ করে। তারা আমার দরজা ভেঙ্গে ফেলে এবং আমার স্বামীকে ধরে ফেলে। আমি তাদের পায়ে পড়ি এবং আমার স্বামীর জীবন ভিক্ষা দেয়ার জন্য তাদের কাছে কাকুতি-মিনতি করি। তারা আমার মাথায় লাথি মারে। আমি আল্লাহর দোহাই দিচ্ছিলাম। বিলাপ করছিলাম। বারবার তাদের করুণা ভিক্ষা করছিলাম। কিন্তু তারা আমার স্বামীকে জীপে তুলে নিয়ে যায়। আমি তাদেরকে বাংলায় বলতে শুনি যে, তারা রেস্ট হাউজের দিকে যাচ্ছে। আমি বুঝতে পারলাম আমার স্বামীকে কসাইখানায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কেননা ইতোমধ্যেই রেস্ট হাউজ কসাইখানা হিসেবে কুখ্যাতি অর্জন করেছিল। আমাদের এলাকা থেকে শত শত অবাঙালি পুরুষকে তাদের বাড়িঘর থেকে অপহরণ করা হয়েছিল। অপহৃতদের হত্যার জন্য কসাইখানায় জড়ো করে রাখা হয়। পাকিস্তান সেনাবাহিনী বিদ্রোহীদের কবল থেকে চট্টগ্রাম দখল করার পর আমি আমার স্বামীর মৃতদেহ খুঁজে বের করতে সহায়তা করার জন্য তাদের শরণাপন্ন হই। সেনাবাহিনী আমাকে জানায় যে, রেস্ট হাউজের কসাইখানায় মৃতদেহগুলো এমন ক্ষতবিক্ষত যে, শনাক্ত করা সম্ভব নয় এবং আমার স্বামীর লাশের কোনো চিহ্ন নেই।...'

(৫৩) **তিপান্নতম সাক্ষীর বিবরণ:** ৩৫ বছরের সালমা খাতুনের স্বামী চট্টগ্রামের রৌফাবাদ এলাকায় দর্জি হিসেবে কাজ করতেন। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে একদল বাঙালি বিদ্রোহী তাদের বাড়িতে হামলা চালিয়ে তার স্বামী আলী রেজা, আলী রেজার ছোট ভাই এবং তার ভাগিনাকে হত্যা করে। হামলাকারীরা তাদের বাড়ির সর্বস্ব লুট করে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয়। সালমা খাতুন তার সাক্ষ্যে বলেছেন:

'হামলাকারীরা ছিল উন্মত্ত। তারা জানায় যে, প্রত্যেক অবাঙালি পুরুষকে হত্যা করার জন্য তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তারা আরো বললো, অদূর ভবিষ্যতে তাদের

www.pathagar.com

বাড়িতে চাকরানী হিসেবে খাটানোর জন্য তারা আমাকে রেহাই দিচ্ছে। আড়াই বছর দুর্বিষহ জীবন-যাপনের পর ১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে আমি সন্তানসহ পাকিস্তানে প্রত্যাবাসন করি।'

(৫৪) **চুয়ান্নতম সাক্ষীর বিবরণ:** ৪০ বছরের ফাতেমা বেগম তার ব্যবসায়ী স্বামী আবদুর রহমানের সঙ্গে চট্টগ্রামের রৌফাবাদে একটি বাড়িতে বসবাস করতেন। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ একদল সশস্ত্র বাঙালি বিদ্রোহী তাদের বাড়িতে হামলা করে এবং তার স্বামীকে হত্যা করে। তারা তাদের বাড়ি লুট করে এবং ট্রাকে করে লুণ্ঠিত মালামাল নিয়ে যায়। ১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে ফাতেমা ও তার সন্তানরা চট্টগ্রাম থেকে করাচিতে প্রত্যাবাসন করে। তারা চট্টগ্রামে রেডক্রসের একটি ত্রাণ শিবিরে সোয়া দু'বছর বসবাস করে। ঘটনার ব্যাপারে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে ফাতেমা বেগম বলেছেন:

'সশস্ত্র বিদ্রোহীরা যখন অবাঙালিদের বাড়িঘর আক্রমণ করে তখন হত্যা এবং লুট করাই ছিল তাদের মূল উদ্দেশ্য। বিদ্রোহীরা চট্টগ্রামে হত্যা, লুট ও অগ্নিসংযোগে একটি নির্দিষ্ট প্যাটার্ন অনুসরণ করে। এক মাসব্যাপী নিষ্ঠুর হত্যাযজ্ঞে বিদ্রোহীরা প্রাপ্তবয়স্ক অবাঙালি পুরুষদের অধিকাংশকে হত্যা করে।...'

'আমাদের এলাকায় বাঙালি বিদ্রোহীরা শত শত কিশোরী মেয়েকে অপহরণ করে। বিদ্রোহীরা পিছু হটার পর আমরা তাদের কোনো চিহ্ন খুঁজে পাইনি। আমরা জানতে পারি যে, বিদ্রোহীরা সতীত্ব বিনষ্ট করার পর হত্যা করে তাদের লাশ কর্ণফুলি নদীতে নিক্ষেপ করেছে।'

(৫৫) **পঞ্চান্নতম সাক্ষীর বিবরণ:** ৫৫ বছরের সৈয়দা বেগমের স্বামী মকবুল আহমেদ খান চট্টগ্রামে পূর্ব পাকিস্তান রেলওয়েতে চাকরি করতেন। স্বামীর সঙ্গে তিনি চট্টগ্রামের ফিরোজশাহ কলোনির 'সি' বিল্ডিংয়ের ২১ নম্বর এপার্টমেন্টে বসবাস করতেন। ১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে তিনি করাচিতে ফিরে আসেন। সৈয়দা বেগম তার সাক্ষ্যে বলেছেন:

'৩ মার্চ বাঙালি বিদ্রোহীরা আমাদের কলোনিতে প্রথম হামলা করে। তারা অবাঙালিদের বেশ কয়েকটি বাড়িতে লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ করে এবং কয়েকজন অবাঙালি পুরুষকে অপহরণ করে।...'

'২৫ মার্চ একদল সশস্ত্র বাঙালি বিদ্রোহী আমাদের ফ্ল্যাটের সামনের দরজা ভেঙ্গে ভেতরে প্রবেশ করে এবং আমার স্বামীকে ধরে ফেলে। তারা দড়ি দিয়ে আমার স্বামীকে বেঁধে ফেলে এবং টেনে হিঁচড়ে তাকে ফ্ল্যাটের বাইরে নিয়ে যায়। আমাদের প্রতিবেশীরা ছিল অসহায়। কেননা একইভাবে আমাদের প্রতিবেশী পুরুষদেরও ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। বাঙালি বিদ্রোহীরা আমাদের ফ্ল্যাট লুট করে এবং লুণ্ঠিত জিনিসপত্র ট্রাকে উঠিয়ে নিয়ে যায়।...

'৯ এপ্রিল সেনাবাহিনী আমাদের সহায়তায় এগিয়ে এলে আমি আমার স্বামীকে খুঁজে বের করতে চট্টগ্রামের প্রতিটি আনাচে-কানাচে ছুটে বেরিয়েছি। কিন্তু তার কোনো সন্ধান পাইনি। আমি জানতে পারি যে, বিদ্রোহীরা আমাদের এলাকা থেকে অপহৃত সকল অবাঙালি পুরুষকে কসাইখানায় নিয়ে হত্যা করেছে। হত্যা করার পর লাশগুলো কর্ণফুলি

www.pathagar.com

নদীতে ফেলা দেয়া হয়েছে। ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে মুক্তিবাহিনী চট্টগ্রাম দখল করে নেয়ার পর তারা আমাকে আমার বাড়ি থেকে বের করে দেয়। আমি এবং আমার একমাত্র পুত্র চট্টগ্রামে রেডক্রসের একটি শিবিরে দু'বছর বাস করেছি।'

(৫৬) **ছাপান্নতম সাক্ষীর বিবরণঃ** ৩৪ বছরের সাঈদা খাতুনের স্বামী বাফাতি হোসেন চট্টগ্রাম পোর্ট ট্রাস্টে একজন প্রহরী হিসেবে চাকরি করতেন। তারা চট্টগ্রামের হালিশহরে এক নম্বর সড়কে 'এ' ব্লকের ৫৯৪ নম্বর কোয়ার্টারে বসবাস করতেন। সাঈদা খাতুন ১৯৭৪ সালের জানুয়ারিতে করাচিতে প্রত্যাবাসন করেন। তিনি তার সাক্ষ্যে বলেছেনঃ

'৫ মার্চ একদল লোক আমাদের বাড়িতে হানা দেয়। তারা বন্দুকের মুখে আমার পিতা ও আমার বড় ভাইকে দড়ি দিয়ে বেঁধে ট্রাকে তুলে নিয়ে যায়। তারা আমাদের বাড়ি লুট করে এবং সর্বস্ব নিয়ে যায়।...

'একটি বাঙালি ছেলে আমাদের পরিবারকে চিনতো। সে বিকালে এসে আমাকে দুঃসংবাদ দেয় যে, বিদ্রোহীরা আমার পিতা ও ভাইকে হত্যা করে তাদের লাশ নদীতে ভাসিয়ে দিয়েছে। পাকিস্তান সেনাবাহিনী পুনরায় চট্টগ্রাম দখল করে নেয়ার পর আমি আমার বৃদ্ধা মাকে তার ভস্মীভূত বাড়ি থেকে আমাদের বাড়িতে নিয়ে আসি। আমার স্বামী চট্টগ্রাম বন্দরে হত্যাযজ্ঞ থেকে রক্ষা পান।...

'১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে ভারতীয় সেনাবাহিনী বিজয়ী হওয়ার পর মুক্তিবাহিনী অবাঙালিদের বিরুদ্ধে হত্যাযজ্ঞ, লুটতরাজ ও সহিংসতায় মেতে উঠে। আমরা হত্যাকাণ্ড থেকে রক্ষা পাই। ১৯৭২ সালে আমার স্বামী সামান্য অসুখে মারা যান। ওষুধ কেনার মতো আমাদের হাতে কোনো অর্থ ছিল না। হাসপাতালে অবাঙালিদের যথাযথ চিকিৎসা পাওয়া ছিল দুষ্কর।'

(৫৭) **সাতান্নতম সাক্ষীর বিবরণঃ** ৫৫ বছরের জয়নাব বিবি চট্টগ্রামের রৌফাবাদে ১১১ নম্বর কোয়ার্টারে তার দুই কিশোর পুত্র নিয়ে বসবাস করতেন। ১৯৭১ সালের মার্চে বাঙালি বিদ্রোহীরা তার দুই পুত্রকে হত্যা করে। তিনি সে ঘটনার সাক্ষ্য দিতে গিয়ে বলেছেনঃ

'৩ মার্চ বাঙালি বিদ্রোহীরা চট্টগ্রামে অবাঙালিদের বিরুদ্ধে প্রথম আক্রমণ চালানোর দিন আমি আমার দু'পুত্র নিয়ে নিকটবর্তী জঙ্গলে পালিয়ে যাই। সেখানে আমরা রাত কাটাই।...

'২৫ মার্চ একটি বিশাল সশস্ত্র গ্রুপ আমাদের কলোনি আক্রমণ করে। সশস্ত্র লোকজন এত দ্রুত আক্রমণ করে যে, আমরা পালানোর সময় পাইনি। আমার দুই পুত্রকে খাটের নিচে লুকিয়ে রাখি। খাটের ওপরে ছিল একটি তোষক। সশস্ত্র লোকজন জানতো যে, আমি বিধবা এবং আমার দুই পুত্র আছে। হামলা করার আগে তারা আমার বাড়ি সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিয়েছিল। তারা আমার বাড়ি লুট করে। এমনকি রান্না ঘর থেকে ভাতও নিয়ে যায়। বেরিয়ে যাবার আগ মুহূর্তে আমার খাটের ওপরে বিছানো তোষকের প্রতি তাদের নজর পড়ে। তোষক তুলে নেয়ার জন্য তাদের একজন ভেতরে প্রবেশ করে। লোকটি আমার দু'পুত্রকে খাটের নিচে জড়োসড়ো অবস্থায় দেখতে পায়। সে চিৎকার দেয় এবং তার চিৎকার শুনে অন্যরা পুনরায় ফিরে আসে। পুত্রদের লুকিয়ে রাখার

www.pathagar.com

জন্য তাদের একজন আমাকে থাপ্পর ও লাথি মেরে বললো, আমার চোখের সামনে তাদের গুলি করে হত্যা করা হবে। আমি তাদের পায়ে পড়ি এবং আমার প্রিয় সন্তানদের জীবন ভিক্ষা দেয়ার জন্য তাদের কাছে কাকুতি-মিনতি করি। কিন্তু সশস্ত্র ব্যক্তিরা উন্মাদ হয়ে যায়। তারা আমার দু'পুত্রকে দেয়ালের পাশে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে খুব কাছ থেকে গুলি করে। আমি তাদের বাধা দেয়ার চেষ্টা করি। উন্মত্ত বিদ্রোহীরা আমাকে রাইফেলের বাট দিয়ে মাথায় আঘাত করে। আমি অজ্ঞান হয়ে যাই।

'আমি একটি হাসপাতালে চোখ খুলি। সেনাবাহিনী আমাকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে এসেছিল। আমি আমার বাড়িতে ফিরে যেতে অস্বীকৃতি জানাই। আমি মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলি। আমার দু'পুত্রকে হত্যা করার অসহনীয় দৃশ্য আমাকে দিন রাত তাড়া করে ফিরতো। আমাকে ত্রাণ শিবিরে নেয়া হয়। ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে ভারতীয় ও মুক্তিবাহিনী চট্টগ্রাম দখল করে নেয়ার পর অবাঙালিরা আবার উচ্ছৃঙ্খল বিজয়ীদের হত্যাযজ্ঞের শিকার হয়। সংসারে আমার কোনো আত্মীয়-স্বজন ছিল না। ১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে আমি করাচিতে প্রত্যাবাসন করি। যারা আমার দু'সন্তানকে হত্যা করেছে তাদের আতঙ্ক আমাকে আর এখন তাড়া করে না। তবে আমি জীবনের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছি। আমি শেষদিনের বিচারের জন্য অপেক্ষা করছি।

(৫৮) আটান্নতম সাক্ষীর বিবরণ: ২৫ বছরের হাসিনা খাতুনের স্বামী মোহাম্মদ ইয়াসিন চট্টগ্রামে আমিন জুট মিলে চাকরি করতেন। তারা চট্টগ্রামের ষোলশহরে একটি ভাড়া বাসায় বসবাস করতেন। একটি জঙ্গলে পালিয়ে গিয়ে তারা ১৯৭১ সালের মার্চ সংঘটিত হত্যাযজ্ঞ থেকে রক্ষা পান। ১৯৭১ সালে ডিসেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে ভারতীয় ও মুক্তিবাহিনী চট্টগ্রাম দখল করে নেয়ার পর একদল সশস্ত্র লোক তাদের এলাকায় হামলা চালায়। হাসিনা খাতুন ও তার স্বামী আবারো পালানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু তার স্বামী পায়ে গুলিবিদ্ধ হন। হাসিনা নিচু হয়ে তার স্বামীকে উঠে দাঁড়াতে সহায়তা করার সময় কোল থেকে তার ৪ মাসের কন্যা সন্তান মাটিতে পড়ে যায়। মেয়েটি মাথায় আঘাত পায়। হাসিনা তার মেয়ের মাথা ও বুকে মালিশ করেন। কিন্তু শিশুটি রাস্তায় মারা যায়। তার স্বামী যখন যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছিলেন সে সময় হাসিনা একটি অগভীর কবর খনন করে সন্তানকে দাফন করেন। তিনি চট্টগ্রামে রেডক্রসের একটি শিবিরে দু'বছর বাস করেন। ১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে তিনি করাচিতে প্রত্যাবাসন করে। হাসিনা তার সাক্ষ্যে বলেছেন:

'একজন ধার্মিক বাঙালি আমাদের দুরবস্থা দেখতে পেয়ে আমাদের উদ্ধারে এগিয়ে আসেন। তিনি আমার আহত স্বামীকে প্রধান হাসপাতালে নিয়ে যান এবং চিকিৎসার জন্য তাকে ভর্তি করার জন্য বাঙালি ডাক্তারদের অনুরোধ করেন। বিহারী হওয়ায় তারা তাকে ভর্তি করতে অনিচ্ছুক বলে মনে হলো। হাসপাতালের চিকিৎসায় তার অবস্থার উন্নতি হয়। আমি একটি বাড়িতে কাজ নেই। ওষুধ কেনার জন্য তার হাতে আমার উপার্জিত অর্থ তুলে দেই। ১৯৭২ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি আমি তাকে দেখার জন্য হাসপাতালে যাই। তখন আমাকে জানানো হয় যে, তিনি মারা গেছেন। আমি জানতে পারি যথাযথ চিকিৎসার অভাবে এ হাসপাতালে কয়েকজন বিহারী রোগীর মৃত্যু হয়েছে।'

www.pathagar.com

(৫৯) **উনষাটতম সাক্ষীর বিবরণ:** ৪০ বছরের বাতুলানের স্বামী চট্টগ্রামে আমিন জুট মিলে কাজ করতেন। তারা বিবিরহাটে বসবাস করতেন। ১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে বাতুলান ও তার কন্যা করাচিতে প্রত্যাবাসন করে। বাতুলান তার সাক্ষ্যে বলেছেন:

> '২৫ মার্চ একদল সশস্ত্র বাঙালি বিদ্রোহী বন্দুকের নলের মুখে আমাদেরকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়। তারা লুট করার পর আমাদের বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়। হামলাকারীরা আমাদের জানিয়ে দেয় যে, পূর্ব পাকিস্তানে আমাদের কোনো ঠাঁই হবে না। আমাদের বাড়িটি পুড়ে ছাই হয়ে গেলে আমার স্বামী মোহাম্মদ মোস্তফা, আমার শিশু কন্যা এবং আমি একটি মসজিদে আশ্রয় নেই। আরেকদল হামলাকারী আল্লাহর ঘর মসজিদে হামলা করে। আমার স্বামীকে দড়ি দিয়ে বাঁধার চেষ্টা করার সময় তাদের সঙ্গে তার ধস্তাধস্তি শুরু হয়। এসময় আমি একজনের কাছ থেকে একটি বন্দুক কেড়ে নেয়ার চেষ্টা করি। এ বন্দুকধারী আমাকে বেয়নেট দিয়ে আঘাত করলে আমার হাত রক্তে ভেসে যায়। বন্দুকধারীরা আমার স্বামীকে মসজিদের বাইরে অপেক্ষমান একটি ট্রাকে তুলে দ্রুতবেগে স্থান ত্যাগ করে। আমি জানতে পারি যে, তাকে অবাঙালি হত্যাযজ্ঞের জন্য তৈরি একটি কসাইখানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আমি ও আমার শিশু মেয়ে এক সপ্তাহ মসজিদে অবস্থান করি। আমরা দিনের পর দিন অনাহারে থাকতাম। পাকিস্তান সেনাবাহিনী আমাদের উদ্ধার করে। পরে আমরা একটি ত্রাণ শিবিরে আশ্রয় নেই।...'

(৬০) **ষাটতম সাক্ষীর বিবরণ:** ৩০ বছরের জেবুন্নিসা চট্টগ্রামে ফিরোজশাহ কলোনিতে বসবাস করতেন। তার স্বামী আখতার হোসেন চট্টগ্রামে ইস্পাহানি চা কোম্পানিতে কেরানী হিসেবে কাজ করতেন। ১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে জেবুন্নিসা তার তিন সন্তান নিয়ে করাচিতে প্রত্যাবাসন করেন। তিনি তার সাক্ষ্যে বলেছেন:

> '১৯৭১ সালের ৩ মার্চ থেকে বাঙালি বিদ্রোহীরা প্রায়ই আমাদের কলোনিতে হামলা করতো। কিন্তু আমরা এসব হামলা থেকে রক্ষা পাই। ২৫ মার্চ একদল সশস্ত্র লোক আমাদের এলাকায় হামলা চালায়। তারা শত শত ঘরবাড়ি লুট এবং বহু বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করে। তারা আমার বাড়িও লুট করে এবং বিগত বছরগুলোয় আমরা তিল তিল করে যা সঞ্চয় করেছিলাম সেগুলো ট্রাকে তুলে নিয়ে যায়। তারা আমার স্বামীকে দড়ি দিয়ে বেঁধে ট্রাকে উঠিয়ে নিয়ে যায়। আমি জানতে পারি যে, ২৫ মার্চ বাঙালি বিদ্রোহীরা শত শত অবাঙালি পুরুষকে অপহরণ করে। যারা পালানোর চেষ্টা করেছিল তাদেরকে গুলি করে হত্যা করা হয়। আমাকে জানানো হয় যে, বিদ্রোহীরা আমার স্বামীকে একটি কসাইখানায় নিয়ে গেছে এবং সেখানে অন্যান্য অবাঙালি বন্দির সঙ্গে তাকেও জবাই করা হয়েছে। বিদ্রোহীরা কয়েকটি কারাগার ও ভবনকে কসাইখানা বানিয়েছিল। পাকিস্তান সেনাবাহিনী চট্টগ্রাম পুনরুদ্ধার করার পর আমি এসব কারাগার ও ভবনে যাই। কিন্তু আমি আমার স্বামীকে কোথাও খুঁজে পাইনি। বিদ্রোহীরা সাধারণত তাদের হাতে বন্দিদের লাশ কর্ণফুলি নদীতে নিক্ষেপ করতো।'

(৬১) **একষট্টিতম সাক্ষীর বিবরণ:** ৪০ বছরের মহিলা খাতুন চট্টগ্রামের ওয়ারলেস কলোনিতে একটি বস্তিতে বসবাস করতেন। ১৯৭১ সালের ৩ মার্চ একজন বাঙালি বিদ্রোহী

www.pathagar.com

তার স্বামীকে গলা কেটে হত্যা করে। এ দৃশ্য দেখে তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলেন। ১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে দু'সন্তানসহ তিনি চট্টগ্রাম থেকে করাচিতে প্রত্যাবাসন করেন। তিনি তার সাক্ষ্যে বলেছেন:

> 'আমার স্বামী শেখ আমানত চট্টগ্রামে আমিন জুট মিলে কাজ করতেন। ১৯৭১ সালের ৩ মার্চ একদল বাঙালি জনতা 'জয় বাংলা' শ্লোগান দিয়ে আমাদের অবাঙালি কলোনি আক্রমণ করে। তারা শত শত বাড়িঘর লুট করে এবং বহু বাড়িতে আগুন দেয়। লোকজন জ্বলন্ত বাড়ি থেকে পালানোর চেষ্টা করার সময় তাদেরকে গুলি করে হত্যা করা হয়। একদল লোক আমার বাড়িতেও হামলা চালায়। তারা আমাদের যাবতীয় মূল্যবান সামগ্রী লুট করে। তারা আমার স্বামীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। একজনের হাতে একটি বিরাট ছোরা দেখে আমি তাকে ঝাপটে ধরে ফেলি। সে আমাকে মাথায় আঘাত করলে আমি মাটিতে পড়ে যাই। পরবর্তী মুহূর্তে আমি তাকে আমার স্বামীর গলা কাটতে দেখি। আমি জ্ঞান হারাই এবং অচেতন হয়ে পড়ি। পরবর্তী তিন মাস আমি প্রায়ই প্রলাপ বকতাম। পাকিস্তান সেনাবাহিনী আমাকে এবং আমার সন্তানদের সরদার বাহাদুর স্কুলে একটি শিবিরে স্থানান্তর করে। ১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে আমরা করাচিতে প্রত্যাবাসন করি।...'

(৬২) **বাষট্টিতম সাক্ষীর বিবরণ:** ৩০ বছরের হামিদা চট্টগ্রামের ফিরোজশাহ কলোনিতে বসবাস করতেন। তার স্বামী চট্টগ্রামে পূর্ব পাকিস্তান রেলওয়েতে চাকরি করতেন। ১৯৭১ সালের ২৪ মার্চ বাঙালি বিদ্রোহীরা একটি মসজিদে আশ্রয়গ্রহণকারী সকল অবাঙালি পুরুষকে হত্যা করে। হামিদা তার স্বামী নিজামউদ্দিনকে মাটিতে রক্তে গড়াগড়ি খেতে দেখে জ্ঞান হারান। ১৯৭৪ সালের জানুয়ারিতে তিনি করাচিতে প্রত্যাবাসন করেন। হামিদা তার সাক্ষ্যে বলেছেন:

> '১৯৭১ সালের ২৩ মার্চ একদল উন্মত্ত বাঙালি আমাদের এলাকায় হামলা চালায়। তারা শত শত বাড়িতে লুটপাট চালায় এবং অগ্নিসংযোগ করে। বিদ্রোহীরা আমার বাড়িও লুট করার পর ভস্মীভূত করে। আমি ও আমার স্বামী নিকটবর্তী একটি মসজিদে পালিয়ে গিয়ে রক্ষা পাই। মসজিদে আরো বহু আতঙ্কিত অবাঙালি পরিবার আশ্রয় নিয়েছিল। একদিন আগে যা ছিল একটি জনবহুল ও আনন্দমুখর জনপদ সেখানে রাতে আমরা আগুনের লেলিহান শিখা দেখি।...
>
> '১৯৭১ সালের ২৪ মার্চ দুপুরের প্রাক্কালে ৫০ জন সশস্ত্র বাঙালি ট্রাক ও জীপে করে উদ্যত বন্দুক নিয়ে মসজিদে প্রবেশ করে। তারা সকল অবাঙালি পুরুষকে মসজিদের সামনে সমবেত হওয়ার নির্দেশ দেয়। যারা পালানোর চেষ্টা করছিল তাদেরকে তৎক্ষণাৎ গুলি করে হত্যা করা হয়। মসজিদের দেয়ালে সবাইকে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে বাঙালি বিদ্রোহীরা তাদের ওপর গুলি চালায়। কেউ রক্ষা পায়নি। কেউ জীবিত আছে কিনা তা নিশ্চিত হওয়ার জন্য বাঙালি বিদ্রোহীরা দু'ঘন্টা মসজিদে অবস্থান করে। আমাদেরকে লাশ স্পর্শ না করার নির্দেশ দেয়া হয়। আমি আমার স্বামীকে মাটিতে পড়ে থাকতে দেখে জ্ঞান হারাই। তার বুক থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত বের হচ্ছিল। তিনদিন পর আমরা আমাদের ভস্মীভূত ঘরবাড়িতে ফিরে আসি। পরবর্তীতে পাকিস্তান সেনাবাহিনী আমাদেরকে একটি ত্রাণ শিবিরে স্থানান্তর করে।...'

www.pathagar.com

(৬৩) তিষট্টিতম সাক্ষীর বিবরণ: ৩৭ বছরের মবিনা খাতুন চট্টগ্রামে পাহাড়তলীর ঝাউতলা কলোনিতে বসবাস করতেন। তার স্বামী আজিজুর রহমান একটি সরকারি ওয়ার্কশপে একজন ফিটার হিসেবে চাকরি করতেন। তারা ১৯৭১ সালের মার্চে চট্টগ্রামে অবাঙালি হত্যাযজ্ঞ থেকে বেঁচে যান। কিন্তু দিনাজপুরে মবিনা খাতুনের বড় ভাই, ভাবী ও তাদের ছেলেমেয়েকে বাড়িতে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে হত্যা করা হয়। ১৯৭১ সালের মার্চে তার স্বামী আজিজুর রহমানের ভাইদের ময়মনসিংহ ও চট্টগ্রামের কালুরঘাটে হত্যা করা হয়। মুক্তিবাহিনীর নিয়ন্ত্রণ কায়েম হওয়ার পর ১৯৭২ সালে মবিনা খাতুন তার স্বামীকে হারান। ১৯৭৪ সালে তিনি করাচিতে ফিরে আসেন। মবিনা খাতুন তার সাক্ষ্যে বলেছেন:

> '১৯৭২ সালের ৮ জানুয়ারি আমার স্বামী ছিলেন অসুস্থ। চিকিৎসা গ্রহণে হাসপাতালের উদ্দেশে তিনি বাড়ি থেকে বের হন। পথে মুক্তিবাহিনী তার ওপর হামলা চালায় এবং গুলি করে তাকে হত্যা করে। রাতে তার খোঁজে আমি বাড়ি থেকে বের হই। কয়েকজন বাঙালি আমাকে চিনতো। এসব বাঙালি আমাকে জানায় যে, তারা একটি গর্তে একটি লাশ পড়ে থাকতে দেখেছে। তাদের কথামতো আমি সেখানে ছুটে যাই এবং গর্তের মধ্যে বুলেটে ক্ষতবিক্ষত আমি আমার স্বামীর লাশ দেখতে পাই। আমি আত্মহত্যার কথা ভাবছিলাম। কিন্তু সন্তানদের কথা চিন্তা করে আমি বেঁচে থাকি।...'

(৬৪) চৌষট্টিতম সাক্ষীর বিবরণ: ৩৫ বছরের সানজিদা খাতুনের স্বামী চট্টগ্রামে ইলেক্ট্রিক সাপ্লাই অফিসে কাজ করতেন। চট্টগ্রামের হালিশহরে একটি ছোট বাড়িতে তারা বসবাস করতেন। ১৯৭৪ সালের জানুয়ারিতে সানজিদা খাতুন করাচিতে প্রত্যাবাসন করেন। ১৯৭১ সালের মার্চে বাঙালি বিদ্রোহীদের হাতে তার স্বামীর হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন:

> '৩ মার্চ থেকে চট্টগ্রামে অবাঙালি বসতিতে বিদ্রোহীদের পরিচালিত বর্বর হত্যাকাণ্ডে ভীত সন্ত্রস্ত প্রায় আড়াই শ' অবাঙালি পুরুষ, মহিলা ও শিশু আমাদের এলাকায় বিশাল দেয়ালের একটি ভবনে আশ্রয় নেয়। আমি, আমার স্বামী ও তিন সন্তান এ ভবনে ছিলাম। বিগত সপ্তাহগুলোয় হামলার সময় বিদ্রোহীরা আমাদের বাড়ি লুট এবং অগ্নিসংযোগ করে।...
>
> '২৭ মার্চ প্রায় ৫শ' সশস্ত্র বিদ্রোহী আমাদের ভবনে হামলা চালায়। আমরা ছিলাম অসহায়। আমাদের কাছে রান্নাঘরে ব্যবহৃত একটি চাকুও ছিল না। তাই প্রতিরোধ করার প্রশ্নই উঠে না। সশস্ত্র লোকজন আমাদের প্রতি বন্দুক তাক করে পুরুষদের লক্ষ্য করে বললো, মহিলা ও সন্তানদের জীবিত দেখতে চাইলে তাদেরকে ভবনের দেয়ালের সামনে লাইনে দাঁড়াতে হবে। তাদের হুকুম অনুযায়ী পুরুষরা তাদের সন্তানদের চুমো দেয় এবং স্ত্রী, মা ও বোনদের কাছ থেকে শেষ বিদায় গ্রহণ করে। তারা ভবনের সামনে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ায় এবং দশ মিনিটের কম সময়ের মধ্যে বাঙালি বন্দুকধারীরা তাদের সবাইকে গুলি করে শুইয়ে দেয়।
>
> 'তারপর বন্দুকধারীরা আমাদেরকে একটি গোডাউনে নিয়ে যায়। গোডাউনটি ছিল দেখতে অন্ধকার খুপরির মতো। মেঝের সর্বত্র ছিল আবর্জনা। আমাদেরকে সেখানে গাদাগাদি করে রাখা হয়। আমার স্বামীকে মেরে ফেলায় আমি বাঁচার আগ্রহ হারিয়ে

www.pathagar.com

ফেলি। আমার সন্তানরা ছিল ক্ষুধার্ত। অন্ধকার কুঠুরিতে আমাদেরকে পানিও দেয়া হতো না। আমি একজন বাঙালি প্রহরীকে বলতে শুনি যে, পরদিন আমাদেরকে পুড়িয়ে মারা হবে। সশস্ত্র লোকজন গোডাউনে আগুন লাগিয়ে দেয়ার জন্য কেরোসিন তেলের টিন নিয়ে আসে। রাতে আমি আমার ছোট ছেলেকে জানালা গলিয়ে বাইরে বের করে দেই এবং তাকে গোডাউনের মূল দরজা খুলে দিতে বলি। দরজার মাঝামাঝি খিল লাগানো ছিল। তালা লাগানো ছিল না। ইতোমধ্যে পাকিস্তানি সৈন্যদের তৎপরতা শুরু হয়েছিল। মনে হচ্ছিল পাকিস্তানি সৈন্যদের অগ্রযাত্রা রোধে বিদ্রোহীরা বাঙালি প্রহরীদের মোতায়েন করেছিল। আমরা পালাতে সক্ষম হই এবং পাকিস্তান সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রিত একটি হাসপাতালের দিকে দৌড়াতে থাকি। পালানোর সময় পরণের শাড়ি ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাওয়ায় আমাদের অনেকে ছিল প্রায় বিবস্ত্র। সেনাবাহিনী গায়ে চড়ানোর জন্য আমাদের কাপড়-চোপড় দেয়। আমাদের কয়েকজনকে রেডক্রস শিবিরে পাঠানো হয়। অন্যরা তাদের বাড়িঘরে ফিরে যায়।...'

প্রত্যক্ষদর্শীরা ১৯৭১ সালের ২৭ মার্চ উসমানিয়া গ্লাস ফ্যাক্টরি এবং মার্চ-এপ্রিলে চট্টগ্রামের হাফিজ জুট মিল ও ইস্পাহানি জুট মিলে অবাঙালি হত্যাযজ্ঞের হৃদয়বিদারক বর্ণনা দিয়েছেন। বিবিরহাটে আমিন জুট মিলে স্টাফ সদস্য ও পরিবার-পরিজনসহ প্রায় ২ হাজার অবাঙালিকে হত্যা করা হয়। একইভাবে উসমানিয়া গ্লাস ফ্যাক্টরিতে প্রায় সব পশ্চিম পাকিস্তানি স্টাফ সদস্যকে হত্যা করা হয়। হাফিজ জুট মিলে বিদ্রোহীরা মিলের অবাঙালি মালিকের বাড়ি লুট ও অগ্নিসংযোগ করে এবং দেড় শ' অবাঙালি কর্মচারী ও তাদের পরিবারের সদস্যদের হত্যা করে। ইস্পাহানি জুট মিলে অবাঙালি হত্যাকাণ্ডের হাত থেকে খুব কমসংখ্যক অবাঙালি রক্ষা পেয়েছিল। পাকিস্তান সেনাবাহিনী মিল শ্রমিকদের বিনোদন ক্লাবে অসহায় নর-নারীর ক্ষত-বিক্ষত লাশের স্তূপ দেখতে পায়। এ বিনোদন ক্লাবকে বিদ্রোহীরা কসাইখানা হিসেবে ব্যবহার করেছিল।

১৯৭১ সালের মার্চ-এপ্রিলে আওয়ামী লীগের প্ররোচিত বিদ্রোহে চট্টগ্রাম বিভাগের বহু জায়গা আক্রান্ত হয়। প্রত্যক্ষদর্শীরা নাজিরহাট, আনোয়ারা, দোহাজারী, কুমিরা ও হাটহাজারীতে অবাঙালি হত্যাকাণ্ড এবং পাইকারীহারে তাদের বাড়িঘর লুটের বিবরণ দিয়েছেন। ১৯৭১ সালে মার্চের মাঝামাঝিতে এসব জায়গায় উত্তেজনা দেখা দিলে বহু অবাঙালি পরিবার চট্টগ্রাম শহরে পালিয়ে যায়। তাদের অনুপস্থিতিতে লুটেরারা তাদের ঘরবাড়ি লুট করে। কক্সবাজারেও মুষ্টিমেয় অবাঙালি সহিংসতার শিকার হয়।

www.pathagar.com

চতুর্থ অধ্যায়

চন্দ্রঘোনা ও রাঙ্গামাটিতে হত্যাযজ্ঞ

(৬৫) **পঁয়ষট্টিতম সাক্ষীর বিবরণ:** ৩৫ বছরের ওয়াজিহুন্নিসার স্বামী কেন্দ্রীয় শুল্ক বিভাগে চাকরি করতেন। তার পোস্টিং ছিল চন্দ্রঘোনায়। ওয়াজিহুন্নিসা তাদের শহরে ১৯৭১ সালের মার্চে সংঘটিত অবাঙালি হত্যাযজ্ঞ সম্পর্কে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে বলেছেন:

'১৯৭১ সালে মার্চের দ্বিতীয় সপ্তাহে আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসীরা আমাদের এলাকায় বাড়িতে এসে অবাঙালিদের আশ্বস্ত করে যে, অস্ত্র সমর্পণ করা হলে তাদের কোনো ক্ষতি করা হবে না। আমার ভদ্রলোক স্বামী তাদের নির্দেশ মেনে নেন এবং তার অস্ত্র সমর্পণ করেন।...

'মার্চের তৃতীয় সপ্তাহে আওয়ামী লীগের ভ্রাম্যমাণ সশস্ত্র লোকেরা অবাঙালিদের আতঙ্কিত করে তোলে এবং তাদের কাছ থেকে চাঁদা সংগ্রহ করে। তারা পালানোর সব ক'টি রাস্তা বন্ধ করে দেয়।...

'২৬ মার্চ আওয়ামী লীগের একটি সশস্ত্র গ্রুপ আমাদের বাড়িতে প্রবেশ করে এবং আমার স্বামীকে তাদের কার্যালয়ে যাবার নির্দেশ দেয়। আমি জানতাম যে, এটা হচ্ছে একটি ছুঁতা এবং তারা আমার স্বামীর রক্তের জন্য পিপাসার্ত।....

'২৭ মার্চ আরেকদল সশস্ত্র লোক আমাদের বাড়ি আক্রমণ করে। তারা আমাকে এবং আমার স্বামীর তিন ভাইকে জানায় যে, রাঙ্গামাটির জেলা প্রশাসক আমাদেরকে নিরাপত্তা প্রদানে তার কার্যালয়ে নিয়ে যাবার নির্দেশ দিয়েছেন। আমরা যাত্রা শুরু করলে সশস্ত্র লোকেরা আমাকে বন্দুকের ডগার মুখে ফিরে যাবার নির্দেশ দেয়। তারা আমার দেবরদের দড়ি দিয়ে বেঁধে ট্রাকে তুলে নিয়ে যায়।.....

'বিকালে একদল উন্মত্ত বাঙালি জনতা আমাদের এলাকায় হামলা চালায় এবং অবাঙালিদের বাড়িঘর লুট করে। আমাদের পুরুষদের অপহরণ করা হয়। একদল লোক আমার বাড়ি ভাঙচুর করে এবং সিলিং ফ্যান ও ওয়ার্ডড্রপ ছাড়া সবকিছু লুট করে। তারা অবাঙালি মহিলা ও শিশুদেরকে গরু-ছাগলের মতো তাড়িয়ে একটি বিশাল ভবনে নিয়ে যায়। আমাদেরকে সেখানে অবস্থান করার নির্দেশ দেয়া হয়। ১৫ দিন আমরা অনাহারে ছিলাম। আমরা আল্লাহর সহায়তা কামনা করি। ১৩ এপ্রিল আমাদের আটককারীরা জানতে পারে যে, পাকিস্তানি সৈন্যরা চন্দ্রঘোনার দিকে এগিয়ে আসছে। বিদ্রোহীরা আমাদেরকে লাইনে দাঁড়ানোর নির্দেশ দেয়। আমরা জানতাম যে, তারা আমাদের ওপর গুলি চালাবে। আমাদের কয়েকজন পালিয়ে যাবার চেষ্টা করে। তাতে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। হঠাৎ একটি গোলা এসে পতিত হয় এবং আমাদেরকে যেখানে রাখা হয়েছিল সেখান থেকে কয়েক গজ দূরে গোলাটি বিস্ফোরিত হয়। আমরা দূরে তাকিয়ে পাকিস্তানি সৈন্যদের একটি কোম্পানিকে সবুজ ও অর্ধ চন্দ্রাকৃতির নিশান উড়িয়ে আমাদের দিকে ধেয়ে আসতে দেখলাম। আমাদের আটককারীরা ভীত হয়ে পড়ে এবং

www.pathagar.com

ইঁদুরের মতো পালিয়ে যায়। পাকিস্তানি সৈন্যরা আমাদের পানি ও খাবার দেয়। তারা চন্দ্রঘোনায় আরেকটি শিবিরে আটক ২শ' অবাঙালি মহিলা ও শিশুকে মুক্ত করে। আমরা জানতে পারি যে, বিদ্রোহীরা চন্দ্রঘোনা থেকে যেসব অবাঙালিকে অপহরণ করেছিল তাদেরকে হত্যা করে লাশ কর্ণফুলি নদীতে ফেলে দিয়েছে।...

'পাকিস্তান সেনাবাহিনী আমাদেরকে চট্টগ্রামে একটি ত্রাণ শিবিরে ঠাঁই দেয়। ১৯৭১ সালে ডিসেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে ভারতীয় ও মুক্তিবাহিনী চট্টগ্রাম দখল করে নেয়ার পর তারা অবাঙালি হত্যাকাণ্ড এবং তাদের ধ্বংস সাধনে মেতে উঠে। শীতকালে আমার ছোট মেয়ে ঠাণ্ডায় আক্রান্ত হয়। কোনো হাসপাতাল বিহারীর সন্তানকে চিকিৎসা প্রদানে সম্মত হয়নি। সে আমার কোলে মৃত্যুবরণ করে। কয়েকদিন পর আমাকে রেডক্রসের একটি শিবিরে তোলা হয়। ১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে আমি করাচিতে প্রত্যাবাসন করি।'

চট্টগ্রামের প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছে যে, ১৯৭১ সালের এপ্রিলে বাঙালি বিদ্রোহীরা কর্ণফুলি পেপার ও রেয়ন মিল লুট করে এবং অবাঙালি স্টাফ ও তাদের পরিবারের সদস্যদের হত্যা করে। খুব কমসংখ্যক লোক পালাতে সক্ষম হয়। পিতা অথবা স্বামীকে হত্যা করার পর শত শত অবাঙালি যুবতীকে অপহরণ কর হয়। বাঙালি বিদ্রোহীরা অপহৃত অবাঙালি যুবতীদের ধর্ষণ করার পর হত্যা করে। হিসেব করে দেখা গেছে যে, ১৯৭১ সালের মার্চ-এপ্রিলে চন্দ্রঘোনায় ৫ হাজারের বেশি অবাঙালিকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হয়। এ সংখ্যা পাকিস্তান সরকারের হিসেব থেকে অনেক বেশি। পাকিস্তান সরকার আগস্টে পূর্ব পাকিস্তান সংকটের ওপর প্রকাশিত শ্বেতপত্রে চন্দ্রঘোনায় অবাঙালিদের মৃত্যুর সংখ্যা ৩ হাজার উল্লেখ করা হয়েছিল। ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলসের বিদ্রোহী সৈন্যরা কর্ণফুলি পেপার মিলের যাবতীয় নগদ অর্থ লুট করে এবং বিপুল পরিমাণ মুক্তিপণ পরিশোধ করায় কয়েকজন সিনিয়র স্টাফ সদস্যকে রেহাই দেয়।

www.pathagar.com

রাঙ্গামাটি

রাঙ্গামাটি হলো নৈসর্গিক দৃশ্য সম্বলিত পার্বত্য চট্টগ্রামের একটি মনোরম শহর। চট্টগ্রাম থেকে ৪৫ মাইল দূরে কর্ণফুলি নদীর তীরে এ শহর অবস্থিত। ১৯৭১ সালের মার্চ-এপ্রিলে আওয়ামী লীগের বিদ্রোহের অগ্নিশিখা এ শহরকে গ্রাস করে এবং এখানে শত শত অবাঙালিকে হত্যা করা হয়। ১৯৭১ সালের এপ্রিলে সশস্ত্র বিদ্রোহীরা রাঙ্গামাটিতে বসবসকারী সকল অবাঙালিকে আটক করে এবং পাকিস্তান সেনাবাহিনী এসে পৌঁছানোর আগে তাদের হত্যা করে। একসময় রাঙ্গামাটি সার্কিট হাউজে দূর-দূরান্তের পর্যটকরা ভিড় করতো। বিদ্রোহীরা এ সার্কিট হাউজকে তাদের অপারেশনাল ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করে। এখান থেকে বিদ্রোহীরা চন্দ্রঘোনা ও রাঙ্গামাটিতে অবাঙালিদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করতো।

(৬৬) **ছিষট্টিতম সাক্ষীর বিবরণ:** ৩৪ বছরের আবিদ হোসেন কর্ণফুলি পেপার মিলে চাকরি করতেন। মিলের আশপাশে কোনো স্টাফ কোয়ার্টার না পাওয়ায় তিনি রাঙ্গামাটিতে একটি বাড়িতে বাস করতেন। ১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে তিনি স্ত্রীসহ করাচিতে প্রত্যাবাসন করেন। আবিদ হোসেন তার সাক্ষ্যে বলেছেন:

> '১৮ মার্চ কর্ণফুলি পেপার মিলে প্রথম বড় ধরনের হামলার সূত্রপাত হয়। সেদিন আওয়ামী লীগের জঙ্গি সমর্থকরা অবাঙালি স্টাফ ও তাদের পরিবারকে হত্যা এবং মিল দখল করার জন্য বাঙালি শ্রমিকদের উত্তেজিত করে। পরিণতি আঁচ করতে পেরে আমি আমার বাড়িতে ছুটে যাই এবং আমি আমার স্ত্রীসহ একজন ধার্মিক ও বিশ্বস্ত বাঙালি বন্ধুর বাড়িতে আশ্রয় নেই।...
>
> '১৯৭১ সালে পুরো মার্চ জুড়ে আওয়ামী লীগের লোকজন অবাঙালিদের ভীত সন্ত্রস্ত করে তোলে এবং হত্যার জন্য বহু অবাঙালিকে অপহরণ করে। ১৯৭১ সালের এপ্রিলে বাঙালি বিদ্রোহীরা সকল অবাঙালিকে আটক করে এবং স্কুল ভবনগুলোতে তাদের জড়ো করে। সেনাবাহিনী এসে পৌঁছানোর আগে আটককৃতদের গুলি করে হত্যা করা হয়। সেনাবাহিনী বিদ্রোহীদের হটিয়ে দেয়ার পর আমি চট্টগ্রামে এক বন্ধুর বাড়িতে স্থানান্তরিত হই। রাঙ্গামাটিতে এসে আমি কদাচিৎ অবাঙালিদের দেখতে পাই।'

রাঙ্গামাটিতে আওয়ামী লীগের সহিংসতা থেকে কয়েকজন পালাতে সক্ষম হয়। এসব লোক ১৯৭১ সালের এপ্রিলে চাকমা উপজাতীয় বস্তিতে আশ্রয় গ্রহণ করে। পাকিস্তান সেনাবাহিনী নিয়ন্ত্রণ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার পর তাদেরকে ফের রাঙ্গামাটিতে ফিরিয়ে আনা হয়। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, বিদ্রোহীরা রাতের অন্ধকারে ট্রাক বোঝাই লাশ কর্ণফুলি নদীতে নিক্ষেপ করতো। বহু লাশ বঙ্গোপসাগরে ভেসে যায়। বিদেশি জাহাজের ক্রু ও যাত্রীরা সাগরে ভাসমান অসংখ্য লাশ দেখেছে।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

পঞ্চম অধ্যায়

খুলনায় হত্যাকাণ্ড ও অগ্নিসংযোগ

খুলনা ছিল পূর্ব পাকিস্তানে পাটের ব্যবসা ও পাট শিল্পের কেন্দ্রবিন্দু। ১৯৭১ সালে মার্চের প্রথম সপ্তাহে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে বিদ্রোহে এখানে চরম বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য ছড়িয়ে পড়ে। ৪ মার্চ আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে একদল দাঙ্গাবাজ স্থানীয় টেলিফোন এক্সচেঞ্জ আক্রমণ করে, যন্ত্রপাতির ক্ষতিসাধন করে এবং কয়েকজন কর্মচারীকে হত্যা করে। নিহতদের বেশির ভাগ ছিল অবাঙালি। পরদিন একটি বিশাল জনতা রাইফেল, শিকল, বর্শা ও ছোরা নিয়ে চারটি দোকান লুট করে এবং শহরের প্রাণকেন্দ্রে একটি হোটেলে অগ্নিসংযোগ করে। আরেকদল জনতা বিস্ফোরক, বন্দুক, বর্শা ও বাঁশের লাঠি নিয়ে খুলনার নিকটবর্তী দৌলতপুর ও খালিশপুরে অবাঙালিদের দোকানপাট এবং বাড়িঘরে হামলা চালায় এবং ৫৭ জনকে হত্যা করে। কয়েকদিন পর তাদের ক্ষতবিক্ষত লাশ উদ্ধার করা হয়।

৬ মার্চ বাঙালি জঙ্গিরা অবাঙালিদের ভীতি প্রদর্শনে খুলনায় একটি বিশাল মিছিল বের করে। কয়েকজন সশস্ত্র বিক্ষোভকারী অস্ত্র ও গোলাবারুদের দোকান লুট করার চেষ্টা করে। সংঘর্ষে কয়েকজন হতাহত হয়। শহরের বেসামরিক প্রশাসন ভেঙ্গে পড়ে। পুলিশ বাহিনী নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। আওয়ামী লীগের জঙ্গি সমর্থকরা অবাঙালি এবং পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে ব্যাপক বিদ্বেষ ছড়াতে থাকে। প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মকর্তাদের ভীতি প্রদর্শন করা হয়।

মার্চের দ্বিতীয় সপ্তাহে খুলনায় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে বিদ্রোহ তুঙ্গে পৌঁছে। হত্যা ও ভীতি প্রদর্শন করার জন্য অবাঙালিদের চিহ্নিত করা হয়। এ মাসের তৃতীয় সপ্তাহে আওয়ামী লীগের সহিংসতা ও সন্ত্রাসের কাছে খুলনা ও তার আশপাশের শহরগুলো জিম্মি হয়ে যায়। বিদ্রোহীরা যশোর-খুলনা সড়কের কয়েকটি জায়গা অবরোধ করে এবং ব্যারিকেড দেয়। খুলনায় ৫ মার্চের হত্যাযজ্ঞ থেকে জীবিত অবাঙালিরা নতুন করে হামলার শিকার হয়। আওয়ামী লীগের জঙ্গি কর্মী ও ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলসের বিদ্রোহীরা অবাঙালিদের ওপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করে।

২৩ মার্চ আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে একদল বিদ্রোহী এ শহর এবং তার আশপাশের এলাকায় অবাঙালি বসতিতে সর্বাত্মক হামলা করে এবং কমপক্ষে ৫ হাজার নির্দোষ মানুষকে হত্যা করে। পাকিস্তান সেনাবাহিনী এগিয়ে আসা নাগাদ মার্চের তৃতীয় সপ্তাহের পুরো সময়ে বাঙালি বিদ্রোহীরা অবাঙালিদের রক্তপাত ঘটায়। তারা কয়েকটি জঘন্য কসাইখানা স্থাপন করে। এসব কসাইখানায় অবাঙালি মহিলা ও শিশুদের নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। বিদ্রোহীরা খুলনা ও তার আশপাশের নদীগুলোতে বহু লাশ ভাসিয়ে দেয়। গুলি করে হত্যা করার আগে অবাঙালি ও পাকিস্তানপন্থী বাঙালিদের নির্যতন করা হতো।

www.pathagar.com

প্রত্যক্ষদর্শীরা গলা কাটা ও পেট ফাড়া বহু লাশ নদীতে ভাসতে দেখেছেন। বিদ্রোহীরা খুলনা ও খুলনার উপকণ্ঠে বহু জুট মিল ও শিল্প-কারখানা লুট ও ভাঙচুর করে। বিদ্রোহীরা অবাঙালি শ্রমিকদের উত্তপ্ত বয়লারে ফেলে জীবন্ত হত্যা করে। খালিশপুর ও দৌলতপুরে অবাঙালি পল্লীতে বর্বরতার সঙ্গে নির্দোষ অবাঙালিদের হত্যা করা হয়। তাদের ঘরবাড়ি ও বস্তি জ্বালিয়ে দেয়া হয়। মার্চের শেষ সপ্তাহে ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস, পুলিশ, স্বেচ্ছাসেবী আনসার এবং আওয়ামী লীগের সশস্ত্র জঙ্গিরা অবাঙালিদের বিরুদ্ধে ভয়াবহ গণহত্যা পরিচালনা করে।

মার্চের দ্বিতীয় সপ্তাহে আওয়ামী লীগ খুলনায় আধা-সামরিক প্রশিক্ষণ শিবির স্থাপন করে। এসব প্রশিক্ষণ শিবিরে দলের স্বেচ্ছাসেবকদের অস্ত্র চালনা শিক্ষা দেয়া হতো। খুলনা শহরের শিল্প ও বাণিজ্যিক এলাকায় বহু পশ্চিম পাকিস্তানি ব্যবসায়ী, মিল-কারখানার নির্বাহী এবং তাদের পরিবারবর্গকে অপহরণ করা হয়। মুক্তিপণ আদায়ে তাদের আটক রাখা হয়। আত্মীয়-স্বজনরা মুক্তিপণ পরিশোধ করা সত্ত্বেও তাদের অনেককে হত্যা করা হয়।

যেসব বাঙালি তাদের অবাঙালি বন্ধুদের আশ্রয় দিয়েছিল, বিদ্রোহীরা তাদেরকেও হত্যা করে। ১৯৭১ সালে মার্চের গণহত্যা থেকে বেঁচে যাওয়া লোকজন জানিয়েছে, পাকিস্তান সেনাবাহিনী নিজেদের নিয়ন্ত্রণ পুনঃপ্রতিষ্ঠার একদিন আগে ২৯ মার্চ খুলনাকে আণবিক বোমায় বিধ্বস্ত একটি শহরের মতো মনে হচ্ছিল। ১৯৭১ সালের মার্চে আওয়ামী লীগের বিদ্রোহের সময় খুলনা ও তার আশপাশের শহরগুলোতে কী পরিমাণ লোক নিহত হয়েছিল সে ব্যাপারে ভিন্ন ভিন্ন হিসেব পাওয়া যায়। ১৯৭১ সালের এপ্রিল-মে'তে খুলনা সফরকারী বিদেশি ও পাকিস্তানি সাংবাদিকদের সেনাবাহিনীর অফিসাররা জানিয়েছিলেন, আওয়ামী লীগ ও তাদের সমর্থকদের হাতে কমপক্ষে ৯ হাজার লোক নিহত হয়েছে। কিন্তু এ বইয়ের জন্য সাক্ষাৎকার প্রদানকারী প্রত্যক্ষদর্শীরা বিশ্বাস করছেন যে, ১৯৭১ সালের মার্চে অবাঙালি নিধনকালে খুলনায় প্রায় ৫০ হাজার অবাঙালি নিহত হয়। তারা জোর দিয়ে বলেছেন, খুলনা ও তার আশপাশের শহরগুলোতে হাজার হাজার অবাঙালিকে হত্যা করা ছাড়াও খুলনা জেলার অন্যান্য শহর থেকে পালিয়ে আসা শত শত অবাঙালি পরিবারকে শহরে বিদ্রোহী নিয়ন্ত্রিত প্রবেশ পথগুলোতে হত্যা করা হয়।

খুলনার প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, ১৯৭১ সালের ২৮ মার্চ পিপলস্ জুট মিল এবং ক্রিসেন্ট জুট মিলে সশস্ত্র বাঙালিদের হামলায় মহিলা ও শিশুসহ ৫ হাজারের বেশি অবাঙালি নিহত হয়। খুলনা রেলওয়ে কলোনিতে হত্যাযজ্ঞে বাঙালি বিদ্রোহীরা এ কলোনির ৬ হাজার বাসিন্দার অধিকাংশকে হত্যা করে। বিদ্রোহীরা শত শত অবাঙালি যুবতী মহিলাকে পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলোতে প্যারেড করায়। এসব গ্রামে সুরক্ষিত ঘরবাড়িতে যুবতী মহিলাদের নির্যাতন ও ধর্ষণ করা হয়। অপহরণকারীরা তাদের অনেককে হত্যা করে। তাদের কেউ কেউ বরিশাল পালাতে সক্ষম হয়। তাদেরকে পাকিস্তান সেনাবাহিনী উদ্ধার করে ঢাকা নিয়ে আসে এবং মোহাম্মদপুর ও মিরপুরে ত্রাণ শিবিরে স্থানান্তর করে।

> নিউইয়র্ক টাইমসের ঢাকা সংবাদদাতা ম্যালকম ব্রাউন মে মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ব পাকিস্তান সফর করেন। ১৯৭১ সালের ৯ মে তার প্রেরিত একটি সংবাদে নিউইয়র্ক টাইমসে বলা হয়:

www.pathagar.com

'খুলনায় সাংবাদিকদের কয়েকটি ভবন দেখানো হয়। এসব ভবনে বন্দিদের শিরশ্ছেদ করার জন্য কাষ্ঠ দণ্ড ছিল বলে জানা গেছে। মহিলাদের রক্তমাখা কাপড়-চোপড়ের ছিন্ন ভিন্ন অংশ ও কেশ গুচ্ছ ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকতে দেখা গেছে। এ জায়গাটি হাজার হাজার অবাঙালি বাসিন্দাকে হত্যা করার জন্য বাঙালি বিদ্রোহীরা ব্যবহার করেছিল বলে জানা গেছে।...

১৯৭১ সালে ৯ মে ওয়াশিংটনের সানডে স্টার-এর একটি রিপোর্টে খুলনায় অবাঙালি হত্যাকাণ্ডের আরো একটি ভয়াবহ বিবরণ প্রকাশিত হয়। তাতে বলা হয়:

'গতকাল খুলনায় সেনাবাহিনী নিয়ন্ত্রিত একটি সফরে সাংবাদিকরা চালা ঘরে একটি কসাইখানা দেখেছেন। মার্চ এবং এপ্রিলের গোড়ার দিকে বিচ্ছিন্নতাবাদী বিদ্রোহের চূড়ান্ত দিনগুলোতে পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালিরা ভারতের বিহার থেকে অভিবাসনকারী বিহারী, পশ্চিম পাকিস্তানি এবং অন্যান্য অবাঙালিকে হত্যা করার জন্য এসব চালা ঘর ব্যবহার করেছে বলে জানা গেছে।...

'সাংবাদিকদের শিকল সংযুক্ত একটি কাঠের দণ্ড দেখানো হয়। এখানে ছোরা দিয়ে মহিলা ও শিশুদের শিরশ্ছেদ করার খবর পাওয়া গেছে।...

'একটি গাছের সঙ্গে সংযুক্ত একটি পিতলের গলাবন্ধ দেখা গেছে। বাসিন্দারা জানিয়েছে, এ গলাবন্ধে ফাঁস লাগিয়ে বন্দিদের হত্যা করা হয়েছে। আরেকটি গাছে দড়ি লাগানো দেখা গেছে। গলায় ফাঁস দেয়ার জন্য এ দড়ি ব্যবহার করা হয়েছে বলে জানা গেছে। লাশগুলো নিচু দেয়ালের ওপাশ দিয়ে প্রবাহিত নদীতে ভাসিয়ে দেয়া হয়েছে।...

'খুলনায় অবাঙালি এলাকায় সারি সারি ভস্মীভূত ঘরবাড়ি ও দোকানপাট দেখা গেছে। দৃশ্যত বাঙালিরা এসব বাড়ি ও দোকান ভস্মীভূত করেছে।...'

প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ থেকে দেখা গেছে যে, পাকিস্তান সেনাবাহিনী খুলনা ও তার আশপাশের শহরগুলো থেকে বিদ্রোহীদের বিতাড়িত করার পর তারা সরাসরি ভারতের দিকে এগিয়ে যায়। সেখানে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ তাদেরকে বীরের সম্মান এবং নিরাপদ আশ্রয় দেয়। খুলনায় অবাঙালিদের ওপর হামলাকারীদের অনেকেই ছিল বাঙালি হিন্দু। এসব বাঙালি হিন্দু অবাঙালি বিশেষ করে ভারতের বিহার থেকে অভিবাসনকারী অবাঙালিদের প্রতি তীব্র ঘৃণা পোষণ করতো। কট্টরপন্থী আওয়ামী লীগারদের ভয়ে খুলনার অধিকাংশ লোক এত আতঙ্কিত ছিল যে, তাদের ভয়ে কেউ অবাঙালিদের বিরুদ্ধে সহিংসতার প্রতিবাদ জানানোর সাহস পায়নি।

(৬৭) **সাতষট্টিতম সাক্ষীর বিবরণ:** ৩৭ বছরের নিসার আহমেদ খান খুলনার খালিশপুর শিল্প এলাকায় একটি হাইস্কুলে প্রধান শিক্ষক হিসেবে চাকরি করতেন। ১৯৭১ সালে ডিসেম্বরের শেষদিকে খুলনায় অবাঙালিদের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় দফা সহিংসতা শুরু হলে ১৯৭২ সালে তিনি নেপালে পালিয়ে যান। ১৯৭৩ সালের এপ্রিলে তিনি কাঠমন্ডু থেকে পাকিস্তানে আসেন এবং করাচিতে বসতি স্থাপন করেন। ১৯৭১ সালের মার্চে আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসের রাজত্ব সম্পর্কে তিনি তার সাক্ষ্যে বলেছেন:

'২৩ মার্চ আওয়ামী লীগের সশস্ত্র স্বেচ্ছাসেবক, ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস ও পুলিশ খালিশপুরে পাকিস্তানি পতাকা অপবিত্র করে শহরের সকল ভবন ও কলকারখানার শীর্ষে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করে। মার্চের মাঝামাঝি থেকে বাঙালি বিদ্রোহীরা

www.pathagar.com

অবাঙালিদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ছড়াতে থাকে এবং আমাদের হত্যা করার প্রস্তুতি নেয়া হচ্ছে বলে গুজব উঠে।...

'আমি খালিশপুর এলাকায় স্যাটেলাইট টাউনের জি-১০ নম্বর সেক্টরে একটি ভাড়া করা বাসায় বসবাস করতাম। আমার স্কুল ছিল পিপলস্ জুট মিলের কাছাকাছি। এ জুট মিলের কাছে প্রায় ১৫ হাজার অবাঙালি বসবাস করতো। তাদের অনেকেই বসবাস করতো বস্তিতে। মার্চের প্রথম সপ্তাহে আওয়ামী লীগের স্থানীয় নেতৃবৃন্দ অবাঙালিদের আশ্বস্ত করেন যে, তাদেরকে কোনো প্রকার উত্যক্ত অথবা ক্ষতি করা হবে না। আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ ও কয়েকজন বাঙালি পুলিশ কর্মকর্তা এলাকার প্রধান মসজিদে অবাঙালি প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হয়ে এ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। অবাঙালি ইমামের উপস্থিতিতে তারা শপথ গ্রহণ করেন যে, কোনো অবাঙালির কোনো ধরনের ক্ষতি করা হবে না। তাদের এ আশ্বাস যে কোনো প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ কিংবা নিরাপত্তার জন্য ঢাকায় এগিয়ে যাওয়া থেকে অবাঙালিদের বিরত রাখে।...

'২৩ মার্চ রাতে এবং পরদিন বাঙালি বিদ্রোহীরা এই এলাকায় অবাঙালিদের বিরুদ্ধে হামলায় লিপ্ত হয়। বিদ্রোহীরা সকল প্রবেশ পথ অবরোধ এবং অবাঙালিদের পালিয়ে যাবার পথ বন্ধ করে দেয়। রাইফেল, স্টেনগান, হ্যান্ডগ্রেনেড, ছোরা ও বলম সজ্জিত হয়ে একটি বিশাল উন্মত্ত জনতা অরক্ষিত অবাঙালি পুরুষ, মহিলা ও শিশুদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। বিদ্রোহীরা গোটা এলাকা জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেয়। তারা অবাঙালিদের বাড়িঘর লুট করে এবং বাসিন্দারা পালিয়ে যাবার চেষ্টা করলে তাদেরকে গুলি করে হত্যা করে। বহু মহিলা ও শিশু প্রধান মসজিদ এবং আমার স্কুলে আশ্রয় নেয়। আল্লাহর ওয়াস্তে নির্দোষ মানুষকে হত্যা না করার জন্য অনুরোধ জানালে বিদ্রোহীরা মসজিদের ইমামকে হত্যা করে। বিদ্রোহীদের কাছে ক্ষমা বলতে কোনো জিনিস ছিল না। এ শব্দটি তারা ভুলে গিয়েছিল।...

'বাঙালি বিদ্রোহীরা মেয়ে ও যুবতী মহিলাদের অপহরণ করে। এসব অপহৃত মেয়ে ও যুবতী মহিলারা স্কুল ভবনে আশ্রয় নেয়। বিদ্রোহীরা রাতে তাদের ধর্ষণ করতো। বাধাদানকারীদের তৎক্ষণাৎ গুলি করে হত্যা করা হতো। সম্ভ্রম রক্ষায় কয়েকজন মহিলা যৌন নির্যাতন চেম্বারের ভবনের ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ে।...

বিদ্রোহীরা কয়েকজন বৃদ্ধ পুরুষ, মহিলা ও শিশুকে হাঁটিয়ে নদীর তীরে মনুষ্য কসাইখানায় নিয়ে যায়। সেখানে তাদের হত্যা করে লাশ নদীতে ভাসিয়ে দেয়া হয়। বিদ্রোহীরা শহর থেকে বহু লাশ ট্রাকে করে নদীর তীরে নিয়ে যায়। সেখান থেকে লাশগুলো পানিতে ফেলে দেয়া হয়।...

'আমার স্কুলের কাছে ছিল আমার প্রিয় বন্ধু সগীর আহমেদ খানের বাড়ি। সশস্ত্র ব্যক্তিরা তার বাড়িতে প্রবেশ করে প্রত্যেককে গুলি করে হত্যা করে। তার বাড়ি লুট এবং আংশিকভাবে ভস্মীভূত করা হয়।...

'২৪ মার্চ হত্যাযজ্ঞের দিন আমি আমার স্কুলে যেতে পারিনি। পরদিন একজন বাঙালি কর্মচারী স্যাটেলাইট টাউনে আমার বাড়িতে আসে এবং আমার কাছে লোমহর্ষক হত্যাকাণ্ডের বিবরণ প্রকাশ করে। সে আমাকে জানায় যে, স্কুল ভবনে যুবতী মহিলাসহ শত শত মানুষের লাশ স্তূপ দিয়ে রাখা হয়েছে।...

'৩০ মার্চ পাকিস্তান সেনাবাহিনী খুলনায় প্রবেশ করলে বিদ্রোহীরা পিছু হটে। এই ফাঁকে আমি আমার স্কুলে যাই। সেখানে গিয়ে যে দৃশ্য দেখেছি তা ছিল ভয়াবহ। শত শত রক্তাক্ত ও ক্ষতবিক্ষত লাশের স্তূপ। লাশের পচা দুর্গন্ধ। লাশ কবর দিতে, রক্তের দাগ মুছতে এবং দুর্গন্ধ দূর করতে আমার পুরো এক মাস লেগেছিল।...'

www.pathagar.com

(৬৮) **আটষট্টিতম সাক্ষীর বিবরণ:** ২৯ বছরের মাহবুব আলম খুলনায় পিপলস্ জুট মিলে সিনিয়র একাউন্টস ক্লার্ক হিসেবে চাকরি করতেন। মাহবুব অবাঙালি হত্যাকাণ্ডের সময় একজন বিশ্বস্ত বাঙালি বন্ধুর বাড়িতে আশ্রয় নেন। তার বহু আত্মীয়-স্বজনকে হত্যা করা হয়। ১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে তিনি করাচিতে প্রত্যাবাসন করেন। মাহবুব আলম তার সাক্ষ্যে বলেছেন:

> 'আমি খুলনার খালিশপুরে ওল্ড কলোনিতে একটি ভাড়া বাড়িতে বসবাস করতাম। খুলনা জেলার প্রায় অর্ধেক অবাঙালি খালিশপুরে কেন্দ্রীভূত ছিল এবং তাদের অনেকেরই ছিল চমৎকার বাড়ি। আমাদের কলোনি থেকে বাঙালি শ্রমিকদের বসতি খুব দূরে ছিল না। এসব বাঙালি শ্রমিক পিপলস্ জুট মিলে চাকরি করতো। আওয়ামী লীগাররা এসব বাঙালি শ্রমিককে অবাঙালিদের বিরুদ্ধে উসকানি দিচ্ছিল।...
> '১৯৭১ সালের ২৩-২৪ মার্চ প্রায় ৫ হাজার সশস্ত্র বাঙালি বিদ্রোহী অবাঙালিদের বাড়িঘর আক্রমণ করে এবং হাজার হাজার অবাঙালি নর-নারী ও শিশুকে হত্যা করে।...
>
> 'বিদ্রোহীরা আমাদের এলাকায় একটি কসাইখানা স্থাপন করে। এ কসাইখানায় হত্যা করার আগে বহু স্বচ্ছল অবাঙালিকে নির্যাতন করা হতো। অবস্থাপন্ন ঘরের মহিলাদের বন্দুকের মুখে তাদের লুকানো অলঙ্কার ও নগদ অর্থের খোঁজ দিতে বাধ্য করা হয়। এসব মহিলার চোখের সামনে তাদের প্রিয়জনদের হত্যা করা হয়।...'

(৬৯) **উনসত্তরতম সাক্ষীর বিবরণ:** ৩০ বছরের আনসার আহমেদ ছিলেন খুলনার খালিশপুরে স্যাটেলাইট টাউনে একটি দর্জি দোকানের মালিক। তিনি তার সাক্ষ্যে বলেছেন:

> '২৩ মার্চ আওয়ামী লীগের একদল সশস্ত্র সমর্থক ও ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলসের বিদ্রোহী সৈন্যরা আমাদের এলাকায় অবাঙালি বসতিতে আক্রমণ চালায়। তারা প্রায় ২৪ ঘণ্টা রক্তপাত ঘটায়। আক্রমণকারীরা বর্বরতার সঙ্গে নির্দোষ মানুষকে গুলি করে হত্যা করে। তাদের বাড়িঘর লুট এবং অগ্নিসংযোগ করে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে পুরো কলোনি একটি জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে পরিণত হয়। হত্যাকাণ্ডের হাত থেকে রেহাই পেতে অনেকে পালানোর চেষ্টা করে। কিন্তু বিদ্রোহীরা তাদের গুলি করে হত্যা করে। বিদ্রোহীরা অবাঙালিদের পালানোর সব রাস্তা বন্ধ করে দেয় এবং বন্দুকধারীরা লুকানো স্থান থেকে গুলিবর্ষণ করে। আমি, আমার স্ত্রী ও ছেলেমেয়েরা আমাদের বাড়ির ছাদে লুকিয়ে আত্মরক্ষা করি। ৩০ মার্চ পাকিস্তান সেনাবাহিনী খুলনায় নিয়ন্ত্রণ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা সত্ত্বেও অগণিত লাশ কবর দিতে অনেক দিন লেগে যায়।'

(৭০) **সত্তরতম সাক্ষীর বিবরণ:** ৩৪ বছরের এ. এস. সাইফুল্লাহ ১৯৭১ সালের মার্চে খুলনার খালিশপুরে ক্রিসেন্ট জুট মিলে অবাঙালি হত্যাযজ্ঞের একজন সাক্ষী। তিনি ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে মুক্তিবাহিনীর দ্বিতীয় দফা রক্তগঙ্গা বইয়ে দেয়ার হাত থেকে রক্ষা পান। অনেক চড়াই উৎড়াই পেরিয়ে ১৯৭২ সালের জানুয়ারিতে তিনি পাকিস্তানে ফিরে আসেন। সাইফুল্লাহ তার সাক্ষ্যে বলেছেন:

> '২৩ থেকে ২৯ মার্চের মধ্যে খালিশপুর এলাকায় ক্রিসেন্ট জুট মিলের অবাঙালি শ্রমিক, তাদের পরিবার-পরিজন এবং অন্যান্য অবাঙালি অধিবাসীদের বিরুদ্ধে হত্যাযজ্ঞ চালানো

www.pathagar.com

হয়। প্রথম দু'দিন আওয়ামী লীগের সশস্ত্র কর্মী, ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস ও পুলিশের বিদ্রোহী সদস্যরা অবাঙালিদের বিরুদ্ধে নির্বিচার হত্যাকাণ্ড চালায়। বাঙালি বিদ্রোহীরা বহু অবাঙালিকে অপহরণ করে। পরে এসব অপহৃত অবাঙালিকে কসাইখানায় নির্যাতন চালিয়ে হত্যা করা হয়। ক্রিসেন্ট জুট মিলের কম্পাউন্ডে তিন রুমের একটি ব্লক ছিল। বিদ্রোহীরা এ-ব্লককে কসাইখানায় পরিণত করে। শত শত অবাঙালি পুরুষ, মহিলা ও শিশুকে খাবার ও পানীয় ছাড়া এ কসাইখানায় দু'দিন আটক রাখা হয়। পরে তাদেরকে অকল্পনীয় নিষ্ঠুরতার সঙ্গে হত্যা করা হয়। পাকিস্তান সেনাবাহিনী খুলনায় নিয়ন্ত্রণ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার পর আমি এ কসাইখানা দেখেছি। মাটিচাপা দেয়ার জন্য লাশগুলো সরিয়ে নেয়া হয়। কিন্তু সর্বত্র ছিল রক্তের ছোপ ছোপ দাগ। একটি পাত্রে আমি মানুষের চোখের কর্নিয়া দেখেছি। যেসব হতভাগ্যের চোখ উপড়ে ফেলা হয়েছিল এসব কর্নিয়া ছিল তার প্রমাণ। আমি প্রায়ই ভাবি বিদ্রোহীরা চোখ তুলে নিয়ে কী ধরনের পৈশাচিক আনন্দ পেতো! ...'

(৭১) **একাত্তরতম সাক্ষীর বিবরণ:** ৫০ বছর বয়স্ক শাহজাহান খান খুলনার চান্দিমহলে স্টার জুট মিলে চাকরি করতেন। তিনি ১৯৭১ সালের মার্চে অবাঙালি হত্যাযজ্ঞ প্রত্যক্ষ করেছেন। শাহজাহান খান তার সাক্ষ্যে বলেছেন:

'১৯৭০ সালে আমি কলকাতা থেকে পূর্ব পাকিস্তানে অভিবাসন করি এবং খুলনায় বসতি স্থাপন করি। শুরুতেই আমি স্টার জুট মিলে যোগদান করি। আমি মিলের ওয়েভিং মাস্টার পদে পদোন্নতি লাভ করি। ২৮ মার্চ মেশিনগান, রাইফেল ও বর্শা সজ্জিত একদল লোক এ জুট মিলের অবাঙালি শ্রমিক এবং তাদের পরিবারের ওপর হামলা চালায়। আক্রমণকারীরা কয়েকজন অবাঙালি শ্রমিককে পর্যুদস্ত করে তাদেরকে মিলের উত্তপ্ত বয়লারে নিক্ষেপ করে। বহু অবাঙালি শ্রমিক পালানোর চেষ্টা করে। কিন্তু পলায়নের সময় তাদেরকে গুলি করে হত্যা করা হয়।...

'আমি মিল থেকে পালিয়ে আমার বাড়ির দিকে দৌড়াতে থাকি। একটি গুলি আমার বাহুতে বিদ্ধ হয়। গুলিবিদ্ধ হয়েও আমি আমার বাড়ির দিকে দৌড়ানো অব্যাহত রাখি। ঘরের দরজায় পৌঁছা মাত্র আরেকটি গুলি আমার পায়ে লাগে। পায়ে গুলি লাগায় আমি মাটিতে লুটিয়ে পড়ি। তার আগে আক্রমণকারীরা আমার বাড়ি তছনছ করে এবং আমার স্ত্রী ও তিন সন্তানকে হত্যা করে। আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলি। তিন দিন পর আমি নিজেকে খুলনা হাসপাতালে দেখতে পাই। পাকিস্তান সেনাবাহিনী শহরে প্রবেশ করে এবং আহতদের হাসপাতালে স্থানান্তর করে। আমাদের এলাকায় অবাঙালিদের মৃত্যুর সংখ্যা ছিল কয়েক হাজার। বাঙালি বিদ্রোহীরা শত শত অবাঙালি মেয়ে ও যুবতী মহিলাকে অপহরণ করে এবং ধর্ষণ করার পর নদীর তীরে তাদের হত্যা করে। নদীতে লাশ ভাসিয়ে দেয়া ছিল তাদের সাধারণ রীতি। ১৯৭৩ সালের নভেম্বরে আমি পাকিস্তানে প্রত্যাবাসন করি।'

(৭২) **বাহাত্তরতম সাক্ষীর বিবরণ:** ৬৯ বছর বয়স্ক শাকুর আহমেদ খুলনার খান জাহান আলী রোডে ছেলের বাসায় বসবাস করতেন। তার মতে, ১৯৭১ সালের মার্চে খুলনায় বাঙালি জনগোষ্ঠীর একটি বিরাট অংশকে উন্মত্ততা গ্রাস করেছিল। শাকুর আহমেদ তার সাক্ষ্যে বলেছেন:

www.pathagar.com

'বাঙালিদের অধিকাংশই অত্যন্ত ভদ্র। কট্টরপন্থী একটি সংখ্যালঘু অংশ বিপুলসংখ্যক বাঙালিকে বিভ্রান্ত করেছিল এবং বিহারীদের বিরুদ্ধে সহিংসতায় লিপ্ত হতে তাদের প্ররোচিত করে। আমি উপমহাদেশ বিভক্তির অনেক আগে থেকে পূর্ব পাকিস্তানে বসবাস করতাম। ভারতের মুঙ্গেরে আমার জন্ম। তবে আমার জীবনের অধিকাংশ সময় কেটেছে পূর্ব পাকিস্তানে। আমার ছেলের জন্ম খুলনায়। আমরা চমৎকার বাংলা বলতে পারতাম। কিন্তু স্থানীয় বাঙালিরা আমাদেরকে বিহারী বলতো।...

'১৯৭১ সালে মার্চের প্রথম সপ্তাহ থেকে আওয়ামী লীগের সশস্ত্র কর্মীরা অবাঙালিদের ভীতি প্রদর্শনে আমাদের এলাকায় কুচকাওয়াজ করতো। মার্চের দ্বিতীয় সপ্তাহে অবাঙালিদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে সহিংসতা শুরু হয়। ২৩ মার্চ একদল সশস্ত্র লোক আমাদের এলাকায় আক্রমণ চালায়। তারা আমার স্ত্রী ও একমাত্র ছেলেকে হত্যা করে। তারা আমাকে এবং আমার ছেলের দু'টি শিশু পুত্রকে রেহাই দেয়। আমার নাতিরাই এখন আমার জীবন, তারাই এখন আমার স্বপ্ন। ১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে আমরা করাচিতে প্রত্যাবাসন করি।...'

(৭৩) **তিয়াত্তরতম সাক্ষীর বিবরণ:** ৬০ বছরের বৃদ্ধ নবী বক্সের তিন পুত্রকে ১৯৭১ সালে মার্চের প্রথম সপ্তাহে খুলনার পাটিনাম জুবিলি মিলে বাঙালি বিদ্রোহীরা হত্যা করে। ১৯৭৩ সালের শরৎকালে তিনি পাকিস্তানে প্রত্যাবাসন করেন এবং করাচিতে বসতি স্থাপন করেন। নবী বক্স তার সাক্ষ্যে বলেছেন:

'আমি পাটিনাম জুবিলি জুট মিলে বিগত ১০ বছর ধরে চাকরি করতাম। আমার তিন পুত্র এ মিলে কাজ করতো। আমরা খুলনার খান জাহান আলী রোডে একটি ছোট বাড়িতে বসবাস করতাম।...

'২৪ মার্চ একদল বিদ্রোহী বাঙালি জুবিলি জুট মিলে অবাঙালি শ্রমিকদের ওপর হামলা চালায়। তারা আমার তিন ছেলেকে লক্ষ্য করে গুলিবর্ষণ শুরু করলে তাদের কয়েকজনের সঙ্গে আমার ধস্তাধস্তি বেধে যায়। হামলাকারীরা আমাকে কাবু করে ফেলে এবং আমার অসহায় চোখের সামনে আমার ছেলেদের গুলি করে হত্যা করে। আমার মাথায় গুলি লাগলে আমি অজ্ঞান হয়ে যাই। আক্রমণকারীরা বিদায় নেয়ার পর একজন বাঙালি শ্রমিক আমাকে টেনে হিঁচড়ে স্টোর রুমে নিয়ে যায়। সেখানে আমার ক্ষত স্থানে ব্যান্ডেজ করা হয়। বাঙালি বিদ্রোহীদের সন্ত্রাসের রাজত্ব থেকে সেনাবাহিনী খুলনাকে মুক্ত করা নাগাদ আমি সেখানেই অবস্থান করি।'

(৭৪) **চুয়াত্তরতম সাক্ষীর বিবরণ:** ২৮ বছরের রাবিয়া বেগমের স্বামী রুস্তম আলী খুলনায় কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারী হিসেবে চাকরি করতেন। রাবিয়ার মতে, বাঙালিদের মধ্যে বহু আল্লাহভীরু লোক ছিলেন। এসব বাঙালি দৃঢ়ভাবে অবাঙালি হত্যাকাণ্ডের নিন্দা করেছেন। কিন্তু তারা ছিলেন অসহায়। আওয়ামী লীগ ও বিদ্রোহীরা ছিল সশস্ত্র। অন্যদিকে হৃদয়বান বাঙালিরা ছিল নিরস্ত্র। রাবিয়া বেগম শুনতে পেয়েছিলেন যে, অবাঙালিদের হত্যা ও নির্যাতনের জন্য কসাইখানা স্থাপন করা হয়েছে। ১৯৭১ সালে তার বাড়ি লুট এবং তার স্বামীকে হত্যা করা হয়। সে ব্যাপারে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন:

'১৯৭১ সালে মার্চের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে অবাঙালিদের জীবন দুঃস্বপ্নে পরিণত হয়। প্রতিদিন আমরা গুজব শুনতাম যে, বাঙালি বিদ্রোহীরা আমাদের কলোনিতে হামলা চালিয়ে আমাদের সবাইকে হত্যা করবে।...

www.pathagar.com

'২৩ মার্চ সেই ভয়াবহ দিন এসে উপস্থিত হয়। সেদিন একদল সশস্ত্র বিদ্রোহী আমাদের কলোনি আক্রমণ করে। আমার স্বামী দর্শনায় একটি সরকারি কাজে অবস্থান করছিলেন। বাড়িতে আমি এবং আমার বৃদ্ধা শাশুড়ি ছিলাম একমাত্র বয়স্ক মানুষ। গুলির শব্দ শুনে আমি বাড়ির পেছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে যেতে এবং অন্য একটি এলাকায় আমাদের একজন বিশ্বস্ত বাঙালি মহিলার বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেই। আমি আমার শাশুড়িকে আমার সঙ্গে যেতে রাজি করানোর চেষ্টা করি। কিন্তু তিনি অস্বীকৃতি জানিয়ে বললেন, বৃদ্ধা হওয়ায় বিদ্রোহীরা তাকে রেহাই দেবে। আমি তাকে ফেলে আমার দু'সন্তান নিয়ে বাড়ি থেকে বের হয়ে যাই এবং নিরাপদে আমার গোপন আশ্রয়স্থলে পৌঁছি। সেনাবাহিনী খুলনায় প্রবেশ করার পর আমি আমার বাড়িতে ফিরে আসি। বাড়িতে ফিরে গিয়ে যে দৃশ্য দেখি তাতে আমি ভীষণ মর্মাহত হই। আমার বাড়ির অর্ধেকটা ভস্মীভূত। যাবতীয় মূল্যবান সামগ্রী লুণ্ঠিত। আমার শাশুড়ি প্রহৃত। বিদ্রোহীদের প্রহারে তিনি আহত। আমি তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাই। হাসপাতালে তার চিকিৎসা করা হয়। বাড়িতে কোনো অলঙ্কার না পেয়ে বিদ্রোহীরা রাগান্বিত হয়। আমাদের সম্পদের খোঁজ দিতে তারা আমার শাশুড়িকে প্রহার করে। আমাদের লুকানোর মতো কোনো সম্পদ ছিল না।...

'সেনাবাহিনী খুলনার নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করার পর আমি একটি চাকরি নেই। আমার উপার্জিত অর্থ দিয়ে আমি নিজে, আমার সন্তান ও আমার শাশুড়ির ভরণ-পোষণ করেছি। আমি আমার স্বামীর কোনো তথ্য পাচ্ছিলাম না। আমি জানতে পারি যে, বিদ্রোহীরা দর্শনায় তাকে হত্যা করেছে।...

'১৯৭১ সালে ডিসেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে মুক্তিবাহিনী খুলনা দখল করে নিলে নতুন করে আমার দুঃস্বপ্ন শুরু হয়। শহরে আবার শুরু হয় অবাঙালি হত্যাযজ্ঞ। ভাগ্যক্রমে আমরা হত্যাকাণ্ড থেকে বেঁচে যাই। ১৯৭৪ সালের জানুয়ারিতে আমরা ঢাকা থেকে করাচিতে প্রত্যাবাসন করি।'

ফুলতলা

(৭৫) **পঁচাত্তরতম সাক্ষীর বিবরণঃ** ৬৫ বছরের ফেরদৌস আলম খুলনার কাছাকাছি ফুলতলায় লিয়াকতাবাদ কলোনিতে বসবাস করতেন। তিনি ১৯৭৩ সালের ডিসেম্বরে করাচিতে প্রত্যাবাসন করেন। ১৯৭১ সালের মার্চে অবাঙালি হত্যাকাণ্ডের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তিনি বলেছেনঃ

'পাকিস্তানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান ছিলেন ফুলতলার লিয়াকতাবাদ কলোনির প্রতিষ্ঠাতা। ১৯৪৮ সালে বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের চার শত মুসলিম পরিবার পূর্ব পাকিস্তানে আশ্রয় প্রার্থনা করে। এসব পরিবারকে এ কলোনিতে আশ্রয় দেয়া হয়। সময়ের পরিক্রমায় এখানে আরো অবাঙালি পরিবার ভিড় জমায়। এ কলোনির লোকসংখ্যা ১৫ হাজারে পৌঁছে।...

'২৩ মার্চ আওয়ামী লীগের একটি বিরাট শোভাযাত্রা আমাদের এলাকা প্রদক্ষিণ করে এবং পাকিস্তান বিরোধী শ্লোগান দেয়। আওয়ামী লীগের উসকানি এবং তাদের পাকিস্তান বিরোধী শ্লোগানে প্ররোচিত না হওয়ার জন্য আমাদের প্রবীণরা তরুণদের পরামর্শ দেন। সন্ধ্যায় একদল কট্টর সশস্ত্র লোক নিয়ে আওয়ামী লীগ আমাদের

www.pathagar.com

এলাকায় আবার ফিরে আসে। সশস্ত্র লোকজন ছিল সম্ভবত ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলসের বিদ্রোহী সদস্য। আকস্মিকভাবে সশস্ত্র লোকজন অবাঙালি বস্তিতে অগ্নিসংযোগ করতে শুরু করে। বাঙালি বিদ্রোহীরা আগুনে নারকেলের শুকনো পাতা ছুঁড়ে দেয়। তাতে আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে। আতঙ্কিত অবাঙালিরা তাদের বাড়িঘর থেকে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করলে তাদেরকে গুলি করে হত্যা করা হয়।...

'এ বর্বরতায় প্ররোচিত হয়ে আমাদের একদল সশস্ত্র তরুণ বিদ্রোহীদের সঙ্গে চার ঘণ্টা বন্দুকযুদ্ধে লিপ্ত হয়। কিন্তু তাদের গোলাগুলি ফুরিয়ে যাবার সময় বাঙালি বিদ্রোহীদের শক্তিবৃদ্ধি পায় এবং তাদের কাছে রসদ এসে পৌঁছে। অবর্ণনীয় নিষ্ঠুরতায় আমাদের প্রতিরোধকারী তরুণদের হত্যা করা হয়। সারারাত এবং পরদিন সকাল পর্যন্ত বিদ্রোহীদের তাণ্ডব চলতে থাকে। বিদ্রোহীরা আমাদের এলাকায় একটি বিশাল ভবনে শত শত অবাঙালি মহিলাকে আটক রেখেছিল এবং হত্যা করার আগে তারা তাদেরকে ধর্ষণ করে। বিদ্রোহীরা আমার পরিবারের সদস্যদেরও হত্যা করে। আমি গুলিবিদ্ধ হয়ে মূর্ছা যাই। ২৪ ঘণ্টার নৃশংসতম হত্যাযজ্ঞের সময় ফুলতলার লিয়াকতাবাদ কলোনির কমপক্ষে অর্ধেক লোক নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

বাগেরহাট

(৭৬) **ছিয়াত্তরতম সাক্ষীর বিবরণ:** ৩৫ বছরের কাজী আনোয়ার হোসেন খুলনা জেলার বাগেরহাট শহরে ব্যবসা করতেন। তিনি একজন ধার্মিক বাঙালির সহায়তায় হত্যাযজ্ঞ থেকে রেহাই পান। এ বাঙালি তাকে আশ্রয় দিয়ে রক্ষা করেছিলেন। ১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে কাজী আনোয়ার হোসেন জাহাজে করে চট্টগ্রাম থেকে করাচিতে এসে পৌঁছান। তিনি ১৯৭১ সালের মার্চে অবাঙালি ও পাকিস্তানপন্থী বাঙালি হত্যাকাণ্ড প্রত্যক্ষ করেছেন। তিনি তার সাক্ষ্যে বলেছেন:

'১৯৭১ সালে মার্চের প্রথম সপ্তাহ থেকে আওয়ামী লীগ বাগেরহাটে উত্তেজনা ছড়াচ্ছিল। তারা পশ্চিম পাকিস্তানে বাঙালি হত্যাকাণ্ডের গুজব রটনা করছিল। তারা অবাঙালিদের বিরুদ্ধে সহিংসতায় লিপ্ত হতে বাঙালিদের উত্তেজিত করছিল।...

'অবাঙালিদের পাশাপাশি বাঙালি মুসলিম লীগ নেতা-কর্মীরাও ছিল আওয়ামী লীগের টার্গেট। ১৯৭০ সালে সাধারণ নির্বাচনের আগে বাগেরহাট মহকুমায় আওয়ামী লীগের তেমন কোনো প্রভাব ছিল না। কিন্তু ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বিজয়ী হয়ে বাগেরহাটে একটি শক্তিশালী ঘাঁটি প্রতিষ্ঠা করে। পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বাঙালিদের উত্তেজিত করা ছিল তাদের মূলমন্ত্র। ...

'২০ মার্চ আওয়ামী লীগের জঙ্গি সমর্থকদের নেতৃত্বে একদল দাঙ্গাবাজ জনতা বিখ্যাত বাঙালি মুসলিম লীগ নেতা মোহাম্মদ কাসিমের বাড়িতে হামলা চালায়। ভাগ্যক্রমে হামলার সময় তিনি বাড়িতে ছিলেন না। কিন্তু দাঙ্গাবাজরা তার বাড়ির যাবতীয় মূল্যবান সামগ্রী লুট করে এবং বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করে। পরবর্তীতে জনতা অবাঙালিদের ওপর হামলা চালায় এবং তাদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেয়। অনেককে হত্যা করা হয়। খোদাভীরু বাঙালিরা কয়েকজন অবাঙালিকে আশ্রয় দিয়ে রক্ষা করেছিলেন। বিদ্রোহীরা

www.pathagar.com

এসব দয়ালু বাঙালিকে শাস্তি দেয় এবং তারা যেসব আবাঙালিকে আশ্রয় দিয়েছিলেন তাদেরকে হত্যা করে। আমার হিসেবে সেই কালো দিনে বাগেরহাটে আনুমানিক ৫০০ নির্দোষ মানুষকে হত্যা করা হয়। নিহতদের বেশির ভাগ ছিল অবাঙালি এবং মুষ্টিমেয় ছিল বাঙালি।...

'অবাঙালিদের মধ্যে যারা জীবিত ছিল তাদের অনেকে আশ্রয়ের জন্য খুলনায় পালিয়ে যায়। কিন্তু রাস্তায় তাদের কয়েকজনকে বিদ্রোহীরা হত্যা করে।...'

www.pathagar.com

ষষ্ঠ অধ্যায়

সাতক্ষীরা ভস্মীভূত

যে সময় খুলনায় অবাঙালি হত্যাযজ্ঞের মহোৎসব চলছিল ঠিক তখন সাতক্ষীরায় অবাঙালিরা হত্যা, লুণ্ঠন ও অগ্নিসংযোগের শিকার হয়। হিসেব করে দেখা গেছে যে, ১৯৭১ সালে মার্চের প্রথমার্ধে এবং এপ্রিলের একপক্ষকালে সাতক্ষীরা শহর এবং এ মহকুমার অন্যান্য স্থানে দুই সহস্রাধিক অবাঙালি নিহত হয়। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, ভারত সীমান্তের কাছাকাছি হওয়ায় সাতক্ষীরায় বাঙালি বিদ্রোহীরা ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনী বিএসএফ'র কাছ থেকে উল্লেখযোগ্য সহায়তা পেয়েছে। বাঙালি বিদ্রোহীরা সাতক্ষীরার পশ্চিম পাকিস্তানি মহকুমা প্রশাসককে আটক করে এবং শহরের রাস্তায় টানা হ্যাঁচড়া করে।

(৭৭) **সাতাত্তরতম সাক্ষীর বিবরণঃ** ৩২ বছরের মাওলা বস্ত্র পাট ব্যবসায়ী হিসেবে কাজ করতেন এবং সাতক্ষীরার কাজীপাড়ায় বসবাস করতেন। তিনি তার নিজ শহরে যা দেখছেন সে ব্যাপারে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে বলেছেনঃ

> 'আমি সাতক্ষীরা শহরে ১০ বছরের বেশি বসবাস করেছি। আমি এত শুদ্ধভাবে বাংলা বলতে পারতাম যে, আমাকে মাঝে মধ্যে বাঙালি বলে ভুল করা হতো। ভারত সীমান্ত মাত্র কয়েক মাইল দূরে হওয়ায় সাতক্ষীরা বেশ কয়েক বছর ভারতীয় এজেন্টদের অপারেশনাল ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। ১৯৭১ সালের পহেলা মার্চ আওয়ামী লীগ ঢাকায় বিদ্রোহের সূচনা ঘটালে তাৎক্ষণিক তার রেশ সাতক্ষীরায়ও অনুভূত হয়। আওয়ামী লীগ সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করে এবং ভারত থেকে অস্ত্র ও গোলাবারুদ আমদানি করে। ভারতীয় আধা-সামরিক বাহিনীর সদস্যরা ছদ্মবেশে সাতক্ষীরায় অনুপ্রবেশ করে এবং সরকার বিরোধী তৎপরতায় আওয়ামী লীগকে দিকনির্দেশনা প্রদান করে।...
>
> 'বেসামরিক প্রশাসন ভেঙ্গে পড়ে। বাঙালি বিদ্রোহীরা বেশ কয়েকজন সরকারি কর্মকর্তাকে অপহরণ করে। তারা সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। পুলিশ এবং ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস-ও বিদ্রোহ করে। বিদ্রোহীরা সাতক্ষীরার সকল প্রবেশ পথের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে এবং ভীত সন্ত্রস্ত অবাঙালিদের পালানোর পথগুলো অবরোধ করে। মার্চের মাঝামাঝি ভারি অস্ত্রে সজ্জিত বাঙালি বিদ্রোহীরা অবাঙালিদের ভীতি প্রদর্শনে শক্তির মহড়া দেয়। অবাঙালি মালিকানাধীন কয়েকটি দোকান ও স্টোর লুট এবং অগ্নিসংযোগ করা হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে 'গুপ্তচরবৃত্তি'র অভিযোগে বেশ কয়েকজন পশ্চিম পাকিস্তানিকে 'গ্রেফতার' এবং রাইফেলের গুলিতে হত্যা করা হয়। ১৭ ও ১৮ মার্চ বিদ্রোহীরা উন্মত্ততায় লিপ্ত হয় এবং শত শত অবাঙালিকে হত্যা করে।...
>
> '১৮ মার্চ সকালে আমি নেতৃস্থানীয় অবাঙালি পাট ব্যবসায়ী আবদুল কাইয়ুমের পাটের

www.pathagar.com

গোডাউনে একটি ব্যবসায়িক চুক্তি করছিলাম। হঠাৎ করে একদল লোক পাটের গোডাউনে হামলা চালায় এবং আবদুল কাইয়ুম ও তার অবাঙালি স্টাফকে গুলি করে হত্যা করে। পাটের মজুদে আগুন দেয়। পাটের মজুদে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠলে বিদ্রোহীরা মৃতদেহগুলো আগুনে ভস্মীভূত করে। ভালো বাংলা বলতে পারায় আমি বিদ্রোহীদের বিশ্বাস উৎপাদনে সক্ষম হই যে, আমি একজন প্রকৃত বাঙালি। তারা আমাকে রেহাই দেয়। কিন্তু তারা আমাকে 'পশ্চিম পাকিস্তানি এজেন্ট' হিসেবে চিহ্নিত করে এবং অবাঙালিদের সঙ্গে ব্যবসা না করার জন্য হুঁশিয়ার করে দেয়।...

'আমি দ্রুত পায়ে আমার বাড়ির দিকে হাঁটতে থাকি এবং সাধ্যমতো চেষ্টা করি যাতে বিদ্রোহীরা আমাকে চিনতে না পারে। শহরের সর্বত্র ছিল বিদ্রোহীদের আনাগোনা। পথে আমি সাতক্ষীরার পশ্চিম পাকিস্তানি মহকুমা প্রশাসককে রাস্তায় টানা হ্যাঁচড়া করতে দেখি। তার হাঁটু ও কপাল থেকে রক্ত ঝরছিল। তার হাত ছিল দড়ি দিয়ে বাঁধা। কয়েকজন বাঙালি তার গায়ে থু-থু দেয় এবং তার প্রতি ইট, পাটকেল নিক্ষেপ করে। আমি একজন অবাঙালি মহিলাকে বেয়নেটের মুখে তাড়িয়ে নিয়ে যেতে দেখতে পাই। মহিলাকে তার দু'টি শিশু বাচ্চা জড়িয়ে ধরে রেখেছিল। সীমাহীন ক্লান্তিতে মহিলা মাটিতে শুয়ে পড়লে একজন বিদ্রোহী তার মাথায় বুট দিয়ে লাথি মারে। আরেকজন বিদ্রোহী বড় শিশুটির গলা টিপে ধরে।...

'আমি বাড়িতে পৌঁছে দেখি আমার বাড়ি আগুনে জ্বলছে। আমার ছোট ভাই তখন বাড়িতে ছিল। বিপদ দেখে সে পালিয়ে যায়। আমি একজন বিশ্বস্ত বাঙালি বন্ধুর বাড়িতে আশ্রয় নেই। ১৯৭১ সালের এপ্রিলে সেনাবাহিনী সাতক্ষীরায় নিয়ন্ত্রণ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার পর আমার ভাই আমার সঙ্গে যোগদান করে। আমরা ঢাকায় স্থানান্তরিত হই। ১৯৭৪ সালের জানুয়ারিতে আমি করাচিতে প্রত্যাবাসন করি।...

'বিদ্রোহীরা সাতক্ষীরায় বহু অবাঙালি যুবতী মহিলাকে অপহরণ করে। যারা বাধা দেয়ার চেষ্টা করে তাদের হত্যা করা হয়। পিছু হটার সময় বিদ্রোহীরা বাদবাকি যুবতী মহিলাদের ভারতে নিয়ে যায়। এসব যুবতী মহিলাকে পশ্চিমবঙ্গের পতিতালয়ে বিক্রি করা হয়।'

(৭৮) **আটাত্তরতম সাক্ষীর বিবরণ:** ২৬ বছরের নবাব আলী সাতক্ষীরার বড়বাজারে পিতার সঙ্গে বসবাস করতেন। তিনি পাটের ব্যবসা করতেন। ১৯৭৪ সালের জানুয়ারিতে নবাব আলী ঢাকা থেকে করাচিতে প্রত্যাবাসন করেন। ১৯৭১ সালের মার্চে অবাঙালি হত্যাযজ্ঞ সম্পর্কে তিনি তার সাক্ষ্যে বলেছেন:

'আমার পিতা দীর্ঘদিন কলকাতায় বসবাস করতেন। ১৯৪৭ সালে উপমহাদেশ বিভক্ত হওয়ার পর আমরা খুলনায় স্থানান্তরিত হই। খুলনায় আমার পিতার ব্যবসায় উন্নতি হচ্ছিল। আমরা অত্যন্ত ভালোভাবে বাংলা বলতে পারতাম। সাতক্ষীরায় পাটের ব্যবসায় লাভ ছিল আরো বেশি আকর্ষণীয়। তাই আমরা সাতক্ষীরায় বসতি স্থাপন করি। আমরা একটি বাড়ি এবং আরো কিছু জমি ক্রয় করি। আমি ব্যবসায় আমার পিতাকে সহায়তা করতাম।...

'১৯৭১ সালে মার্চের দ্বিতীয় সপ্তাহে বিচ্ছিন্ন ঘটনার মধ্য দিয়ে অবাঙালি হত্যাকাণ্ড শুরু হয়। ভারতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এজেন্টরা সাতক্ষীরায় অনুপ্রবেশ করায় ১৭ থেকে ২০ মার্চের মধ্যে অবাঙালিদের বিরুদ্ধে বাঙালিদের সহিংসতা গতি লাভ করে। বিদ্রোহীদের কাছে

www.pathagar.com

ছিল মেশিনগান, রাইফেল, হ্যান্ডগ্রেনেড এবং অফুরন্ত গোলাগুলি।...

'২০ মার্চ বিদ্রোহীরা গোটা শহরে সন্ত্রাস ও সহিংসতা ছড়িয়ে দেয়। তার আগে তারা নির্দিষ্ট কয়েকটি অবাঙালি বসতিতে সন্ত্রাস চালিয়েছিল। হত্যাযজ্ঞে আমার পিতামাতা নিহত হন। বিদ্রোহীরা আমার বাড়িতে হামলা চালানোর আগে আমি আত্মগোপন করি। আমি মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাই। বিদ্রোহীরা অকল্পনীয় বর্বরতার পরিচয় দেয়। তারা গুলি করে হত্যা করার আগে অবাঙালি পুরুষদের ওপর নির্মম নির্যাতন চালায়। বিদ্রোহীরা মহিলাদের শরীর টুকরো টুকরো করে এবং তাদের কপালে 'জয় বাংলা' লিখে দেয়। তারা শত শত শিশুকে হত্যা করে মৃতদেহ জ্বলন্ত আগুন কিংবা নিকটবর্তী নদীতে নিক্ষেপ করে। বিদ্রোহীরা অসংখ্য মেয়েকে অপহরণ করে এবং পরিত্যক্ত স্কুল ভবনে গণধর্ষণ করে। স্কুল ভবনগুলোকে যৌন ক্ষুধার্ত বিদ্রোহীরা 'আনন্দ বিহার'-এ রূপান্তরিত করে। পশ্চাদপসরণকারী বিদ্রোহীরা বন্দি মেয়েদের ভারতে নিয়ে যায়। যারা পালানোর চেষ্টা করে তাদেরকে গুলি করে হত্যা করা হয়।'

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সপ্তম অধ্যায়

দিনাজপুরে নারকীয় তাণ্ডব

১৯৭১ সালে মার্চের প্রথম সপ্তাহ থেকে দিনাজপুরে আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসীরা বেপরোয়া হয়ে উঠে। আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের উসকানিমূলক ভাষণে বাঙালিদের উত্তেজনা তুঙ্গে পৌঁছে। প্রতিবাদ বিক্ষোভ, সহিংসতা এবং অবাঙালিদের ভয়ভীতি প্রদর্শনে তাদের এ উন্মত্ততার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। আওয়ামী লীগের জঙ্গিরা স্থানীয় প্রশাসন অচল করে দেয় এবং তারা ভয়ভীতি প্রদর্শনের রাজত্ব কায়েম করে।

মার্চের দ্বিতীয় সপ্তাহে ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলসের বিদ্রোহ এবং বেসামরিক প্রশাসন অচল করে দেয়ার সাফল্য আওয়ামী লীগকে আরো দুঃসাহসী করে তোলে। তাতে সহিংসতার তীব্রতা বৃদ্ধি পায়। এসময় অবাঙালিদের ওপর দুর্যোগ নেমে আসে। মার্চের দ্বিতীয় পক্ষকালে এবং এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে দানবীয় শক্তিতে অবাঙালি জনগোষ্ঠীকে উৎখাত করার অভিযান পরিচালনা করা হয়। দিনাজপুর শহরে আওয়ামী লীগের এক মাসের সন্ত্রাসে অবাঙালিদের মৃত্যুর সংখ্যা ছিল ১৫ থেকে ৩০ হাজার। অন্যদিকে গোটা দিনাজপুর জেলায় অবাঙালিদের মৃত্যুর সংখ্যা ছিল এক লাখ। কাঞ্চন নদীর তীরে উন্মুক্ত কসাইখানায় হাজার হাজার অবাঙালিকে হত্যা করা হয়। বসত বাড়ির লোকজনকে হত্যা করার পর বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেয়া হয়। জ্বলন্ত বাড়িঘরে লাশগুলো পুড়িয়ে ফেলা হয়। প্রত্যক্ষদর্শীরা দাবি করছেন যে, কাঞ্চন নদীতে অসংখ্য লাশ ভাসিয়ে দেয়ায় এবং জ্বলন্ত আগুনে পুড়িয়ে ফেলায় নিহতদের সংখ্যা নিয়ে বিভ্রান্তি দেখা দেয়।

২২ মার্চ স্টেনগান ও রাইফেল উঁচিয়ে আওয়ামী লীগ শহরের কেন্দ্রস্থলে একটি জঙ্গি মিছিলের নেতৃত্ব দেয়। মিছিল থেকে অবাঙালিদের উৎখাতে বাঙালিদের উসকানি দেয়া হয়। ২৫ মার্চ উন্মত্ত জনতা দিনাজপুরের উপকণ্ঠে অবাঙালি মালিকানাধীন একটি বাসে অগ্নিসংযোগ করে। বাসের চালক এবং সাত জন অবাঙালি যাত্রীকে হত্যা করা হয়। একইদিন বাঙালি বিদ্রোহীরা দিনাজপুর-সৈয়দপুর সড়কে পোস্টাল সার্ভিসের একটি ভ্যান ভস্মীভূত করে। ভ্যানের কন্ডাক্টরকে গুলি করে হত্যা এবং চালককে আহত করা হয়। তারা পাকিস্তান সেনাবাহিনীর একটি জীপে হামলা চালায় এবং জীপের আরোহী পাঁচ জন সৈন্যকে আহত করে। হাজার হাজার অবাঙালি মহিলা ও শিশুর সঙ্গে পৈশাচিক ও হীন আচরণ করা হয়। পিছু হটা বিদ্রোহীরা চার শ'র বেশি অবাঙালি যুবতী মহিলাকে ভারতে অপহরণ করে নিয়ে যায়।

১৯৭১ সালে মার্চের শেষ সপ্তাহে অবাঙালিদের বিরুদ্ধে সহিংসতা চূড়ান্ত পর্যায়ে উন্নীত হয়। অবাঙালি মালিকানাধীন সকল স্টোর, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও বাড়িঘর ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের মধ্য দিয়ে সহিংসতার বিস্তার ঘটে। ক্ষুব্ধ, উন্মত্ত ও ক্রুদ্ধ জনতার মিছিল

www.pathagar.com

কখনো কখনো ১০ হাজারে পৌঁছতো। জনতা গোটা শহরে মিছিল ও সমাবেশ করতো। এসব সমাবেশে অবাঙালিদের হত্যা এবং ধ্বংসের জন্য শপথ গ্রহণ করা হয়। কেন্দ্রীয় সরকারকে অচল করে দেয়ার ঘোষণা দেয়া হয়। মার্চের শেষ সপ্তাহে প্রতি রাতে বিদ্রোহী সৈন্য ও সশস্ত্র বাঙালিদের নিক্ষিপ্ত গুলির আওয়াজ, দোকানের দরজা ও জানালা ভাঙ্গার শব্দ, শ্লোগানের বজ্রধ্বনি এবং লুটপাটের শোরগোল শোনা যেতো। অবাঙালিদের বাড়িঘরে আগুনের লেলিহান শিখা জ্বলতে দেখা যেতো। আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ তাদের জ্বালাময়ী ভাষণে অবাঙালিদের বিরুদ্ধে ঘৃণা ছড়াতেন এবং তাদের ঘরবাড়ি ও দোকানপাট লুট এবং অগ্নিসংযোগকে বাঙালি দেশপ্রেমের পরিচয় বলে ঘোষণা করতেন। নদী তীরবর্তী কসাইখানাগুলোতে নিষ্ঠুর পৈশাচিকতা প্রদর্শন করা হতো। ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস ও ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের বিদ্রোহী সৈন্যরা অবাঙালি নিধনে স্থাপিত কসাইখানাগুলোতে নিয়োজিত জলাদ ও রক্তপিপাসু দানবদের তত্ত্বাবধান করতো।

দিনাজপুরে এক মাসে অবাঙালিদের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগ পরিচালিত সন্ত্রাসে এত লোক নিহত হয়েছিল যে, পাকিস্তান সেনাবাহিনী এ শহরে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার পর সেখানে জীবিতদের মধ্যে ছিল মাত্র কয়েকজন বৃদ্ধা মহিলা ও শিশু। অবাঙালিদের সমুচিত শিক্ষা দানে গাছের ডগায় বহু লোকের মাথা টানিয়ে রাখা হয়েছিল।

(৭৯) **উনাশিতম সাক্ষীর বিবরণঃ** ২৪ বছরের নূর জাহানের স্বামী আবদুর রশীদ দিনাজপুরে অবাঙালি হত্যাকাণ্ডের সময় নিহত হয়। ১৯৭১ সালের মাঝামাঝি তাকে ঢাকায় স্থানান্তর করা হয়। ১৯৭৪ সালের জানুয়ারিতে তিনি করাচিতে প্রত্যাবাসন করেন। স্বামী হত্যাকাণ্ডের বর্ণনা দেয়ার সময় নূর জাহানের কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসছিল। তিনি তার সাক্ষ্যে বলেছেনঃ

> 'আমরা দিনাজপুর শহরে সুফি সাধক শেরগাজীর মাজারের পাশে জুলুম কলোনিতে বসবাস করতাম। মার্চের মাঝামাঝি থেকে আমরা গুজব শুনতে পাচ্ছিলাম যে, বাঙালি বিদ্রোহীরা অবাঙালিদের হত্যা করবে এবং আওয়ামী লীগের স্বেচ্ছাসেবকরা অবাঙালিদের বাড়িঘর চিহ্নিত করেছে।...
>
> '১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাত ৯টায় একদল সশস্ত্র বাঙালি আমাদের এলাকায় হামলা চালায় এবং শত শত পুরুষ, মহিলা ও শিশুকে হত্যা করে। তারা আমাদের বাড়িতে হামলা চালিয়ে আমার স্বামী ও ভাইকে হত্যা করে। আমার যতদূর মনে পড়ে, তারা আমাদের এলাকায় একজন অবাঙালি পুরুষকেও রেহাই দেয়নি। এমনকি তারা ছেলে-শিশুদেরও নিশ্চিহ্ন করে দেয়। তারা ক্রন্দনরত অবাঙালি মহিলাদের সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করায় এবং বন্দুকের মুখে তাদেরকে হাঁটিয়ে দিনাজপুর থেকে ৮ মাইল দূরে ভারত সীমান্তের কাছে বারাউল গ্রামে যেতে বাধ্য করে। আমি ছিলাম এসব হতভাগ্য মহিলার একজন। আমাদের অপহরণকারীরা আমাদের সঙ্গে যে আচরণ করেছে এবং আমাদের ওপর যে পাশবিক নির্যাতন চালিয়েছে তার বর্ণনা দিতে আমার ঘৃণা হয়।...
>
> 'দিনাজপুরে আমাদের এলাকায় সবচেয়ে লোমহর্ষক ছিল ২৫০ জনের বেশি পাঠান নর-নারী ও শিশুর হত্যাকাণ্ড। আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসী এবং ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলসের বিদ্রোহীরা তাদেরকে দড়ি দিয়ে বাঁধে। বেঁধে তাদের শরীর থেকে কেটে কেটে মাংস খসিয়ে নেয়া হয়। তাদের দিকে থু-থু নিক্ষেপ করা হয়। পাঠানরা যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে

www.pathagar.com

উঠলে তাদের শরীরে বালি ছিটিয়ে দেয়া হয়। তাদের যন্ত্রণা দেখে বিদ্রোহীরা অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে। হাসতে হাসতে তারা তাদের শরীর থেকে আরো মাংস কেটে নেয়। এসব পাঠান তাদেরকে নির্যাতন করার পরিবর্তে দ্রুত হত্যা করার জন্য বিদ্রোহীদের প্রতি কাতর মিনতি জানায়। অসহ্য যন্ত্রণায় তারা কাতরাচ্ছিল। আমার কানে এখনো তাদের কাতরানির শব্দ বাজে।...

'বাঙালি বিদ্রোহীরা আমাদেরকে বারাউল গ্রামে এক গুচ্ছ ঝুপড়ি ঘরে ঠেলে দেয়। রাতে তারা শকুনের মতো আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তো। বাধাদানকারী মহিলাদের গুলি করে হত্যা করে অন্যদের হুঁশিয়ার করে দেয়া হয়। তাদের শরীর ক্ষতবিক্ষত করা হয়। তাদের স্তন কেটে নেয়া হয় এবং তাদের স্পন্দনহীন কপালে ছোরা দিয়ে কেটে কেটে 'জয় বাংলা' খোদাই করে দেয়া হয়। ১০ এপ্রিল পাকিস্তান সেনাবাহিনীর একটি ইউনিট গ্রামটি দখল করে আমাদের উদ্ধার করে।'

(৮০) **আশিতম সাক্ষীর বিবরণ:** ১৯৭১ সালের ২২ মার্চ দিনাজপুরের নীলমতিতে ২০ বছরের সখিনা বিবির স্বামী আবদুস শাকুরকে বাঙালি বিদ্রোহীরা নিজ বাড়িতে হত্যা করে। ১৯৭৪ সালের জানুয়ারিতে করাচিতে প্রত্যাবাসন করার আগে সখিনা বিবি ঢাকায় দু'বছর বসবাস করেন। তিনি তার সাক্ষ্যে বলেছেন:

'আমাদের এলাকায় অবাঙালিরা বস্তিতে বসবাস করতো। একদল বাঙালি বিদ্রোহী রাতে আমাদের এলাকায় হামলা চালায়। তারা বস্তি জ্বালিয়ে দেয় এবং আমাদের বাড়িঘরের যাবতীয় মূল্যবান সামগ্রী লুট করে। আধা ঘণ্টার কম সময়ের মধ্যে তারা আমাদের এলাকার সকল অবাঙালি পুরুষকে হত্যা করে। তারা দা দিয়ে আমার স্বামীকে কুপিয়ে আহত করার পর তাকে গুলি করে হত্যা করে।'

'সকল অবাঙালি পুরুষকে হত্যা করার পর তারা বন্দুকের মুখে প্রায় চার শত শোকার্ত অবাঙালি মহিলাকে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে শাড়ি খুলে নেয়। একজন বিদ্রোহী দা দিয়ে আমার শাড়ি কেটে নিতে চাইলে আমি দম বন্ধ করে আত্মহত্যা করার চেষ্টা করি। উদ্যত বন্দুকের মুখে তারা আমাদেরকে নগ্ন অবস্থায় প্যারেড করতে বাধ্য করে। মুষ্টিমেয় কয়েকজন মহিলা পালানোর চেষ্টা করে। এসব মহিলাকে গুলি করে হত্যা করা হয়। নগ্ন অবস্থায় প্যারেড করার সময় আমি আমার ভাইয়ের স্ত্রীকে চিনতে পারি। তিনি আমাকে জানান যে, বন্দুকধারীরা আমার ভাই ও তার শিশু পুত্রকে হত্যা করেছে। আমরা নারকেলডাঙ্গা পর্যন্ত পাঁচ মাইল হেঁটে যাই। সেখানে পৌছা নাগাদ বন্দি মহিলার সংখ্যা ১৫০ জনের বেশি ছিল না। কয়েকজনকে গুলি করে হত্যা করা হয় এবং বিদ্রোহীরা গণিমতের মাল হিসেবে অনেককে রাস্তা থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়। ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়া মহিলাদের একজন ছিল আমার ভাইয়ের স্ত্রী। তিনি ছিলেন যুবতী ও সুন্দরী। আমি আর কখনো তাকে দেখিনি।...

'আটককারীরা আমাদেরকে ছয়টি কুঁড়ে ঘরে আটক রাখে। প্রথম তিনদিন আমাদেরকে এক মুঠো খাবারও দেয়া হয়নি। আমরা শুধু পানি এবং গাছের ফলমূল খেতাম। বন্দিদশায় অসহায় মহিলাদের গণধর্ষণ করা হতো। ছয়জন কিশোরী মেয়ে পালানোর চেষ্টা করায় গুলি করে তাদের হত্যা করা হয়। ১০ এপ্রিল পাকিস্তান সেনাবাহিনী বিদ্রোহীদের বিতাড়িত করার সময় পশ্চাদপসরণকারী বাঙালি বিদ্রোহীরা আমাদের সবাইকে হত্যা করার চেষ্টা করছিল। ঠিক এসময় আমাদের উদ্ধার করা হয়।...'

www.pathagar.com

(৮১) **একাশিতম সাক্ষীর বিবরণ:** ২৬ বছরের আবদুল মজিদ দিনাজপুরের পাহাড়পুরে বসবাস করতেন। তিনি ভাগ্য গুণে ১৯৭১ সালের গণহত্যা থেকে রক্ষা পান। দিনাজপুরে পাকিস্তান সেনাবাহিনী নিজেদের কর্তৃত্ব কায়েম করার পর আবদুল মজিদ আত্মগোপন অবস্থা থেকে বের হয়ে আসেন এবং অবাঙালিদের লাশ দাফনে সেনাবাহিনীকে সহায়তা করেন। ১৯৭৩ সালের নভেম্বরে তিনি ঢাকা থেকে করাচিতে ফিরে আসেন। আবদুল মজিদ তার মর্মান্তিক স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেছেন:

> '৩ মার্চ আওয়ামী লীগের জঙ্গিরা দিনাজপুরে যুদ্ধংদেহী হয়ে উঠে। তারা রেললাইন উপড়ে ফেলে এবং ট্রেন সার্ভিস ব্যাহত করে। তারা রেলের গোডাউন লুট করে এবং কয়েকটি ট্রেন পুড়িয়ে দেয়। রেলওয়ে স্টেশনে কাজ বর্জনে যেসব অবাঙালি অস্বীকৃতি 'মার্চের প্রথম সপ্তাহে বাঙালি দাঙ্গাবাজ জনতা অবাঙালিদের দোকানপাট লুট করে। তারা ইকবাল হাইস্কুল তছনছ করে। ইকবাল হাইস্কুলে অবাঙালি ছাত্রদের সংখ্যা ছিল বেশি। কয়েকজন শিক্ষক স্কুলের আসবাবপত্র ভাঙচুরে বাঙালি দুষ্কৃতকারীদের বাধা দেয়ায় তাদের লাঞ্ছিত করা হয়।...
>
> 'মার্চের তৃতীয় সপ্তাহে আওয়ামী লীগের একটি বিরাট সশস্ত্র দল এবং স্টেনগান ও রাইফেল সজ্জিত তাদের সমর্থকরা বালিয়াডাঙ্গা কলোনি আক্রমণ করে। আমার হিসেব মতে, সেদিন তাদের হামলায় এ কলোনিতে ২ হাজারের বেশি অবাঙালি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। কয়েকজন অবাঙালি ইকবাল হাইস্কুলে আশ্রয় নেয়। পরদিন বাঙালি বিদ্রোহীরা স্কুলটি তছনছ করে এবং সেখানে আশ্রয়গ্রহণকারী সবাইকে হত্যা করে।...
>
> '২২ মার্চ থেকে বাঙালি বিদ্রোহীরা দিনাজপুরের সর্বত্র অবাঙালি নিধন শুরু করে এবং ১০ এপ্রিল সেনাবাহিনী শহরের নিয়ন্ত্রণ পুনরুদ্ধার করা নাগাদ বিরতিহীনভাবে হত্যাযজ্ঞ চলতে থাকে। বিদ্রোহীরা হাজার হাজার অবাঙালিকে কাঞ্চন নদীর তীর বরাবর উন্মুক্ত কসাইখানাগুলোয় নিয়ে যায় এবং সেখানে তারা তাদের হত্যা করে। তাদের মৃতদেহ নদীতে ভাসিয়ে দেয়া হয়। পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য আবদুল বারী, ডা. খলিলুর রহমান ও এডভোকেট রিয়াজুল ইসলামের মতো আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ এবং আবু ওসমান চৌধুরীর মতো সামরিক কর্মকর্তারা ছিলেন বাঙালি বিদ্রোহীদের নেতা এবং তারাই দিনাজপুরে অবাঙালি হত্যাকাণ্ডে উসকানিদান, পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন করেন। বাঙালি বিদ্রোহীরা শত শত অবাঙালি মহিলাকে উলঙ্গ অবস্থায় শহর ঘুরিয়ে পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলোতে নিয়ে যায়। সেখানে কুঁড়ে ঘরগুলোতে তাদের সম্ভ্রমহানি ঘটানো হয়।...
>
> 'আমি সেনাবাহিনীকে ইকবাল হাইস্কুলে নিয়ে যাই। কেননা আমি জানতাম যে, সেখানে অবাঙালিদের হত্যা করা হয়েছে। বুলেটে ক্ষতবিক্ষত প্রায় আড়াই হাজার গলিত লাশ উদ্ধার করা হয়। এসব লাশ গণকবর দেয়া হয়। কোনো কোনো অন্তঃসত্ত্বা মহিলার তলপেট ছিল চেরা। শিরশ্ছেদকৃত কয়েকটি লাশের মাথা ছিল নিখোঁজ। আমি কয়েকটি শিশুর সন্ধান পাই। এসব শিশুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছিল ছিন্ন ভিন্ন। আমি কাঞ্চন নদীর তীরে বিদ্রোহীদের স্থাপিত কয়েকটি কসাইখানা দেখতে পাই। মনে হলো এ নদী দিয়ে রক্তের স্রোত বইয়ে গেছে। খুনিরা হত্যা করার আগে যেসব হাতিয়ার দিয়ে বন্দিদের ওপর নির্যাতন চালিয়েছিল আমি সেগুলো দেখতে পাই।'

(৮২) **বিরাশিতম সাক্ষীর বিবরণ:** ৪০ বছরের কামরুন্নিসা বেগমের স্বামী ছিলেন দিনাজপুরে বেঙ্গল রাইস মিলের মালিক। তিনি তার দু'পুত্র ও এক কন্যা নিয়ে ঢাকায় চরম দারিদ্র্যের

www.pathagar.com

সঙ্গে এক বছর বসবাস করেছেন। ১৯৭৪ সালে তিনি চট্টগ্রাম থেকে করাচিতে প্রত্যাবাসন করেন। কামরুন্নিসা তার স্বামীর হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে বলেছেন:

> '১৯৪৭ সালে আমরা কলকাতা থেকে পূর্ব পাকিস্তানে অভিবাসন করি। আমরা কয়েক বছর ঢাকায় বসবাস করি এবং একসময় রংপুরে স্থানান্তরিত হই। পরবর্তীতে আমরা দিনাজপুরে বসতি স্থাপন করি। সেখানে আমার স্বামী একটি রাইস মিল ক্রয় করেন। তার প্রায় এক শ' কর্মচারী ছিল এবং মিলে আয় হতো বেশ। তার একজন নিষ্ক্রিয় বাঙালি অংশীদার ছিল। তিনি মিলে কোনো অর্থ বিনিয়োগ করেননি। আমাদের প্রচুর মুনাফা হতে শুরু করলে এ ব্যক্তি মিলে প্রতারণা করার চেষ্টা করেন এবং আমার স্বামী তাকে জরিমানা হিসেবে মোটা অঙ্কের অর্থ দিয়ে বরখাস্ত করেন।...
>
> '২৫ মার্চ সন্ত্রাসীরা দিনাজপুরে তৎপর হয়ে উঠলে এবং হাজার হাজার অবাঙালিকে হত্যা করতে শুরু করলে এই সাবেক বাঙালি অংশীদার আমাদের মিলে একটি সশস্ত্র হামলায় নেতৃত্ব দেন। তিনি ও তার পোষ্য গুণ্ডারা আমার স্বামীকে গুলি করে হত্যা করে এবং মিলের সব চাল ও মূল্যবান সামগ্রী লুট করে। আমার স্বামীকে হত্যার পর লুটেরারা আমাদের বাড়ি লুট করে। আমরা আমাদের পরিবারের এক পুরনো বাঙালি বন্ধুর বাড়িতে আশ্রয় নেই।...

(৮৩) **তিরাশিতম সাক্ষীর বিবরণ:** ২৫ বছরের আবদুল কাদির দিনাজপুরে একটি রাইস মিলে কাজ করতেন। তিনি যে মিলে কাজ করতেন সেই মিলের ৬৯ জন অবাঙালি কর্মচারীকে হত্যা করা হয়। ১৯৭১ সালের মার্চে একটি উত্তপ্ত বয়লার থেকে অলৌকিকভাবে তিনি বেঁচে যান। ঘটনার সাক্ষ্য দিতে গিয়ে আবদুল কাদির বলেছেন:

> 'দিনাজপুর রাইস মিল ছিল পূর্ব পাকিস্তানের উত্তরাঞ্চলের সবচেয়ে বৃহত্তম চাল কল। এ মিলে ৭০০ কর্মচারী ছিল। কর্মচারীদের অধিকাংশই ছিল বাঙালি। মিলের মালিক ছিলেন অবাঙালি ধার্মিক হাজী করিম। তিনি ছিলেন অত্যন্ত দয়ালু ও ভদ্র। তিনি তার কর্মচারীদের সুখ-দুঃখের খোঁজ-খবর নিতেন। ষাট বছরের বৃদ্ধ হলেও তিনি ছিলেন সক্রিয় এবং ব্যক্তিগতভাবে রাইস মিলের কাজকর্ম তত্ত্বাবধান করতেন। মিলের জন্য চাল সংগ্রহে সরকারের সঙ্গে তার চুক্তি ছিল।...
>
> '২৫ মার্চ আওয়ামী লীগের সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের নেতৃত্বে একদল লোক এবং ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলসের বিদ্রোহীরা আমাদের মিলে আক্রমণ চালিয়ে সকল নগদ অর্থ ও মজুদকৃত চাল লুট করে। তারা অবাঙালি কর্মচারী ও তাদের পরিবারবর্গকে হত্যা করে। বিদ্রোহীরা অবাঙালিদের কাবু করে মিলের স্টোর থেকে দড়ি নিয়ে তাদের বেঁধে ফেলে। দড়ি দিয়ে বাঁধার পর তাদেরকে উত্তপ্ত বয়লারে নিক্ষেপ করে। আমি নিজ চোখে মিলের মালিক হাজী করিমকে উত্তপ্ত বয়লারে জীবন্ত দগ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করতে দেখেছি। এমনকি মিলের কয়েকজন অবাঙালি মহিলা শ্রমিককে একই পৈশাচিক কায়দায় হত্যা করতে দেখেছি।...
>
> 'যে দড়ি দিয়ে আমাকে বাঁধা হয়েছিল তা ছিল নরম। অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করার আগে অবাঙালিদের যে হলে জড়ো করে রাখা হয়েছিল আমি সেখান থেকে পালাতে সক্ষম হই। আমি একটি স্টোর রুমে আত্মগোপন করি। এ স্টোর রুমে চাল মজুদ করে রাখা হয়েছিল। আমি সারারাত দোয়া-দরূদ পাঠ করেছি। পাকিস্তান সেনাবাহিনী দিনাজপুরে নিয়ন্ত্রণ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার পর আমি আত্মগোপন অবস্থা থেকে বের হয়ে আসি।

www.pathagar.com

বিদ্রোহীরা হাজী করিমের বাড়ি লুট করে এবং তার পরিবারকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়। আমার বৃদ্ধা মা ছাড়া এ হত্যাকাণ্ডে আমার সকল আত্মীয়-স্বজন নিহত হয়।...
'বিদ্রোহীদের অধিকাংশই ছিল স্থানীয় হিন্দু। এ ব্যাপারে আমার কোনো সন্দেহ নেই যে, পশ্চিমবঙ্গ থেকে অনুপ্রবেশকারীরা দিনাজপুর হত্যাযজ্ঞে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। অবাঙালিদের বিরুদ্ধে এ ধরনের হত্যাযজ্ঞ ছিল আমাদের কাছে অচিন্তনীয় ব্যাপার। ১৯৭১ সালে মার্চের আগে আমরা কখনো এমন গণহত্যার কথা কল্পনা করতে পারিনি। বাঙালিদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক ছিল হৃদ্যতাপূর্ণ।...'

(৮৪) **চুরাশিতম সাক্ষীর বিবরণঃ** ১৯৭১ সালের মার্চে দিনাজপুরে অবাঙালি গণহত্যার সময় ২৬ বছরের সামীদা খাতুনের পিতা, স্বামী ও বড় ভাইকে হত্যা করা হয়। সামীদা খাতুন তার সাক্ষ্যে বলেছেনঃ

'আমরা দিনাজপুরের ঘড়িপাড়ায় বসবাস করতাম। আমার স্বামী মোহাম্মদ নাজির হোসেন ছিল বাস চালক। শহরের কেন্দ্রস্থলে আমার পিতার একটি দোকান ছিল। ২৩ মার্চ একদল বাঙালি আমাদের এলাকায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে এবং কয়েকজন অবাঙালির বাড়িঘর লুট করে। কিন্তু ২৬ মার্চ বিদ্রোহীরা আরো সাহসী হয়ে উঠে। রাতে তারা আমাদের এলাকার সকল অবাঙালিকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার অভিযান চালায়। আমার স্বামী ছিলেন আমার পিতার সঙ্গে। তারা আমার পিতার দোকান লুট করে এবং তাকে ও আমার স্বামীকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে। আমার বড় ভাইয়ের বাড়ি ছিল আমাদের বাড়ির কাছাকাছি। তারা আমাদের বাড়ি এবং আমার বড় ভাইয়ের বাড়ি আক্রমণ করে। আমি আমাদের দরজায় দাঁড়িয়ে আমার বড় ভাই ও তার প্রাপ্তবয়স্ক দু'পুত্রকে বাড়ি থেকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে রাস্তার পাশে রামদা ও ছোরা দিয়ে হত্যা করতে দেখেছি। আমার ভাইয়ের স্ত্রী আক্রমণকারীদের পায়ে ধরেন এবং তার স্বামী ও দু'সন্তানের জীবন ভিক্ষা দেয়ার জন্য তাদের কাছে মিনতি করেন। কিন্তু তারা তাকে লাঠি দিয়ে আঘাত করলে তিনি মাটিতে পড়ে যান। আমি আমার ভাই ও তার সন্তানের নৃশংস মৃত্যুর দৃশ্য দেখে বাকরুদ্ধ হয়ে যাই। আমি জোরে চিৎকার দেই। আক্রমণকারীরা আমাদের বাড়ি লুট করে ঘোষণা দিয়ে যায় যে, তারা আমাকে এবং আমার কন্যাকে হত্যা করতে কয়েকদিন পর আবার আসবে।...
'আমাদেরকে জানানো হয় যে, বাঙালি বিদ্রোহীরা আমাদের এলাকার জীবিত মহিলা ও শিশুদের হত্যা করার জন্য ১০ এপ্রিল চূড়ান্ত তারিখ নির্ধারণ করেছে। আমরা আর্তনাদ করে উঠি এবং সাহায্যের জন্য আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করি। আমরা গুলির শব্দ শুনতে পাই। গুলির শব্দ শুনে ভাবলাম হয়তো বিদ্রোহীরা আমাদের এলাকার দিকে আসছে। আমাদের দোয়া কবুল হয়। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর একটি ইউনিট দিনাজপুরে প্রবেশ করে এবং নিজেদের কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে। আমরা ঘাতকের ছোরা থেকে রক্ষা পাই। সেনাবাহিনী আমাদেরকে ঢাকায় স্থানান্তর করে। বিধবা মহিলা ও এতিম শিশুদের জন্য নির্মিত একটি ত্রাণ শিবিরে আমরা আশ্রয় লাভ করি। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর ভারতীয় সেনাবাহিনী পূর্ব পাকিস্তান দখল করে নিলে আমাদের ওপর নেমে আসে নয়া দুর্যোগ। মুক্তিবাহিনী বহু মহিলাকে অপহরণ করে। ১৯৭৪ সালের মার্চে আমি আমার ছোট মেয়েকে নিয়ে করাচিতে প্রত্যাবাসন করি।'

www.pathagar.com

(৮৫) **পচাশিতম সাক্ষীর বিবরণ:** ২৮ বছরের আবদুল খালেকের পরিবার ১৯৪৭ সালে উপমহাদেশ বিভক্তির অনেক আগে থেকে এ এলাকায় বসবাস করতো। খালেকের উর্দুভাষী দাদা ১৯২০-এর দশকে দিনাজপুরে বসতি স্থাপন করেন। তার মা ছিল বাঙালি। তিনি ও তার পরিবারের সব সদস্য চমৎকার বাংলা বলতে পারতেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও ১৯৭১ সালের মার্চে অবাঙালি হত্যাযজ্ঞের সময় খালেকের পরিবারের অধিকাংশ সদস্য নিহত হয়। খালেক দিনাজপুরে মিশন রোডে পৈত্রিক বাড়িতে বসবাস করতেন। শহরের আরেকটি অংশে একজন বাঙালি বন্ধুর বাড়িতে আত্মগোপন করে তিনি ভাগ্যক্রমে হত্যাকাণ্ড থেকে বেঁচে যান। ১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে খালেক পাকিস্তানে প্রত্যাবাসন করেন। তিনি তার সাক্ষ্যে বলেছেন:

> 'আমাদের পরিবারের মতো আরো বহু পরিবার উপমহাদেশ বিভক্তির অনেক আগে দিনাজপুরে বসতি স্থাপন করেছিল। তারা ছিল দোভাষী। তারা উর্দুর মতো বাংলায়ও কথা বলতে পারতো। আন্তঃবিয়ের মধ্য দিয়ে তারা স্থানীয় বাঙালিদের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার চেষ্টা করছিল। আমাদের পরিবারের সবাই ছিল জন্মগতভাবে বাঙালি এবং তারা দিনাজপুরের আঞ্চলিক টানসহ বাংলায় কথা বলতো। কিন্তু ১৯৭১ সালের মার্চের উন্মাদনার সময় আমাদের সবাইকে বিহারী হিসেবে গণ্য করা হয় যদিও আমাদের কেউ উপমহাদেশ বিভক্ত হওয়ার পর বিহারের মুখ দেখেনি। আমার মনে ঘুণাক্ষরে একথা কখনো জাগেনি যে, দিনাজপুরের কোনো বাঙালি অবাঙালি হওয়ার জন্য আমাদের পরিবারের কোনো সদস্যকে হত্যা করার কথা ভাবতে পারে। কিন্তু ২১ মার্চের পর একটি পৈশাচিক উন্মত্ততা বাঙালি জনগোষ্ঠীর একটি বিরাট অংশকে গ্রাস করে। আমি এখনো বুঝতে পারছি না অবাঙালিদের বিরুদ্ধে বাঙালিদের বিদ্বেষ সৃষ্টি হওয়ার প্রকৃত কারণ কী ছিল। আওয়ামী লীগের প্ররোচনায় তারা দিনাজপুর জেলার প্রতিটি শহরের ৯০শতাংশ অবাঙালিকে হত্যা করে।...
>
> 'দিনাজপুরের কাছাকাছি কয়েকটি গ্রামে অবাঙালিরা গুচ্ছ গুচ্ছ বস্তিতে বাস করতো। কিন্তু হত্যাকাণ্ড ছিল এত নিষ্ঠুর ও ব্যাপক যে, এখানকার একটি অবাঙালিও জীবিত ছিল না। সেনাবাহিনী নিয়ন্ত্রণ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করলে আমি আত্মগোপন থেকে বাইরে বের হয়ে আসি। কিন্তু দিনাজপুরের বাড়িঘর ও রাস্তায় অবাঙালিদের পঁচা লাশের স্তূপ দেখে আমি বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে যাই। আমি শুনতে পেয়েছিলাম যে, বিদ্রোহীরা কাঞ্চন নদীর তীরে কুখ্যাত কসাইখানা স্থাপন করেছে। সেখানে অবাঙালিদের হত্যা করে লাশ নদীতে ভাসিয়ে দেয়া হতো। আমার হিসেব অনুযায়ী ১৯৭১ সালের মার্চ-এপ্রিলে দিনাজপুর শহরে কমপক্ষে ৩০ হাজার অবাঙালিকে হত্যা করা হয়।...
>
> 'অবাঙালিদের নিশ্চিহ্ন করার জন্য বাঙালি বিদ্রোহীরা প্রতারণা ও জালিয়াতির আশ্রয় নিয়েছিল। জেলা প্রশাসকের সঙ্গে বৈঠকের জন্য অবাঙালিদের আমন্ত্রণ জানানো ছিল এমনি একটি প্রতারণা। দিনাজপুরের জেলা প্রশাসক ইকবাল হাইস্কুল ভবনে স্থানীয় শান্তি কমিটির বৈঠকে যোগদানের জন্য শহরের ২৫ জন নেতৃস্থানীয় ব্যবসায়ীকে আমন্ত্রণ জানান। এসব ব্যবসায়ী স্কুল ভবনে গিয়ে পৌঁছালে তাদের প্রত্যেককে বাঙালি বিদ্রোহীরা হত্যা করে।...

(৮৬) **ছিয়াশিতম সাক্ষীর বিবরণ:** ৫৫ বছরের হামিদা খাতুন দিনাজপুর সদর হাসপাতালে একজন নার্স হিসেবে কয়েক বছর কাজ করেন। ১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে তিনি

www.pathagar.com

করাচিতে প্রত্যাবাসন করেন। হামিদা খাতুন ১৯৭১ সালে তার শহরে দুর্ভাগ্যজনক ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে বলেছেন:

'দিনাজপুরে কাঞ্চন নদীর তীরে একটি কসাইখানায় আমরা মৃত্যুর প্রহর গণছিলাম। ঠিক এসময় পাকিস্তান সেনাবাহিনী আমাদের উদ্ধার করে। আমরা দিনাজপুরে দীর্ঘদিন ধরে বাস করছিলাম। কিন্তু ১৯৭১ সালে আওয়ামী লীগের বিদ্রোহকালে অবাঙালিদের জীবনে যে দুর্ভাগ্য নেমে আসে এমন দুঃস্বপ্ন আমরা কখনো দেখিনি।...

'২৩ মার্চ আওয়ামী লীগের একটি গ্রুপ আমাদের এলাকার সকল অবাঙালি পুরুষকে শান্তি কামিটির একটি বৈঠকে যোগদানের নির্দেশ দেয়। অবাঙালি পুরুষরা শান্তি কমিটির বৈঠকে যোগদানে বের হয়ে গেলে সশস্ত্র বাঙালি বিদ্রোহীরা এ এলাকায় তাদের ঘরবাড়ি আক্রমণ করে এবং মূল্যবান সবকিছু লুট করে। বৈঠকে যোগদানকারী আমাদের একজন প্রতিবেশী মাঝরাতে এসে আমাদেরকে জানায় যে, বিদ্রোহীরা স্কুল কম্পাউন্ডে তথাকথিত বৈঠকে যোগদানকারী সকলকে হত্যা করেছে। পরদিন বিদ্রোহীরা আমাদের এলাকার সকল মহিলা ও শিশুকে আটক করে নদীর তীরে একটি শিবিরে নিয়ে যায়। সেখানে আমরা পুরুষদের হত্যা করার নির্মম দৃশ্য দেখেছি। তাদের লাশ নদীতে ভাসিয়ে দেয়া হয়। আমাদেরকে জানানো হয় যে, কয়েকদিনের মধ্যে আমাদেরকে হত্যা করা হবে। আমাদের গ্রুপে খুব কমসংখ্যক যুবতী মহিলাই অবশিষ্ট ছিল। বিদ্রোহীরা সম্ভ্রম ঘটানোর জন্য যুবতী মহিলাদের অপহরণ করে। আমি কখনো নদীর তীরে উন্মুক্ত আকাশের নিচে নরকতুল্য কসাইখানার স্মৃতি ভুলতে পারিনি। শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণায় আমরা নিজেদেরকে মৃত্যুর হাতে সঁপে দিয়েছিলাম। ঠিক সে সময় ১০ এপ্রিল পাকিস্তানি সৈন্যরা আমাদেরকে মৃত্যুর ছোবল থেকে রক্ষা করে।...

'আমাদেরকে সৈয়দপুরে একটি শিবিরে স্থানান্তর করা হয়। ১৯৭১ সালে ডিসেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে মুক্তিবাহিনী আমাকে হত্যা করার জন্য হন্যে হয়ে খুঁজছিল। কেননা আমি ১৯৭১ সালের মার্চে বিদ্রোহীদের পরিচালিত হত্যাকাণ্ডের তথ্য পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে জানিয়ে দিয়েছিলাম। আমাকে সৈয়দপুরে ১৮ মাসের কারাদণ্ড প্রদান করা হয়। সপ্তাহের পর সপ্তাহ আমাকে নির্যাতন করা হয়। ১৯৭৪ সালে ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে আমি কারাগার থেকে মুক্তি লাভ করি। তার কিছুদিন পর আমি পাকিস্তানে প্রত্যাবাসন করি।...'

(৮৭) **সাতাশিতম সাক্ষীর বিবরণ:** ৪০ বছরের লাডলি মাসরুরের স্বামী মোবিন আলম দিনাজপুর রেলওয়ে স্টেশনের ওয়াচ এন্ড ওয়ার্ড বিভাগে চাকরি করতেন। ১৯৭১ সালের হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে তিনি তার সাক্ষ্যে বলেছেন:

'২৫ মার্চ রাত ৯টায় একদল বাঙালি বিদ্রোহী দিনাজপুরে আমাদের এলাকা আক্রমণ করে। তারা আমাদের বাড়ির তালাবন্ধ দরজা ভেঙ্গে ফেলে এবং আমার স্বামীকে কাবু করে ফেলে। তারা তাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রড দিয়ে পেটায়। আমাদের বাড়ি লুট করে। আমার সন্তানরা ভয়ে চিৎকার করতে থাকলে আমি আমার স্বামীর প্রাণভিক্ষা চাই। বিদ্রোহীরা অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে এবং আমার বাড়ির যাবতীয় মূল্যবান সামগ্রী লুট করে। ওয়ার্ডড্রপ থেকে একটি ট্রানজিস্টার রেডিও কেড়ে নিয়ে একজন বিদ্রোহী বললো, 'এ ট্রানজিস্টার আমার।' আরেকজন বিদ্রোহী আমার স্বামীর ঘড়ি ছিনিয়ে নেয়। তাদের দু'জন অর্থ ও অলঙ্কারের জন্য আমার দেহ তল্লাশি করে। তারা আমার সব অলঙ্কার

www.pathagar.com

কেড়ে নেয়। চোর-ছ্যাঁচড়ার মতো আচরণ করে তারা আমার শাড়ি কেড়ে নেয়। লুটতরাজ শেষে তারা আমার স্বামীকে টেনে রাস্তায় নিয়ে যায়। তাকে এত প্রহার করে যে, তার শরীর দিয়ে রক্ত পড়তে থাকে। আমি আবার তার প্রাণভিক্ষা চাই। কিন্তু তারা আমাকে লোহার একটি রড দিয়ে আঘাত করলে আমি মাটিতে পড়ে যাই। তারা আমাদের এলাকার অন্যান্য অবাঙালির সঙ্গে তাকে লাইনে দাঁড় করায়। তাদেরকে নদীর দিকে হাঁটিয়ে নিয়ে যায়। আমার স্বামীকে শেষবারের মতো আমি দেখি। বিদ্রোহীরা তাকে নিয়ে যাবার সময় তিনি আমার উদ্দেশ্যে চিৎকার করে বললেন, 'আল্লাহর ওপর বিশ্বাস রেখো এবং বাচ্চাদের দেখো।' আমি জানতে পারি যে, তাকে হত্যার জন্য কসাইখানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে।...

'১০ এপ্রিল একটি বিরাট সশস্ত্র বাঙালি জনতা আমাদের এলাকা আক্রমণ করে। তারা সকল অবাঙালি মহিলা ও শিশুকে একত্রিত করে এবং বন্দুকের নলের ডগায় আমাদেরকে নদীর তীরে নিয়ে যায়। সেখানে অবাঙালিদের হত্যা করা হতো। আমি উন্মুক্ত কসাইখানা দেখে শেষবারের মতো আমার বাচ্চাদের মুখ দেখে নেই। মহিলারা আতঙ্কে কাঁদতে লাগলো। তাদের কয়েকজন আত্মীয়-স্বজনকে হত্যার দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে। লাশ ও রক্তে নদীর পানি লাল। হঠাৎ করে বাঙালি বিদ্রোহীরা পুরোপুরি বিশৃঙ্খল অবস্থায় দৌড়াতে শুরু করে। ছয় জন পাকিস্তানি সৈন্য দৌড়ে ফেরেশতার মতো আমাদের উদ্ধারে উপস্থিত হয়। আমরা মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাই। সেনাবাহিনী আমাদেরকে সৈয়দপুরে ত্রাণ শিবিরে নিয়ে যায়। ১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে আমরা পাকিস্তানে প্রত্যাবাসন করি।'

(৮৮) **অষ্টাশিতম সাক্ষীর বিবরণ:** ৩০ বছরের খাতুন নিসার স্বামী দিনাজপুরে পুলিশ বাহিনীতে চাকরি করতেন। তিনি দিনাজপুরে উন্মুক্ত আকাশের নিচে নদীর তীরে বাঙালি বিদ্রোহীদের উদ্ভাবিত নির্যাতনের কলাকৌশল বর্ণনা করেছেন। কসাইখানায় খাতুন ও তার সন্তান এবং অন্যান্য অবাঙালি মৃত্যুর প্রহর গণছিল। ঠিক তখন পাকিস্তান সেনাবাহিনী যমের হাত থেকে তাদের রক্ষা করে। ১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে খাতুন ও তার তিন সন্তান পাকিস্তানে প্রত্যাবাসন করে। তিনি তার সাক্ষ্যে বলেছেন:

'নদীর তীরে কসাইখানার ভয়াবহ দৃশ্য আমাকে তাড়া করে ফিরে। আমি একটি কাঠের দণ্ড দেখেছি। যেখানে রামদা ও লম্বা ছোরা দিয়ে অবাঙালিদের শিরশ্ছেদ করা হতো। আমি উত্তপ্ত কড়াই দেখেছি। বন্দিদের কাছ থেকে অর্থ সম্পদ সম্পর্কে তথ্য আদায়ে তাদের উত্তপ্ত কড়াইয়ে নিক্ষেপ করা হতো।...

'১৯৭১ সালের ২ মার্চ থেকে আওয়ামী লীগের জঙ্গি সমর্থক ও তাদের সহযোগীরা দিনাজপুরে অবাঙালিদের বিরুদ্ধে সহিংসতায় লিপ্ত হয়। অবাঙালি মালিকানাধীন কয়েকটি দোকানপাট ও বাড়িঘর লুট করা হয়। কিন্তু ১৭ মার্চ থেকে তারা অবাঙালিদের হত্যা এবং মহিলাদের সম্ভ্রমহানি ঘটাতে শুরু করে। আওয়ামী লীগের জঙ্গি তৎপরতায় আমরা এত ভীত হয়ে পড়ি যে, আমাদের এলাকায় হামলা চালানোর গুজব শুনতে পেয়ে ২১ মার্চ রাতে আমার স্বামী আবদুল গফুর, আমার তিন সন্তান এবং আমি বাড়ির পেছন দরজা দিয়ে পালিয়ে যাই এবং আমাদের বাড়ি থেকে এক মাইল দূরে এক গুচ্ছ ঝাকরা গাছের নিয়ে গিয়ে আশ্রয় নেই। আমরা দেখতে পাই যে, ইতোমধ্যে আমাদের মতো আরো বহু অবাঙালি পুরুষ, মহিলা ও শিশু সেখানে আশ্রয় নিয়েছে। এক ঘণ্টা পর

www.pathagar.com

আমরা আমাদের এলাকা থেকে গোলাগুলির আওয়াজ, আওয়ামী লীগের আক্রমণকারী লোকজনের ধমক এবং সাহায্যের জন্য আক্রান্তদের চিৎকার শুনতে পাই। আমরা জ্বলন্ত বাড়িঘরে আগুনের লেলিহান শিখা দেখতে পাই। বিদ্রোহীরা আমাদের পালিয়ে যাবার আলামত বুঝতে পেরে আমাদের পলায়নের পথ লক্ষ্য করে গুলিবর্ষণ করতে থাকে।...

'আমাদের কয়েকজন আহত হলেও আমরা চুপচাপ থাকি। আমরা হামাগুড়ি দিয়ে একটি গোরস্তানের দিকে এগিয়ে যাই। কবরে আশ্রয় নিয়ে আমরা গোলাগুলি থেকে রক্ষা পাই। অতি প্রত্যুষে আমরা একটি পরিত্যক্ত স্কুল ভবনে গিয়ে উঠি। কারো সন্দেহের উদ্রেক না করে আমরা সেখানে তিনদিন অবস্থান করি। এ ক'দিন আমরা পানি পান করে বেঁচে থাকি। রাতে পাশের একটি পুকুর থেকে আমরা পানি এবং গাছ থেকে ফলমূল পেড়ে আনতাম। ২৯ মার্চ বিকালে একদল বাঙালি বিদ্রোহী আমাদের গোপন আশ্রয়স্থলে হামলা চালিয়ে আমার স্বামীসহ সকল অবাঙালি পুরুষকে আটক করে। যে ক'জন বাধা দেয়ার চেষ্টা করেছিল তাদেরকে দড়ি দিয়ে বেঁধে বেধড়ক পেটানো হয়। মহিলারা তাদের পুরুষদের ক্ষমা করার জন্য করজোড়ে বিদ্রোহীদের কাছে মিনতি জানায়। কিন্তু বিদ্রোহীরা ছিল হৃদয়হীন ও নিষ্ঠুর। বিদ্রোহীরা অট্টহাসি দিয়ে বললো, 'আমরা তোমাদের কিছু করবো না। তোমরা আমাদের বাড়িতে উত্তম চাকরাণী হিসেবে কাজ করবে।' উদ্যত বন্দুক উঁচিয়ে বিদ্রোহীরা অবাঙালি বন্দিদের হাঁটিয়ে নিয়ে যায়। আমরা পরে জানতে পেরেছি যে, তাদেরকে দু'মাইল দূরে একটি নদীর তীরে বধ্যভূমিতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। পরদিন বিদ্রোহীরা আবার ফিরে আসে এবং আমাদেরকে ঝটপট তাদের সঙ্গে বের হয়ে যাবার নির্দেশ দেয়।...

'নদীর কাছাকাছি এসে একটি কসাইখানা দেখার পর ভয়ে আমাদের শিরদাঁড়া বেয়ে ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে যেতে থাকে। বিদ্রোহীরা অবাঙালিদের হত্যা করার জন্য এ কসাইখানা বানিয়েছিল। এ কসাইখানা ছিল মর্তের নরক। একটি কাষ্ঠ দণ্ডে বন্দিদের শিরশ্ছেদ করা হতো। বন্দিদের কাছ থেকে তথ্য আদায়ে গাছে ঝুলানো ছিল রশি এবং উত্তপ্ত পানিতে চুবানোর জন্য ছিল একটি বিরাট ধাতব কড়াই। আরো ছিল চকচকে ছোরা, চাকু, বল্লম ও বর্শা। এ কসাইখানা সবুজ প্রান্তরে প্রশান্ত নদীর তীরে রক্তের হোলি খেলার নির্মম সাক্ষ্য বহন করছিল। চারদিকে কেবল রক্তের দাগ। সলিল সমাধির জন্য লাশের স্তূপ। একটা বমি বমি ভাব। আমাদের বিস্ফোরিত চোখের সামনে এক ডজন লোকের শিরশ্ছেদ করার পর একজন বাঙালি সৈন্য চিৎকার করে আদেশ করলো, 'এসব মহিলা ও শিশুকে নদীর শেষ মাথায় রেখে এসো। এখানে শুধু দুর্গন্ধ আর রক্ত।' নরহত্যায় জড়িত নিষ্ঠুর লোকজন তার নির্দেশের জবাবে বললো, 'জ্বী মেজর।' আমাদেরকে ছোরার ভয় দেখিয়ে নদীর তীর বরাবর দৌড়াতে বাধ্য করা হয়। আমাদের শক্তি ফুরিয়ে আসছিল। অতি কষ্টে আমরা আমাদের অবসন্ন ও ক্লান্ত শরীরকে কোনো রকমে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যেতে থাকি। আমরা ভাগ্যের প্রতি এত হতাশ এবং জীবনের প্রতি এত বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ি যে, আমাদের দ্রুত শেষ করে দেয়ার জন্য হত্যাকারীদের অনুরোধ করি। পালানোর কোনো সুযোগ ছিল না। ঘটনাস্থলে অন্তত ৫০০ লোক ছিল। তাদের অনেকের কাছে ছিল অস্ত্র। হঠাৎ করে বিশৃঙ্খলা শুরু হয়। আমাদের নির্যাতনকারীরা প্রাণভয়ে পালাতে থাকে। গোধূলি লগ্নে নদীর শেষ প্রান্তে ছায়ার মতো এক ডজন পাকিস্তানি সৈন্যকে আমরা দেখতে পাই। এসব সৈন্য আমাদের উদ্ধারে ফেরেশতার মতো উদয় হয়ে আমাদের দিকে দৌড়ে আসছিল। নিস্তব্ধতা ভেদ করে তাদের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়, 'আল্লাহু আকবর।' মুহূর্তের মধ্যে আমাদের নিষ্ঠুর আটককারীরা নিকটবর্তী জঙ্গলে পালিয়ে যায়।

www.pathagar.com

পাকিস্তানি সৈন্যরা আমাদেরকে একটি ত্রাণ শিবিরে নিয়ে যায়। আহতদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। মৃতদের যথাযোগ্য মর্যাদায় দাফন করা হয়। ১৯৭১ সালে ডিসেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে ভারতের কাছে পূর্ব পাকিস্তানের পতন ঘটার পর মুক্তিবাহিনী ও তাদের সমর্থকরা আমাদের ওপর আবার দুর্ভোগের পাহাড় চাপিয়ে দেয়। আমরা পাকিস্তানে এসেছি। মনে হয় আমরা যেন নতুন করে জীবন ফিরে পেয়েছি।'

(৮৯) **উনানব্বইতম সাক্ষীর বিবরণ:** ৫০ বছরের হাসিনা বেগমের স্বামী কবির আহমেদ খান ছিলেন একজন ব্যবসায়ী। তারা দিনাজপুর শহরের উপকণ্ঠে বসবাস করতেন। ১৯৭১ সালের মার্চে অবাঙালি হত্যাকাণ্ডে হাসিনা বেগম তার স্বামীকে হারান। তবে তিনি তাদের পরিবারের ঘনিষ্ঠ বন্ধু এক আইনজীবীর দু'মেয়েকে বাঁচাতে সক্ষম হন। তার দু'পুত্র নিকটবর্তী জঙ্গলে আত্মগোপন করে জীবন রক্ষা করে। সেনাবাহিনী দিনাজপুরে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার পর হাসিনা বেগম তার দু'পুত্রকে পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে যোগদানে উৎসাহিত করেন। ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে সীমান্তে শত্রুর সঙ্গে সংঘর্ষে তার দু'পুত্র বন্দি হয়। ১৯৭৩ সালের ডিসেম্বরে হাসিনা বেগম ঢাকা থেকে পাকিস্তানে প্রত্যাবাসন করেন। তিনি তার সাক্ষ্যে বলেছেন:

'১৯৭১ সালে মার্চের প্রথম সপ্তাহে আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসীরা অবাঙালিদের ভয়ভীতি প্রদর্শন শুরু করে। মাসের মাঝামাঝি তাদের অবাঙালি বিরোধী বিদ্বেষ ঠাণ্ডা মাথায় সহিংসতা, অপহরণ ও হত্যাকাণ্ডে রূপ নেয়। আনুমানিক ১৭ মার্চের দিকে বাঙালি বিদ্রোহীরা আমাদের এলাকার কয়েকজন অবাঙালি পুরুষকে হত্যা করলে আমরা সন্ত্রাসের তীব্রতা অনুভব করতে শুরু করি। আমি আমার দু'পুত্রকে পাশের গ্রামে একটি বিশ্বস্ত বাঙালি পরিবারে আত্মগোপন করে থাকার জন্য পাঠিয়ে দেই। আমার স্বামীর এক আইনজীবী বন্ধু, তার দু'মেয়ে এবং তার ভাই আমাদের সঙ্গে বসবাস করতে আসে। তাদের বাড়ি ছিল শহরের কেন্দ্রস্থলে। সেখানে অবাঙালিদের বিরুদ্ধে সহিংসতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠছিল। আমরা গুজব শুনতে পাই যে, ২৪ মার্চ বাঙালি বিদ্রোহীরা আমাদের এলাকায় অবাঙালিদের ওপর হামলা চালাবে। অবাঙালি যুবতী মহিলাদের অপহরণ ও সম্ভ্রমহানি ঘটানোর খবর পেয়ে আমি উদ্বিগ্ন হয়ে উঠি। আমার স্বামী ও তার আইনজীবী বন্ধুর সম্মতিতে আমি আমাদের বাড়ির প্রাঙ্গণে পানির একটি শুকনো ট্যাংকের মেঝেতে একটি তোষক বিছিয়ে দেই এবং সেই দু'টি মেয়েকে তার ওপর শুয়ে থাকতে বলি। তারপর তাদের ওপর কলাপাতা বিছিয়ে দেই। আমার কাছ থেকে একটি সাংকেতিক শব্দ শোনা নাগাদ তাদেরকে শুয়ে থাকার পরামর্শ দেই। এ ছদ্মাবরণ এত সফল হয় যে, তাদের পিতাও বিশ্বাস করতে পারেননি যে, এ দু'টি মেয়েকে কলাপাতা দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে।

'আমাদের আশংকা অনুযায়ী ২৪ মার্চ রাতে একদল সশস্ত্র বাঙালি বিদ্রোহী আমাদের এলাকায় হামলা চালায়। তারা আমাদের বাড়িতে প্রবেশ করে আমার স্বামী, তার আইনজীবী বন্ধু ও তার ছোট ভাইকে কাবু করে ফেলে এবং তাদের ধরে নিয়ে যায়। আমি আমার স্বামীর সঙ্গে যাবার চেষ্টা করি। কিন্তু আক্রমণকারীরা লাঠি দিয়ে আমাকে আঘাত করলে আমি ব্যথায় জ্ঞান হারিয়ে ফেলি। তারা আরো কয়েকজন অবাঙালিকে আটক করে বন্দুকের মুখে নদীর তীরে নিয়ে যায়। পরবর্তীতে আমি জানতে পেরেছিলাম

www.pathagar.com

যে, নদীর তীরকে বধ্যভূমি হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছিল। আমি আমার ফুলে যাওয়া হাঁটুর শুশ্রুষা করছিলাম। ঠিক সে সময় আমাদের সামনের দরজায় একটি অশুভ টোকা শুনতে পাই। আমি খুলতে বিলম্ব করায় আক্রমণকারীরা দরজায় গুলি করে। আমি দরজা খুলে দিলে তাদের চারজন আমার প্রতি অগ্নিদৃষ্টিতে তাকায়। তাদের একজন বলে উঠলো, 'আইনজীবীর মেয়েরা কোথায়?' আমি তাদেরকে জানাই যে, তার মেয়েরা আমাদের বাসায় নেই। তারা গোটা বাড়ি তছনছ করে এবং মূল্যবান সবকিছু লুট করে। এমনকি আমাদের বাড়ির টেবিলক্লথ পর্যন্ত। তবে আল্লাহকে ধন্যবাদ যে, তারা কলাপাতায় আচ্ছাদিত ট্যাংকের প্রতি তাকায়নি। সেখানেই আইনজীবীর দু'মেয়েকে লুকিয়ে রেখেছিলাম। আমি শক্ত করে দরজায় তালা লাগাই। বাইরে থেকে কেউ যাতে দ্রুত সেখানে পৌঁছতে না পারে সেজন্য আমি ট্যাংকের সামনে একটি আলমারি ও দু'টি বড় টেবিল পেতে রাখি।...

'রাতে আমি হামাগুড়ি দিয়ে পানির ট্যাংকের কাছে যেতাম এবং মেয়েদের কাছে পানি ও ভাত পৌঁছে দিতাম। তারা ধৈর্যের সঙ্গে দুর্ভোগ সহ্য করে এবং পুরো এক সপ্তাহ এভাবে কাটিয়ে দেয়। ১০ এপ্রিল পাকিস্তানি সৈন্যরা 'আল্লাহু আকবর' ধ্বনি দিয়ে আমাদের বাড়িতে প্রবেশ করে আমাদের উদ্ধার করে। আত্মগোপন অবস্থা থেকে বের হওয়ার পর মেয়ে দু'টিকে ভূতের মতো দেখাচ্ছিল। ঠিক তখন আমার দু'ছেলে আমাদের সঙ্গে যোগ দেয়। পাকিস্তানি সৈন্যরা আমার স্বামী এবং মেয়েদের পিতা ও তার চাচাকে গোটা শহরে তন্ন তন্ন করে খুঁজতে আমাদের সহায়তা করে। কিন্তু তাদের কোনো চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায়নি। দৃশ্যত মনে হলো বাঙালি বিদ্রোহীরা তাদেরকে নদীর তীরে কসাইখানায় হত্যা করেছে। আমরা পাকিস্তানি সৈন্যদের আমাদের বাড়ি লুণ্ঠনকারীদের বিস্তারিত তথ্য প্রদান করি। এসব লুণ্ঠনকারী দিনাজপুর থেকে ভারতে পালিয়ে যায়।...'

(৯০) **নব্বইতম সাক্ষীর বিবরণ:** ৩০ বছরের জেবুন্নিসা ১৯৭১ সালে দিনাজপুরে অবাঙালি হত্যাকাণ্ডে তার স্বামী আবদুল আজিজ, তার পুত্র ও একমাত্র ভাইকে হারান। তিনি তার সাক্ষ্যে বলেছেন:

'২৩ মার্চ আওয়ামী লীগের জঙ্গিরা আমাদের এলাকায় কারফিউ জারি করে এবং তথাকথিত শান্তি কমিটির একটি বৈঠকে যোগদানে সকল অবাঙালি পুরুষকে নির্দেশ দেয়। একদল সশস্ত্র ব্যক্তি আমাদের বাড়িতে এসে আমার স্বামী ও পুত্রকে তাদের সঙ্গে যাবার নির্দেশ দেয়। আমাদের সন্দেহ হয়েছিল যে, শান্তি কমিটির বৈঠক একটি অজুহাত মাত্র। অবাঙালিদের অপহরণে বিদ্রোহীরা এ অজুহাতের আশ্রয় নিয়েছিল। বিদ্রোহীরা ছিল সুসজ্জিত। আর আমরা ছিলাম অসহায়। আমি আমার স্বামী ও পুত্রকে আর কখনো দেখিনি।

'২৬ মার্চ বিদ্রোহীরা আমার ভাইয়ের খোঁজে ফের আমাদের বাসা আক্রমণ করে। জঙ্গলে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করার সময় তারা তাকে ধরে ফেলে। আমার বিস্মিত চোখের সামনে তাদের একজন খুব কাছ থেকে তার বুকে গুলি চালায়। সে মাটিতে পড়ে গিয়ে পানি চায়। আমি এক গ্লাস পানি নিয়ে তার কাছে ছুটে যাই। একজন বিদ্রোহী আমার হাত থেকে পানির গ্লাস কেড়ে নিয়ে তার মাথায় আরেকটি গুলি করে। আমার ভাই মারা যায় এবং তার প্রাণহীন দেহ থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত বের হচ্ছিল। আমার দুই প্রতিবেশী বয়স্ক অবাঙালি মহিলা আমাকে কবর খুঁড়তে সহায়তা করেন। সেই কবরে আমি আমার ভাইকে দাফন করি।...

www.pathagar.com

'৩০ মার্চ বিদ্রোহীরা আবার আমার বাড়ি তছনছ করে। অস্ত্রের মুখে তারা আমাকে আমার অলঙ্কার বের করে দিতে বলে। আমি তাদেরকে জানাই যে, আমার কোনো অলঙ্কার নেই। একথা বলায় তারা আমাকে একদল অবাঙালি মহিলা ও শিশুর সঙ্গে নদীর তীরে যেতে বাধ্য করে। একজন অসহায় মহিলা তার বগলে পবিত্র কোরআন লুকিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন। একজন বন্দুকধারী তার কাছ থেকে কোরআন কেড়ে নিয়ে মাটিতে ফেলে দেয়। আমরা বধ্যভূমিতে পৌঁছি এবং হত্যার জন্য সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করানো শত শত অবাঙালিকে দেখতে পাই। গভীর রাতে হত্যাযজ্ঞ চালানো হতো। এ দৃশ্য ছিল নারকীয়। মনে হলো নির্দোষ মানুষের রক্তে নদী লাল হয়ে গেছে। বাঙালি বিদ্রোহীরা বহু বন্দির মাথা দ্বিখণ্ডিত করে। আমরা তাদের ছিন্ন মস্তক দেখেছি। পানিতে ভাসিয়ে দেয়ার জন্য রক্ষিত নদীর তীরে শত শত মৃতদেহ দেখেছি। পরদিন আমাদের গ্রুপের মৃত্যুর সকল আয়োজন যখন সম্পন্ন ঠিক তখন একদল পাকিস্তানি সৈন্যকে দিগন্তে দেখা যায়। পাকিস্তানি সৈন্যদের দেখে বন্দুকধারীরা ভয়ে পালিয়ে যায়। আল্লাহ আমাদের দোয়া কবুল করেছিলেন। আমরা বেঁচে যাই। পাকিস্তানি সৈন্যরা আমাদেরকে একটি ত্রাণ শিবিরে স্থানান্তর করে। ত্রাণ শিবিরে খুব ভালোভাবে আমাদের যত্ন করা হয়। কিন্তু ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর মুক্তিবাহিনী দিনাজপুরের নিয়ন্ত্রণ লাভ করলে আমরা আবার সন্ত্রাসের শিকার হই। আমার মতো শত শত অবাঙালি বিধবা মহিলাকে হাঁটিয়ে সৈয়দপুরে নিয়ে যাওয়া হয়। আমাদেরকে জানানো হয় যে, রেডক্রস আমাদের জন্য ত্রাণ শিবির খুলবে এবং আমাদেরকে হামলা থেকে রক্ষা করবে। সোয়া দু'বছর আমরা চরম দারিদ্র্যের সঙ্গে বসবাস করেছি। বহু অসহায় মহিলা মারা যায়। ১৯৭৪ সালের জানুয়ারিতে আমি পাকিস্তানে প্রত্যাবাসন করি।'

দিনাজপুর শহরে হত্যাকাণ্ডের প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন যে, ১৯৭১ সালে মার্চের দ্বিতীয় সপ্তাহ এবং এপ্রিলের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যবর্তী সময়ে বোঁচাগঞ্জ, পীরগঞ্জ, চরকাই, রানীশংকৈল, ফুলবাড়ি, কাহারুল, বীরগঞ্জ, পঞ্চগড় ও চিরিরবন্দরে বসবাসকারী অধিকাংশ অবাঙালিকে নির্মূল করে দেয়া হয়। পাকিস্তান সেনাবাহিনী এসব শহরে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ কায়েম করলে বাঙালি বিদ্রোহীরা প্রতিবেশী ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের নিরাপদ ঘাঁটিতে পালিয়ে যায়। এ অভিযোগের পক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেছে যে, ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলসের বিদ্রোহীরা ভারত থেকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ সহায়তা ও দিকনির্দেশনা পেয়েছিল। একজন ব্রিটিশ তরুণ টেকনিশিয়ান হিলিতে পাক-ভারত সীমান্ত অতিক্রম করেন। তার উদ্ধৃতি দিয়ে ১৯৭১ সালের ৬ এপ্রিল দ্য টাইমস অব লন্ডনের এক রিপোর্টে বলা হয়:

'তিনি বলেছেন যে, এককভাবে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় শহর দিনাজপুরে শত শত অবাঙালি মুসলমান নিহত হয়েছে। সৈন্যরা বিদায় নেয়ার পর বিদ্রোহী জনতা ভারতের বিহার থেকে আগত অবাঙালি মুসলমানদের ওপর হামলা চালায়। কতজন নিহত হয়েছে তা তিনি জানেন না। তিনি সারারাত শহরে আর্তচিৎকার শুনেছেন। তিনি আরো জানান, এ অঞ্চলের অন্যান্য স্থানেও বিহারীদের আটক করা হয় এবং জিম্মি হিসেবে বন্দি রাখা হয়।...'

প্রত্যক্ষদর্শীরা আরো জানিয়েছে, মুষ্টিমেয় ধার্মিক বাঙালি মুসলমান অবাঙালিদের আশ্রয় দিয়েছিলেন। ১৯৭১ সালের মার্চে বিদ্রোহীরা এসব বাঙালি মুসলমানকে চিহ্নিত করে শাস্তি

www.pathagar.com

দেয়। ১৯৭১ সালে ডিসেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে ভারতের কাছে পূর্ব পাকিস্তানের পতন ঘটার পর হাজার হাজার পাকিস্তানপন্থী বাঙালিকে কারাগারে পাঠানো হয়। মুক্তিবাহিনী ও সদ্য গঠিত পুলিশ বাহিনী তাদের অনেকের ওপর নির্যাতন চালায়। ১৯৭১ সালে ডিসেম্বরের দ্বিতীয় পক্ষকালে এবং ১৯৭২ সালের প্রথমার্ধে মুক্তিবাহিনী ও তাদের সমর্থকরা দিনাজপুরে শত শত অবাঙালিকে হত্যা করে। তদানীন্তন পশ্চিম জার্মানির বহুল প্রচারিত ম্যাগাজিন স্টার্ন অব হামবুর্গের প্রতিনিধি হের ব্রাউম্যান ১৯৭২ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারি বিমানে ঢাকা থেকে দিনাজপুরে উড়ে যান এবং একটি অগভীর গর্তে ৮০ থেকে ১০০ জন বিহারীর লাশ ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকতে দেখেন। অন্যদিকে দিনাজপুরের বাঙালি জেলা প্রশাসক দাবি করছিলেন যে, এসব লাশ পাকিস্তান সেনাবাহিনীর গুলিতে নিহত বাঙালিদের। লাশগুলো তাজা থাকায় জেলা প্রশাসকের দাবি সম্পর্কে ব্রাউম্যান সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন। ১৯৭২ সালের ১২ মার্চ স্টার্ন ম্যাগাজিনে ব্রাউম্যান প্রেরিত এক রিপোর্টে বলা হয়:

> 'সামান্য পচন ধরায় মনে হয় না যে, গণকবরের লাশগুলো বাঙালিদের বরং এসব লাশ একমাত্র বিহারীদের হতে পারে।'

দিনাজপুরে মুক্তিবাহিনীর কমান্ডার মোহাম্মদ খোরশেদ পাকিস্তানি সৈন্যদের গুলিতে নিহত একজন মুক্তিযোদ্ধার স্মরণে নির্মিত একটি স্মৃতিস্তম্ভের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে হত্যা করার জন্য সৈয়দপুরের একটি পল্লী থেকে এক ডজন বিহারীকে আটক করেন। ব্রাউম্যানের রিপোর্টে তার বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশ করা হয়।

www.pathagar.com

অষ্টম অধ্যায়

পার্বতীপুরে হত্যাযজ্ঞ

(৯১) একানব্বইতম সাক্ষীর বিবরণ: ৪২ বছরের আজিজুল্লাহ আনসারি ছিলেন একজন স্কুল শিক্ষক। তিনি ১৯৭১ সালের মার্চে তার স্ত্রী ও দু'সন্তানকে হারান। তার মতে, পার্বতীপুরে ১৯৭১ সালের মার্চ-এপ্রিলে প্রায় ৩ হাজার অবাঙালি তাদের জীবন হারায়। আজিজুল্লাহ আনসারি পার্বতীপুর মডেল হাই স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। তিনি জানান যে, তার শহরে ১৯৭১ সালের আগে তিনি চিন্তাও করতে পারেননি যে, অবাঙালিরা গণহত্যার শিকার হবে। তার জীবনের এ ট্রাজেডির পর তিনি এক বছর ঢাকায় অবস্থান করেন। ১৯৭৩ সালের ডিসেম্বরে তিনি করাচিতে প্রত্যাবাসন করেন। আজিজুল্লাহ আনসারি তার সাক্ষ্যে বলেছেন:

> 'আওয়ামী লীগ ১৯৭১ সালে মার্চের শুরুতে অবাঙালিদের ভয়ভীতি দেখাতে শুরু করে। বহু অবাঙালি পার্বতীপুর রেলওয়ে স্টেশনে চাকরি করায় তাদের পরিবার-পরিজন রেলওয়ে কলোনিতে বসবাস করতো। এসব অবাঙালি বাঙালি বিদ্রোহীদের নির্যাতনের প্রধান লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়। যেসব অবাঙালি শহরের অন্যান্য এলাকায় গুচ্ছ গুচ্ছ ঘর-বাড়িতে বসবাস করতো তারাও সশস্ত্র বাঙালি দুস্কৃতকারীদের হয়রানির শিকার হয়।...
>
> '১৯৭১ সালে মার্চের শেষ সপ্তাহে আমার মনে হয় মাসের ২২ তারিখে আওয়ামী লীগের স্বেচ্ছাসেবক ও ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলসের বিদ্রোহীরা উন্মত্ত হয়ে উঠে এবং হত্যাকাণ্ড, অগ্নিসংযোগ, লুণ্ঠন ও অবাঙালি মহিলা ধর্ষণে লিপ্ত হয়। আমরা নির্দিষ্ট সময়ের আগে স্কুল বন্ধ করে দেই এবং ছাত্র-ছাত্রী বিশেষ করে বাঙালি ছাত্ররা বাড়ির পথে রওনা দেয়। আমি স্কুলের একজন কর্মচারীর কাছে জানতে পারি যে, একদল উন্মত্ত জনতা আমাদের এলাকায় চড়াও হয়েছে। এ খবর পেয়ে আমি বাড়ির উদ্দেশে দৌড়ে যাই। আমাদের এলাকায় এক ডজন অবাঙালি বসত ঘর ছিল। আমি বাড়ির কাছাকাছি হতেই আগুন দেখতে পাই। আরো কয়েকটি বাড়িও জ্বলছিল। বিস্মৃত মনে আমি বাড়িতে প্রবেশ করি। আমার স্ত্রী ও দু'শিশু সন্তানের দগ্ধ লাশ দেখে আমার পৃথিবী ভেঙ্গে খান খান হয়ে যায়। তারা ছিল প্রাণহীন। আমি তাদেরকে বাইরে নিয়ে আসি। ভেবেছিলাম তারা চোখ খুলবে। কিন্তু নাহ্, তাদের চোখ আর কোনোদিন খোলেনি। তাদের শরীর ছিল যেন ঝলসানো মাখনের মতো। সারারাত আমি তাদের লাশের ওপর কেঁদেছি। আমি প্রায় উন্মাদ হয়ে যাই। আগুন নিভে যায়। দু'টি রুমের একটি ছিল তখনো অক্ষত। আমি আমার স্ত্রী ও দু'সন্তানের লাশ অক্ষত রুমে অর্ধ ভস্মীভূত চাদরের নিচে রাখি। তাদেরকে কবর দেয়ার প্রশ্ন ছিল তখন অবান্তর। তাহলে বিদ্রোহীরা আমাকে দেখে ফেলতো। সেনাবাহিনী আমাকে উদ্ধার করার আগে আমি এক সপ্তাহের বেশি লাশের সঙ্গে কাটিয়েছি। আমার অস্তিত্বের একটি অংশ এখনো পার্বতীপুরে বিদ্যমান। আমার স্ত্রী ও দু'সন্তানকে সেখানে একটি কবরে দাফন করা হয়েছে।

www.pathagar.com

(৯২) **বিরানব্বইতম সাক্ষীর বিবরণ:** ৪৬ বছরের আবদুর রশীদ ছিলেন পার্বতীপুর রেলওয়ের একজন কর্মচারী। তিনি ১৫৩ নম্বর (উত্তর) রেলওয়ে কোয়ার্টারে বসবাস করতেন। ১৯৭১ সালের মার্চে ট্রেনে অবাঙালি হত্যাকাণ্ডের তিনি একজন সাক্ষী। আবদুর রশীদ, তার স্ত্রী ও সন্তানরা পার্বতীপুরে গণহত্যা থেকে বেঁচে যান। পূর্ব পাকিস্তানে ভারত বিজয়ী হলে তারা অবর্ণনীয় দুর্ভোগ পোহান। ১৯৭৩ সালের এপ্রিলে তারা নেপাল হয়ে করাচিতে এসে পৌঁছান। আবদুর রশীদ তার সাক্ষ্যে বলেছেন:

> '১২ মার্চ ১০ ঘন্টা বিলম্বে ঈশ্বরদী থেকে পার্বতীপুরে ট্রেন এসে পৌঁছায়। আওয়ামী লীগের একদল সশস্ত্র লোক মাঝপথে একটি স্টেশনে ট্রেন থামিয়ে বেশ কয়েকজন অবাঙালি যাত্রীকে হত্যা করায় ট্রেনটি বিলম্বে এসে পৌঁছায়। ১৭০ জন অবাঙালি পুরুষ, মহিলা ও শিশুর লাশ নিয়ে হতভাগ্য ট্রেনটি এসে পৌঁছার সময় আমি ছিলাম স্টেশনে। অধিকাংশ লাশ ছিল বীভৎস। ট্রেনে আরো ৭৫ জন আহত অবাঙালি ছিল। তাদের অনেকের অবস্থা ছিল গুরুতর। তাদেরকে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তবে তাদের মধ্যে বেঁচে যায় খুব কম লোক। ট্রেনে মৃতদেহের মধ্যে দুগ্ধপোষ্য শিশুও ছিল। মায়েদের সঙ্গে তারাও ছুরিকাঘাতে নিহত হয়। এ দৃশ্য ছিল হৃদয়বিদারক। এ স্মৃতি এখনো আমার মন থেকে মুছে যায়নি। এ ঘটনার পর অবাঙালিদের জন্য ট্রেনে চড়া বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়ায়। আরো কয়েকটি জায়গা থেকে অনুরূপ ঘটনার খবর পাওয়া যায়।

(৯৩) **তিরানব্বইতম সাক্ষীর বিবরণ:** ৪৫ বছরের আব্বাস আলী পার্বতীপুরে একজন স্কুল শিক্ষক হিসেবে চাকরি করতেন এবং নিউ রোডে একটি বাড়িতে বসবাস করতেন। ১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে আব্বাস আলী ঢাকা থেকে করাচিতে প্রত্যাবাসন করেন। তিনি বিশ্বাস করেন যে, আওয়ামী লীগের জঙ্গিরা পাকিস্তান, পাকিস্তান সরকার ও পশ্চিম পাকিস্তানি জনগণের বিরুদ্ধে মিথ্যাচারের মধ্য দিয়ে পার্বতীপুরের অধিকাংশ বাঙালিকে নিজেদের পক্ষে টানতে সক্ষম হয়। আব্বাস আলী তার সাক্ষ্যে বলেছেন:

> '১৯৭১ সালে মার্চের দ্বিতীয় সপ্তাহে আওয়ামী লীগের জঙ্গিরা অবাঙালিদের আতঙ্কিত করে তোলে। ১৯ মার্চ একদল সশস্ত্র লোক আমাদের এলাকার কাছাকাছি একটি এলাকায় বেশ কয়েকটি অবাঙালি বাড়ি আক্রমণ করে। তাদের কাছে ছিল স্টেনগান ও রাইফেল। তারা অবাঙালিদের বাড়ি লুট করে এবং কয়েকটি বাড়িতে আগুন দেয়। তারা কয়েকজন অবাঙালিকে হত্যা এবং বেশ কয়েকজন কিশোরীকে অপহরণ করে। আমি বিশ্বাস করি যে, আমাদের এলাকায় হামলাকারীদের অধিকাংশ ছিল বাঙালি হিন্দু। তারা যে বাংলায় কথা বলতো তার সঙ্গে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বাংলার মিল ছিল। বাঙালি বিদ্রোহীরা পর্যায়ক্রমে পার্বতীপুরে অধিকাংশ অবাঙালিকে হত্যা করে। এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে অবাঙালি হত্যাকাণ্ড চূড়ান্ত পর্বে পৌঁছে। সে সময় পাইকারীভাবে অবাঙালি হত্যা করা ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। আমাকে একটি বাঙালি পরিবার আশ্রয় দিয়েছিল। আমি তাদের সহযোগিতায় বেঁচে যাই।

(৯৪) **চুরানব্বইতম সাক্ষীর বিবরণ:** ৪০ বছরের ময়মুনিসা ১৯৭১ সালের মার্চে পার্বতীপুর হত্যাকাণ্ড থেকে রক্ষা পান। তিনি তার সাক্ষ্যে বলেছেন:

www.pathagar.com

'আমার স্বামী শাজিউদ্দিন রেলওয়ের চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি, আমি এবং আমাদের বয়স্ক পুত্র পার্বতীপুরে একটি জনাকীর্ণ এলাকায় নিজস্ব বাড়িতে বসবাস করতাম। ১৯৭১ সালে মার্চের তৃতীয় সপ্তাহে সশস্ত্র বাঙালিদের একটি বিরাট দল আমাদের বাড়িতে হামলা চালায় এবং লুট করে। ভাগ্যক্রমে আমার স্বামী ও পুত্র ছিল শহরের বাইরে। বিদ্রোহীরা আমাকে বাড়ি ত্যাগের হুকুম দেয় এবং বাড়িটি পুড়িয়ে দেয়। অসহায় দৃষ্টিতে আমি আমার বাড়ি ভস্মীভূত হতে দেখি। একজন প্রতিবেশী আমাকে আশ্রয় দেয়। সেনাবাহিনী পার্বতীপুরে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার পর আমার স্বামী ও পুত্র ভস্মীভূত বাড়িতে ফিরে আসে। এপ্রিলের মাঝামাঝি আমরা আমাদের বাড়ি পুনঃনির্মাণ করি এবং আবার আমরা বাস করতে শুরু করি। আমার ছেলে মোহাম্মদ আলী পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে যোগদান করে। সীমান্ত এলাকায় সে নিয়োগ পায়। আমরা তাকে নিয়ে গর্ব করতাম।

'১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর ঢাকায় পাকিস্তান সেনাবাহিনী আত্মসমর্পণ করার পর সশস্ত্র বাঙালিরা আবার পার্বতীপুরে হত্যাযজ্ঞে লিপ্ত হয়। সৈয়দপুরে আমাদের কিছু আত্মীয় স্বজন ছিল। আমরা সেখানে পালানোর সিদ্ধান্ত নেই। আমার স্বামী আমাকে ১৭ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় সৈয়দপুর অভিমুখী একটি ট্রেনে তুলে দেন। তিনি আমাকে জানান যে, তিনি পরদিন আসবেন। রেলওয়েতে তার একজন সাবেক বাঙালি সহকর্মী তার বাড়িতে রাতে তাকে আশ্রয় দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। পরদিন আমি সৈয়দপুর রেলওয়ে স্টেশনে তার একজন পুরনো বন্ধুর কাছে শুনতে পাই যে, একদল বিদ্রোহী তাকে পার্বতীপুর রেলওয়ে স্টেশনে ধরে ফেলে টুকরো টুকরো করে হত্যা করে। আমি চরম দরিদ্র অবস্থায় সৈয়দপুরে বসবাস করি এবং দু'বছর দুর্ভোগ পোহাই। আমি সেনাবাহিনীতে আমার পুত্রের খোঁজে রেডক্রসের কাছে চিঠি লিখি। কিন্তু আমি তার কোনো খোঁজ পাইনি। ১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে আমি করাচিতে প্রত্যাবাসন করি।'

(৯৫) **পঁচানব্বইতম সাক্ষীর বিবরণ:** ৫০ বছরের সিতারা বানুর স্বামী আবদুল কাদির ১৯৭১ সালের মার্চে পার্বতীপুরে একটি স্টোরের মালিক ছিলেন। সিতারা বানু তার সাক্ষ্যে বলেছেন:

'১৯৭১ সালের মার্চে পার্বতীপুরে হত্যাযজ্ঞের সময় আমার স্বামী, আমার পুত্র, আমার কিশোরী কন্যা এবং আমি আমাদের এলাকায় হামলার পূর্বক্ষণে শহর থেকে পালিয়ে যাই। আমার স্বামীর দোকান লুট করা হয় এবং আমাদের বাড়ি পুড়িয়ে দেয়া হয়। সেনাবাহিনী নিয়ন্ত্রণ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করলে আমরা আবার শহরে ফিরে আসি। আমরা আমাদের বাড়ি ও দোকান পুনঃনির্মাণ করি। আমার ছেলে কেরাণীর একটি চাকরি পায়। কিন্তু ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর ঢাকায় পাকিস্তান সেনাবাহিনী ভারতীয় সেনাবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করার পর মুক্তিবাহিনীর সমর্থক ও আওয়ামী লীগের লোকজন ফের অবাঙালি ও পাকিস্তানিপন্থী বাঙালি হত্যাকাণ্ডে মেতে উঠে। সন্ধ্যায় আমি জানতে পারি যে, বিদ্রোহী জনতা আমার স্বামী ও আমার পুত্রকে হত্যা করেছে। আমার কন্যা ও আমি সেদিন সন্ধ্যায় সৈয়দপুরের উদ্দেশে যাত্রা করি। আমরা একটি বাঙালি পরিবারে কাজ নেই। প্রায় প্রতি সপ্তাহে আমরা গুজব শোনতাম যে, মুক্তিবাহিনী জীবিত সকল অবাঙালি মহিলা ও শিশুকে হত্যা করবে। এ গুজব শুনতে পাওয়ায় আমরা আতঙ্কের মধ্যে বাস করতাম। ১৯৭২ সালে আমার মেয়ের বিয়ে হয়। সে পূর্ব পাকিস্তানের কোথাও আছে। আমি ১৯৭৪ সালের জানুয়ারিতে সৈয়দপুর থেকে ঢাকা হয়ে করাচিতে প্রত্যাবাসন করি।'

www.pathagar.com

প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনানুযায়ী আওয়ামী লীগের জঙ্গি কর্মী ও তাদের সশস্ত্র সমর্থকরা পার্বতীপুরে অবাঙালিদের বিরুদ্ধে হামলায় গ্রেনেড, হাল্কা মর্টার, মেশিনগান ও রাইফেল ব্যবহার করে। ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলসের বিদ্রোহীরা ছিল নিষ্ঠুর। তাদের লক্ষ্য ছিল পার্বতীপুরে বসবাসকারী ৪০ হাজার অবাঙালিকে নির্মূল করা। কিন্তু পাকিস্তান সেনাবাহিনী পৌঁছানোর আগে এক সপ্তাহ পর্যন্ত অবাঙালিরা প্রতিরক্ষা স্কোয়াড গঠন করে এবং বিদ্রোহী জনতাকে কোণঠাসা করে রাখে। বিদ্রোহী জনতার সংখ্যা কখনো কখনো ৫০ হাজারে পৌঁছতো। অবশেষে বিদ্রোহীরা বাঙালি এলাকায় বসবাসকারী অবাঙালিদের নিশ্চিহ্ন করে দেয়।

www.pathagar.com

নবম অধ্যায়

ঠাকুরগাঁয়ের হিলিতে হত্যাযজ্ঞ

১৯৭১ সালে মার্চের মাঝামাঝিতে আওয়ামী লীগের বিদ্রোহ দিনাজপুর জেলার ঠাকুরগাঁও শহরে অবাঙালি জনগোষ্ঠীর জীবনে অশুভ ছায়াপাত করে। এ মাসের শেষ সপ্তাহে অবাঙালিদের বিরুদ্ধে গণহত্যার বহ্নিশিখা জ্বলে উঠার আগে রাস্তায় ও অলিগলিতে বাঙালি গ্রুপগুলোর হাতে অবাঙালি যুবকদের প্রহৃত হওয়ার ঘটনা ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। পুলিশ আওয়ামী লীগের বিদ্রোহীদের পক্ষ নেয়।

১৯৭১ সালে মার্চের শেষ সপ্তাহ এবং এপ্রিলের এক পক্ষকালে ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলসের বিদ্রোহীরা আওয়ামী লীগের সঙ্গে যোগদান করে এবং অবাঙালিদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস ও হত্যাযজ্ঞ চালায়। এ বর্বর হত্যাযজ্ঞে প্রায় ৩ হাজার নির্দোষ মানুষ নিহত হয়। ঠাকুরগাঁয়ের অবাঙালি জনগোষ্ঠীর দুই-তৃতীয়াংশের বেশি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। তাদের ঘরবাড়ি লুণ্ঠিত হয়। বহু ঘরবাড়ি ভস্মীভূত হয়। হত্যাকারীরা পরিকল্পিতভাবে জ্বলন্ত ঘরবাড়িতে শত শত লাশ পুড়িয়ে ফেলে। অবাঙালি কিশোরীদের অপহরণ এবং যৌন নির্যাতন কেন্দ্রে ধর্ষণ ও নির্যাতন করা হয়। শহর ত্যাগ করার আগে বিদ্রোহীরা তাদের অধিকাংশকে হত্যা করে। কয়েকজন অন্তঃসত্ত্বা মহিলাকে বেয়নেট চার্জ করে হত্যা করা হয়। তাদের গর্ভজাত সন্তানগুলোকে লাঠি দিয়ে পিটিয়ে মেরে ফেলা হয়। কয়েক ডজন সুপরিচিত অবাঙালির মৃতদেহ রাস্তায় টানা হ্যাঁচড়া করা হয়। বাংলাদেশের পতাকার দণ্ডে বেঁধে তাদের ক্ষতবিক্ষত দেহ জনসমক্ষে প্রদর্শন করা হয়। ১৯৭১ সালের ১৫ এপ্রিল সেনাবাহিনী ঠাকুরগাঁয়ের নিয়ন্ত্রণ পুনরুদ্ধার করে।

(৯৬) **ছিয়ানব্বইতম সাক্ষীর বিবরণ:** ২১ বছরের মোহাম্মদ সোহেল তানভীর ঠাকুরগাঁও শহরের রহমতগঞ্জে তাদের নিজস্ব বাড়িতে পিতার সঙ্গে বসবাস করতো। সোহেলের নিহত পিতা তানভীর আহমদ রহমতগঞ্জ ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য হিসেবে বাঙালি-অবাঙালি নির্বিশেষে সবার সামাজিক উন্নয়নে নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন। সোহেল জানিয়েছে, অবাঙালিদের লাশ উদ্ধার এবং দাফনে সেনাবাহিনীর কয়েকদিন লেগেছিল। অবাঙালিদের ভস্মীভূত বাড়িতে মানুষের মাথার খুলি ও হাড়-হাড্ডির স্তূপ পাওয়া যায়। সে তার পিতৃ হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে বলেছে:

> 'আমার পিতা ছিলেন ঠাকুরগাঁয়ের একজন বিখ্যাত মুসলিম লীগ নেতা। তিনি দীর্ঘদিন মৌলিক গণতন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বাঙালি-অবাঙালি নির্বিশেষে প্রত্যেকে তাকে শ্রদ্ধা করতো। আমরা ১৮ বছরের বেশি ঠাকুরগাঁয়ে বাস করছিলাম এবং চমৎকার

www.pathagar.com

বাংলা বলতে পারতাম। আমার পিতা ব্যবসায়ে উন্নতি করেন এবং কিছু সম্পত্তি ক্রয় করেন। তিনি শহরের বহু দাতব্য প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করেছেন।...

'১৯৭১ সালে মার্চের শেষ সপ্তাহে ঠাকুরগাঁয়ে বসবাসকারী অবাঙালিদের হত্যা ও ধ্বংসের তাণ্ডবলীলা গ্রাস করে এবং কয়েক হাজার লোক নিহত হয়। আমার পিতা বাঙালি ও অবাঙালিদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব গড়ে তোলার চেষ্টা করছিলেন। তিনি মাগরেবের নামাজ আদায়ে আমাদের এলাকার প্রধান মসজিদে যান। তার সঙ্গে ছিলেন দু'জন অবাঙালি ও একজন বাঙালি বন্ধু। তারা মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় বাঙালি বিদ্রোহীরা তাকে এবং তার তিন বন্ধুকে হত্যা করে। তারা লাশগুলো মসজিদের ভেতর নিক্ষেপ করে এবং এলাকার অন্যান্য অবাঙালিকে হত্যা করে। আমি এবং আমার পরিবারের কয়েক সদস্য আমার পিতার এক ধার্মিক বাঙালি বন্ধুর সহযোগিতায় হত্যাযজ্ঞ থেকে রক্ষা পাই। ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে পূর্ব পাকিস্তানে ভারতীয়রা বিজয়ী হলে আমরা নেপালে পালিয়ে যাই। ১৯৭৪ সালের গোড়ার দিকে আমরা নেপাল থেকে করাচিতে প্রত্যাবাসন করি।'

(৯৭) **সাতান্নব্বইতম সাক্ষীর বিবরণ:** ৫০ বছরের আফজাল সিদ্দিকী ঠাকুরগাঁও হত্যাযজ্ঞে তার দু'পুত্র এবং এক কন্যা হারান। ১৯৪৭ সালে তিনি কলকাতা থেকে পূর্ব পাকিস্তানে অভিবাসন করেন এবং ষাট দশকের মাঝামাঝিতে ঠাকুরগাঁয়ে বসতি স্থাপন করেন। ১৯৭৪ সালে তিনি ঢাকা থেকে প্রত্যাবাসন করেন। একটি পরিত্যক্ত ও শুকনো পানির ট্যাংকে লুকিয়ে তিনি ১৯৭১ সালে মার্চের হত্যাযজ্ঞ থেকে রক্ষা পান। পানির ট্যাংকটি ছিল রহমতগঞ্জে তার বাড়ির কাছে। আফজাল সিদ্দিকী তার সাক্ষ্যে বলেছেন:

'আমি গৃহস্থালী সামগ্রী বিক্রির একজন কমিশন এজেন্ট হিসেবে কাজ করতাম। আমার তিন সন্তানের জন্ম পূর্ব পাকিস্তানে। আমার বাঙালি স্ত্রী কয়েক বছর আগে মারা যায়। পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সত্ত্বেও আওয়ামী লীগের লোকজন আমাদেরকে বিহারী বলতো।...

'১৯৭১ সালে মার্চের শুরু থেকে আওয়ামী লীগের জঙ্গি সমর্থকরা ঠাকুরগাঁয়ে অবাঙালিদের নিগৃহীত ও ভয়ভীতি প্রদর্শন করতো। কিন্তু মার্চের শেষ সপ্তাহে সন্ত্রাসীরা হামলা শুরু করে এবং ঠাকুরগাঁয়ের অধিকাংশ অবাঙালিকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়। সন্ত্রাসীরা আমার বাড়িতে হামলা এবং লুটতরাজ চালানোর সময় আমি ছিলাম বাইরে। সন্ত্রাসীরা আমার দু'পুত্রকে হত্যা করে এবং কিশোরী কন্যাকে অপহরণ করে। আমি ফিরে এসে দেখি আমার বাড়ি জ্বলছে। আমার দু'পুত্রের লাশ দরজায় পড়ে রয়েছে। আমি জানতাম যে, সন্ত্রাসীরা তখন নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত। আমার খোঁজে তারা ফিরে আসবে, এ আশংকায় আমি একটি শুকনো পানির ট্যাংকে লুকাই। পানির ট্যাংকে ছিল একটি বিরাট গর্ত। আমি গর্তে প্রবেশ করি এবং পাতা দিয়ে তা ঢেকে দেই। সেনাবাহিনী বিদ্রোহীদের হটিয়ে দেয়া নাগাদ এক পক্ষকাল এ গর্ত ছিল আমার গোপন আশ্রয়স্থল।...'

ঠাকুরগাঁয়ের প্রত্যক্ষদর্শীদের হিসেব অনুযায়ী ১৯৭১ সালের মার্চ-এপ্রিলে সংঘটিত হত্যাযজ্ঞে এ শহরের ৯ হাজার অবাঙালির মধ্যে মাত্র ১৫০ জন জীবিত ছিল। সেনাবাহিনীর একজন অবাঙালি মেজর আনুমানিক এক হাজার বাঙালি বিদ্রোহীকে ৭২ ঘন্টার বেশি কোণঠাসা করে রেখেছিলেন। তার গোলাগুলি ফুরিয়ে গেলে তিনি বেয়নেট নিয়ে লড়াই

www.pathagar.com

করেন এবং বীরের মৃত্যুবরণ করেন। বিদ্রোহী জনতা তার স্ত্রী ও সন্তানদের হত্যা করে এবং বিজয়ের প্রতীক হিসেবে তাদের লাশের প্রদর্শনী করে। স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ, স্থানীয় প্রশাসন প্রধানের পুত্র এবং অর্ধ ডজন পুলিশ কর্মকর্তা আক্রমণকারী জনতার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

হিলি

১৯৭১ সালে মার্চের দ্বিতীয় পক্ষকাল এবং এপ্রিলের তৃতীয় সপ্তাহে দিনাজপুর জেলার যেসব শহরে অবাঙালিদের নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হয় হিলি, ফুলবাড়ি, জামালগঞ্জ, পঞ্চগড় ও চরকাই ছিল তাদের অন্যতম। এ পাঁচটি শহরে অবাঙালিদের মৃত্যুর সংখ্যা ছিল তিন থেকে চার হাজার। ১৯৭১ সালের ৬ এপ্রিল দ্য টাইমস অব লন্ডনের এক রিপোর্টে বলা হয়:

> 'উপমহাদেশ বিভক্তির সময় বঙ্গদেশে বসতি স্থাপনকারী অসহায় হাজার হাজার মুসলিম শরণার্থীকে গত সপ্তাহে ক্রুদ্ধ বাঙালিরা হত্যা করেছে। সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে প্রবেশকারী বিহারী মুসলিম শরণার্থী এবং হিলিতে পাক-ভারত সীমান্ত অতিক্রমকারী একজন তরুণ ব্রিটিশ টেকনিশিয়ান আজ এ হত্যাযজ্ঞের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। ব্রিটিশ টেকনিশিয়ান বলেছেন যে, এককভাবে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় দিনাজপুর শহরে শত শত অবাঙালি মুসলমান মারা গেছে।'

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলসের বিদ্রোহী এবং আওয়ামী লীগের সশস্ত্র স্বেচ্ছাসেবকরা অধিকাংশ অবাঙালি হত্যাকাণ্ড পরিচালনা করে। দিনাজপুর ও পার্বতীপুরে বাঙালি বিদ্রোহীরা যেভাবে হত্যাকাণ্ড, লুট ও অগ্নিসংযোগ করে হিলিতেও একই কায়দায় অবাঙালি নিধন করা হয়। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অগ্রযাত্রার মুখে ভারতীয় সীমান্তে নিরাপদ ঘাঁটিতে পিছু হটার সময় বিদ্রোহীরা বহু অবাঙালি কিশোরীকে সঙ্গে করে নিয়ে যায়। বিদ্রোহীরা দিনাজপুর এবং এ জেলার অন্যান্য স্থান থেকে এসব কিশোরীকে অপহরণ করেছিল। বেশ কিছুদিন সীমান্ত শহর হিলি ছিল ভারতে বাঙালি বিদ্রোহীদের পলায়নের মূল রুট। বন্দি কিশোরীদের মধ্যে কয়েকজন ছিল পাঞ্জাবী ও পাঠান পরিবারের সদস্য। এসব হতভাগ্য কিশোরীর কেউ কেউ পশ্চাদপসণকারী বিদ্রোহীদের কব্জা থেকে পালানোর দুঃসাহসী ও মরিয়া উদ্যোগ নেয়। কিন্তু হিলিতে বিদ্রোহীরা মেশিনগানের গুলিতে তাদের হত্যা করে। হিলি দখলে রাখার সময় বিদ্রোহীরা ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর কাছ থেকে সহায়তা এবং ভারতীয় পৃষ্ঠপোষকদের কাছ থেকে অস্ত্র ও গোলাবারুদ সরবরাহ লাভ করেছিল। ফুলবাড়ি, পঞ্চগড়, জামালগঞ্জ ও চরকাইয়ে অবাঙালি পরিবারগুলোকে নিষ্ঠুর এবং পাইকারীভাবে হত্যা করা হয়। বিহার বংশোদ্ভূত কতিপয় অবাঙালি বিদ্রোহীদের মৃত্যুর ফাঁদ থেকে পালাতে এবং ভারত সীমান্ত অতিক্রমে সফল হয়। ভারতীয় সেনাবাহিনী ও পুলিশ তাদের আটক করে। তাদের অনেকে ভারতের কারাগারগুলোতে বন্দি জীবন-যাপন করে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা আরো জানিয়েছেন, ১৯৭১ সালের মার্চ-এপ্রিলের হত্যাযজ্ঞ থেকে পঞ্চগড় শহরে বসবাসকারী ৫ হাজার অবাঙালির মধ্যে ৫ শতাংশের বেশি রক্ষা পায়নি।

www.pathagar.com

আওয়ামী লীগের ক্যাডার, ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলসের বিদ্রোহী এবং ভারতীয় অনুপ্রবেশকারীরা পঞ্চগড়ে অবাঙালি হত্যাকাণ্ড চালায়। পূর্ব পাকিস্তান শরণার্থী এসোসিয়েশনের সভাপতি দেওয়ান ওয়ারেসাত হোসেন ১৯৭১ সালের ২০ জুন ঢাকায় ব্রিটিশ সংসদীয় প্রতিনিধি দলের কাছে পেশকৃত এক স্মারকলিপিতে হিসেব দিয়েছেন যে, দিনাজপুর জেলার বীরগঞ্জ, মানিকপাড়া, সেতাবগঞ্জ, দেবীগঞ্জ ও নলডাঙ্গায় ভারত থেকে আগত ৫০ হাজারের বেশি মুসলিম শরণার্থীর মধ্যে মাত্র ১৫০ জন ১৯৭১ সালের মার্চ-এপ্রিলের গণহত্যা থেকে রক্ষা পেয়েছে। তার হিসেব অনুযায়ী দিনাজপুর জেলায় এক লাখের বেশি অবাঙালিকে হত্যা করা হয়।

www.pathagar.com

দশম অধ্যায়

লাকসাম ও রাজবাড়িতে নরহত্যা

(৯৮) **আটান্নব্বইতম সাক্ষীর বিবরণ:** ৫৯ বছরের মাসুম আলীর ২৬ বছরের পুত্র লাকসামে পূর্ব পাকিস্তান রেলওয়েতে একজন টিকিট চেকার হিসেবে চাকরি করতেন। হত্যাযজ্ঞে এ ছেলে নিহত হয়। মাসুম আলী ১৯৭৪ সালে ঢাকা থেকে করাচিতে প্রত্যাবাসন করেন। তিনি তার সাক্ষ্যে বলেছেন:

> 'লাকসামে বসবাসকারী অবাঙালিদের অধিকাংশ ছিল রেলওয়ের কর্মচারী। ১৯৪৭ সালে উপমহাদেশ বিভক্তিকালে পূর্ব পাকিস্তানে চাকরি করার ইচ্ছা প্রকাশ করে তাদের বেশি-রভাগ এসেছিল ভারতের বিহার ও পশ্চিমবঙ্গ থেকে।...
>
> 'লাকসামে বসবাসকারী অবাঙালিদের সংখ্যা এক হাজারের বেশি ছিল না। তাদের মধ্যে কিছু ছিল পশ্চিম পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত পরিবার। বাঙালিরা আমাদের সবাইকে বিহারী হিসেবে সম্বোধন করতো। আওয়ামী লীগ বিদ্রোহ করায় ১৯৭১ সালে মার্চের প্রথম সপ্তাহ থেকে লাকসামে চরম উত্তেজনা বিরাজ করছিল এবং অবাঙালিরা আতঙ্কিত ছিল। পুলিশ বাহিনী অবাঙালিদের নিরাপত্তার ব্যাপারে ছিল পুরোপুরি নিষ্ক্রিয়। তারা গুণ্ডাদের হাত থেকে অবাঙালিদের উদ্ধারে আগ্রহী ছিল না।...
>
> '১৯৭১ সালের ১৯ মার্চ রাতে প্রায় ৫০০ বাঙালি অস্ত্র সজ্জিত হয়ে রেলওয়ে কোয়ার্টারে হামলা চালায়। এসব কোয়ার্টারে অবাঙালি কর্মচারী ও তাদের পরিবার বসবাস করতো। হামলা ছিল এত আকস্মিক ও বেপরোয়া যে, আমরা পালানোর চিন্তা করার সময়ও পাইনি। একদল লোক আমাদের ঘরের দরজা ভেঙ্গে ফেলে এবং আমাদের সবার ওপর গুলি চালায়। কয়েক মিনিটের মধ্যে আমাদের বাড়ি একটি কসাইখানায় পরিণত হয়। তারা আমার পুত্র, তার চার সন্তান, আমার পুত্রবধূ এবং তার কিশোরী বোন ও ভাইকে হত্যা করে। একজন বন্দুকধারী আমার মাথায় আঘাত করলে আমি দু'দিন অজ্ঞান থাকি। ১৯৭১ সালের ১৬ এপ্রিল পাকিস্তান সেনাবাহিনী লাকসামের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করার পর আমার আপনজনদের দাফনের ব্যবস্থা করে। চার মাস আমি প্রলাপ বকতাম। আমি ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন দেখতাম। আমার হিসেব অনুযায়ী লাকসামে ১৯৭১ সালের মার্চে কমপক্ষে ৮০০ অবাঙালি নিহত হয়। আমার স্মৃতিতে এখনো লাকসাম রেলওয়ের ৯৩/এইচ নম্বর কোয়ার্টারের দেয়াল ও মেঝেতে তাজা রক্তের দাগ ভেসে উঠে। সেখানে আমার অসহায় চোখের সামনে আমার আপনজনদের হত্যা করা হয়। মনে হয় আমি যেন বেঁচে নেই।'

রাজবাড়ি

(৯৯) **নিরান্নব্বইতম সাক্ষীর বিবরণ:** ১৯৭১ সালের মার্চে রাজবাড়িতে ৪৬ বছরের হাফিজা বেগমের স্বামীকে হত্যা এবং তার দু'মেয়েকে অপহরণ করা হয়। তারপর তার ঠাঁই হয়

www.pathagar.com

ঢাকায় দুঃস্থ মহিলা ও শিশুদের জন্য নির্মিত রেডক্রসের একটি ত্রাণ শিবিরে। ১৯৭৪ সালের জানুয়ারিতে তিনি করাচিতে প্রত্যাবাসন করেন। এ নির্মম ট্রাজেডির বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। অশ্রুসজল চোখে তিনি তার সাক্ষ্যে বলেছেন:

> '১৯৭১ সালের মার্চে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে বাঙালি বিদ্রোহের আগে রাজবাড়িতে কখনো বাঙালি ও অবাঙালিদের মধ্যে কোনো বিরোধ কিংবা উত্তেজনা ছিল না। আমরা গনেশপুরে বসবাস করতাম। সেখানে ছিল অবাঙালিদের একগুচ্ছ বাড়ি। মার্চের শুরু থেকে আতংকজনক গুজব ভেসে বেড়াচ্ছিল। কিন্তু আমাদের বাঙালি বন্ধুরা আমাদেরকে আশ্বস্ত করে যে, রাজবাড়িতে অবাঙালিদের বিরুদ্ধে কোনো সহিংসতা হবে না।...
> '১৯৭১ সালের ১৯ মার্চ রাতে আমি আমাদের এক প্রতিবেশীর বাড়িতে বসা ছিলাম। এসময় একদল বাঙালি আমাদের এলাকা আক্রমণ করে। বিদ্রোহী জনতার 'জয় বাংলা' হুংকার এবং আক্রান্তদের আর্তচিৎকারে আকাশ-বাতাস কেঁপে উঠে। আমি আমার বাড়ির দিকে দৌড়ে যাই। পথে আমি বিদ্রোহী জনতাকে অবাঙালিদের বাড়ির দরজা ভাঙ্গতে এবং ছোরা, লোহার রড, বলম ও দা নিয়ে তাদের ওপর হামলা চালাতে দেখি। বাড়িতে প্রবেশ করে আমি তাদেরকে আমার স্বামীর ওপর হামলা করতে দেখতে পাই। আমার স্বামী তাদের প্রতিহত করার চেষ্টা করছিলেন। আমি আমার অবিবাহিত দু'মেয়ের চিৎকার শুনতে পাই। আমার মেয়েরা রান্নার হাড়িপাতিল ও লাঠি দিয়ে আক্রমণকারীদের হটিয়ে দেয়ার চেষ্টা করছিল। আমি তাদের সঙ্গে যোগ দেই। একজন আক্রমণকারী আমার মাথায় আঘাত করলে আমি মেঝেতে পড়ে যাই। পরদিন আমার জ্ঞান ফিরে এলে আমি আমার স্বামীকে আমার পাশে মৃত অবস্থায় দেখি। তার শরীরের সর্বত্র ছিল ছুরিকাঘাতের চিহ্ন। আমার গলা ও মাথার পেছনে তীব্র যন্ত্রণা হচ্ছিল। আমার মেয়েদের কোনো চিহ্ন নেই। আমার মেয়েরা যেখানে থাকতো আমি হামাগুড়ি দিয়ে সেখানে যাই। আমি ভাঙ্গা চুড়ি দেখতে পাই। রুমে তাদের রক্তমাখা পরিত্যক্ত শাড়ি। পাগলের মতো আমি বাড়ি থেকে বের হয়ে চিৎকার করে তাদের ডাকাডাকি করতে থাকি। আমি অবাঙালিদের বাড়িঘরে কাউকে জীবিত দেখতে পাইনি। আমাদের প্রতিবেশী এক আতঙ্কিত বাঙালি মহিলা আমাকে বাড়িতে পৌঁছতে সহায়তা করেন। তিনি আমাকে শব্দ না করার পরামর্শ দিয়ে বললেন, আমার গলার আওয়াজ পেলে বিদ্রোহীরা আমার খোঁজ পেয়ে যাবে। আমার স্বামীকে দাফন করা অসম্ভব হওয়ায় আমি আমাদের বাড়িতে একটি রুমের ভেতর খাটের নিচে তার রক্তরঞ্জিত লাশ রেখে দেই।...
> '১৯৭১ সালের এপ্রিলে পাকিস্তান সেনাবাহিনী রাজবাড়িতে নিয়ন্ত্রণ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করলে অন্যান্য নিহত অবাঙালির সঙ্গে আমার স্বামীকে স্থানীয় একটি গোরস্তানে চিরনিদ্রায় শায়িত করা হয়। কয়েকদিন আমি আমার অপহৃত মেয়েদের সন্ধানে গোটা রাজবাড়ি শহর তন্ন তন্ন করে খুঁজে বেড়াই। কিন্তু আমি তাদের খুঁজে বের করতে পারিনি। আমার ধারণা রাজবাড়িতে সেনাবাহিনী তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করার আগে বিদ্রোহীরা অসংখ্য অবাঙালি মেয়েকে অপহরণ এবং ধর্ষণ করে হত্যা করেছে।...
> 'আমার মেয়েদের ভাঙ্গা চুড়ি আমার জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ। আমার মেয়েদের আর কোনো স্মৃতি আমার কাছে নেই।'

(১০০) **একশোতম সাক্ষীর বিবরণ:** ৩৫ বছরের জরিনা খাতুন হলেন রাজবাড়ি গণহত্যা থেকে বেঁচে যাওয়া আরেক মহিলা। তার স্বামী তমিজউদ্দিন রাজবাড়িতে বিদ্যুৎ অফিসে

www.pathagar.com

চাকরি করতেন। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত তারা শান্তিতে বসবাস করছিলেন। ভারতীয় সেনাবাহিনীর কাছে পাকিস্তানি সৈন্যরা আত্মসমর্পণ করার পর মুক্তিবাহিনী অবাঙালিদের বিরুদ্ধে সহিংসতায় লিপ্ত হয়। এ পরিস্থিতিতে জরিনা খাতুন ও তার স্বামী তাদের আট মাসের শিশু পুত্রকে নিয়ে রাজবাড়ি থেকে গোয়ালন্দে পালিয়ে যান। গোয়ালন্দে রটনা শোনা যাচ্ছিল যে, রেডক্রস অবাঙালিদের রক্ষা করবে এবং তাদেরকে ত্রাণ শিবিরে আশ্রয় দেবে। বিদ্রোহীরা জরিনার অসহায় চোখের সামনে গোয়ালন্দ বাজারে তার স্বামীকে হত্যা করে। মুক্তিবাহিনী জরিনা ও তার দুগ্ধ পোষ্য শিশু পুত্রকে ফরিদপুর শহরে একটি কারাগারে নিক্ষেপ করে। এ কারাগারে তার মতো আরো শত শত অবাঙালি মহিলা ও শিশুকে আটক রাখা হয়েছিল। মুক্তির পর তিনি ফরিদপুরে এক বাঙালি ব্যবসায়ীর বাড়িতে গৃহপরিচারিকা হিসেবে কাজ নেন। ১৯৬৯ সালে তার স্বামী ফরিদপুর বিদ্যুৎ অফিসে ছয় মাস চাকরি করেছিলেন। ফরিদপুরে বসবাস করার সময় যেসব অবাঙালির সঙ্গে জরিনার পরিচয় হয়েছিল কিংবা তিনি যাদের চিনতেন তাদের কাউকে দেখতে পাননি। তাকে জানানো হয় যে, তাদের অধিকাংশকে হত্যা করা হয়েছে। জরিনা তার সাক্ষ্যে বলেছেন:

> 'ফরিদপুর কারাগারের অন্ধকার কুঠুরিতে জীবন ছিল মৃত্যুর চেয়ে নিষ্ঠুর। বহু মহিলা ক্ষুধা ও রোগ যন্ত্রণায় মৃত্যুবরণ করে। আমাদেরকে দিনে মাত্র একবেলা খাবার দেয়া হতো। চালে থাকতো কঙ্কর ভর্তি। অমানবিক পরিস্থিতির প্রতিবাদ করা হলে কারাগারের প্রহরীরা পেটাতো। ৬ মাস পর আরো কয়েকজন অবাঙালি মহিলার সঙ্গে আমাকে মুক্তি দেয়া হয়। আমাদেরকে কঙ্কালের মতো দেখাতো। ফরিদপুরে আমি একজন বাঙালি ব্যবসায়ীর বাড়িতে গৃহপরিচারিকা হিসেবে চাকরি পাই। এই বাঙালি ব্যবসায়ী একটি পশ্চিম পাকিস্তানি পরিবারের সম্পদ দখল করে ধনী হয়ে উঠেন। ফরিদপুর দখল করার সময় মুক্তিবাহিনী পশ্চিম পাকিস্তানি পরিবারকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিল। গৃহকর্তা আমাকে কোনো বেতন দিতেন না। বলতেন, তিনি আমাকে মুক্তিবাহিনীর হাত থেকে রক্ষা করছেন। এটাই আমার বেতন। আমি শুধু আমার শিশু সন্তানের জন্য বেঁচে থাকি। আমি গোয়ালন্দ বাজারে ঠাণ্ডা মাথায় আমার স্বামীকে হত্যা করার কথা কখনো ভুলবো না।...
>
> 'যেসব অবাঙালি পাকিস্তানে যেতে ইচ্ছুক রেডক্রস তাদের কাছ থেকে দরখাস্ত আহ্বান করে। আমি অবিলম্বে পাকিস্তানে প্রত্যাবাসনের আবেদন করি। ১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে জাতিসংঘ আমাকে বিমানে করে ঢাকা থেকে করাচিতে প্রত্যাবাসন করে।...'

www.pathagar.com

www.pathagar.com

একাদশতম অধ্যায়

কুষ্টিয়ায় নৃশংসতা

আওয়ামী লীগ ও ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলসের বিদ্রোহীরা ১৯৭১ সালে মার্চের প্রথম সপ্তাহে কুষ্টিয়া শহরে অবাঙালিদের বিরুদ্ধে সহিংসতায় লিপ্ত হয় এবং ১৬ এপ্রিল পর্যন্ত বিরতিহীনভাবে সহিংসতা অব্যাহত থাকে। সেদিন পাকিস্তান সেনাবাহিনী কুষ্টিয়ায় প্রবেশ করে। বিভিন্ন হিসেবে বলা হয়েছে, কুষ্টিয়া শহরে ২ হাজারের বেশি অবাঙালি নিহত হয়েছে। কুষ্টিয়া জেলার যেসব শহরে গণহারে অবাঙালিদের হত্যা করা হয় সেসব শহরের মধ্যে ছিল চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর ও জাফরকান্দি। এসব জায়গায় অবাঙালিদের মৃত্যুর সংখ্যা ছিল আড়াই হাজারের বেশি।

(১০১) **একশো একতম সাক্ষীর বিবরণ:** ৩৫ বছরের দুলারি বেগমের স্বামী মোহাম্মদ শফি ছিলেন রেলওয়ের একজন কর্মচারী। তারা কুষ্টিয়ার হার্ডিঞ্জ ব্রিজ কলোনির ১৩ নম্বর কোয়ার্টারে বাস করতেন। অশ্রুসিক্ত চোখে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে দুলারি বেগম বলেছেন:

> '২৩ মার্চ বাঙালি বিদ্রোহীরা নিরাপত্তার জন্য আমাদের আবাসিক কলোনির সকল অবাঙালিকে একটি স্কুল ভবনে একত্রিত হওয়ার নির্দেশ দেয়। তাদের হাতে শহরের নিয়ন্ত্রণ থাকায় এ নির্দেশ মেনে নেয়া ছাড়া আমাদের বিকল্প ছিল না। আমরা প্রবেশ করা মাত্র বিদ্রোহীরা স্কুল ভবন ঘেরাও করে। সন্ধ্যায় বন্দুক, ছোরা, শিকল ও বর্শা সজ্জিত হয়ে একদল লোক স্কুল ভবনে অবাঙালিদের ওপর আক্রমণ চালায়। একজন আক্রমণকারী আমার স্বামীর বুকে ছুরিকাঘাত করে। তিনি ঘটনাস্থলে নিহত হন। বিদ্রোহীরা ট্রাকে লাশ স্তূপ করে রাখে এবং লাশগুলো পদ্মা নদীতে নিক্ষেপ করে। কারো প্রাণ প্রদীপ তখনো নিভে না গেলেও সলিল সমাধি ঘটায় কারো পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব ছিল না। সারারাত হত্যাকাণ্ড অব্যাহত থাকে। অসহায় নর-নারীদের নির্যাতন করে বিদ্রোহীরা আনন্দ লাভ করে।...
>
> 'পরদিন সকালে বিদ্রোহীরা স্কুল ভবনের দরজা ও জানালায় পেট্রোল ছিটিয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়। আমিসহ শত শত বিধবা ভবনের তালাবদ্ধ গেট ভেঙ্গে বের হয়ে আসি। আমরা আমাদের বাড়ির দিকে দৌড়াতে থাকি। রাস্তায় বিদ্রোহীদের গুলিতে আমাদের কয়েকজন আহত হয়। আমি বাড়িতে তালা লাগিয়ে দেই। আমি আমার ৮ বছরের ছেলেকে একটি টেবিলের নিচে দেখতে পাই। আমার বাড়ি লুট করা হয়। কয়েকদিন পর একদল বিদ্রোহী আবার আমার বাড়ি আক্রমণ করে এবং আমার ছেলেকে অপহরণ করার চেষ্টা করে। কিন্তু অলৌকিকভাবে একদল পাকিস্তানি সৈন্য যথাসময়ে আমাদের কলোনিতে এসে পৌঁছে গেলে বিদ্রোহীরা পালিয়ে যায়। পাকিস্তান সেনাবাহিনী আমাকে এবং আমার ছেলেকে ঈশ্বরদীতে একটি শিবিরে স্থানান্তর করে। এ শিবিরে বিধবা ও এতিম শিশুরা আশ্রয় নিয়েছিল। আমার ছেলে ছাড়া আমার সব আত্মীয় সহিংসতার এ

www.pathagar.com

ঘূর্ণিঝড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে ভারতীয় সৈন্যদের কাছে পূর্ব পাকিস্তানের পতন ঘটলে আমার ছেলে এবং আমি আবার দুর্ভোগে পড়ি। ১৯৭৪ সালের জানুয়ারিতে আমরা করাচিতে প্রত্যাবাসন করি।'

(১০২) **একশো দুইতম সাক্ষীর বিবরণ:** ৩০ বছরের রাজ বিবির স্বামী নূর খান ছিলেন কুষ্টিয়ার মোহিনী মিলের গাড়ি ড্রাইভার। ১৯৭১ সালে ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে কুষ্টিয়ায় ভারতীয় বিমান বাহিনীর বোমাবর্ষণে রাজ বিবির মা নিহত হন। ১৯৭২ সালের গোড়ার দিকে মুক্তিবাহিনী তার স্বামীকে আরো বহু বিহারীর সঙ্গে কারাগারে নিক্ষেপ করে। পরে বিদ্রোহীরা তাদেরকে হত্যা করে। ১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে রাজ বিবি তার তিন বছরের কন্যাসহ করাচিতে প্রত্যাবাসন করেন। তিনি তার সাক্ষ্যে বলেছেন:

'১৯৭১ সালের ২৩ মার্চ রাইফেল ও মেশিনগান সজ্জিত বাঙালি বিদ্রোহীরা কুষ্টিয়ার মোহিনী মিলের কাছে আরওয়াপাড়া এলাকায় অবাঙালিদের বাড়িঘরে হামলা চালায়। এ এলাকায় আমরা একটি ভাড়া বাড়িতে বসবাস করতাম। বিদ্রোহীরা আগ্নেয়াস্ত্র সমর্পণে অবাঙালিদের নির্দেশ দেয়। এ নির্দেশ অনেকেই পালন করে। আমরা জানতে পারি যে, আগ্নেয়াস্ত্র মজুদ করার অভিযোগে কয়েকজন অবাঙালিকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। আমরা রাস্তায় অবাঙালিদের প্রহার করার অনেক সংবাদ পাই।'

'১৯৭১ সালের ৩০ মার্চ বাঙালি বিদ্রোহীদের একটি দল আমাদের বাড়িতে প্রবেশ করে। আমার স্বামী পেছনের দরজা দিয়ে ধান ক্ষেতে পালিয়ে যান। আমার ভাই ছিল শক্ত সমর্থ। সে অবিশ্বাস্য সাহসের সঙ্গে ছয় জন বিদ্রোহীর সঙ্গে লড়াই করে। সে রক্তাক্ত হলে আমার বৃদ্ধা মা তাকে রক্ষায় এগিয়ে যান। এসময় একজন বিদ্রোহী লাঠি দিয়ে তার মাথায় আঘাত করে। তিনি মাটিতে পড়ে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে যান। তার মাথা ফেটে রক্ত পড়তে থাকে। আর্তচিৎকার দিয়ে আমি আমার মায়ের কাছে ছুটে যাই। ইতোমধ্যে আমার ভাই কয়েকজন বিদ্রোহীকে আহত করে মাঠে পালিয়ে যায়। চারদিন আমি এবং আমার মা আমাদের লুট করা বাড়িতে অবস্থান করি। ৪ এপ্রিল আরেকদল বাঙালি বিদ্রোহী আমাদের এলাকা আক্রমণ করে এবং ৬০ জন অবাঙালিকে তাদের সঙ্গে যাবার নির্দেশ দেয়। তারা যেতে অস্বীকার করায় এবং প্রতিহত করার উদ্যোগ নেয়ায় এক ডজন সশস্ত্র বিদ্রোহী মেশিনগানের গুলিতে তাদের হত্যা করে। ১৬ এপ্রিল পাকিস্তান সেনাবাহিনী এসে পৌঁছানোর কয়েক ঘণ্টার মধ্যে আমার স্বামী ও আমার ভাই বাড়িতে ফিরে আসে। আমার ভাইয়ের আঘাত ছিল গুরুতর। চিকিৎসা সত্ত্বেও সে কয়েকদিন পর হাসপাতালে মারা যায়।'

(১০৩) **একশো তিনতম সাক্ষীর বিবরণ:** ৪০ বছরের রাছুলানের স্বামী মোহাম্মদ শাকুরকে বিদ্রোহীরা কারাগারে পাঠায় এবং পরে তাকে হত্যা করে। এ ব্যাপারে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে রাছুলান বলেন:

'১৯৭১ সালে মার্চের শেষ সপ্তাহে আওয়ামী লীগের সশস্ত্র লোকজন এবং বিদ্রোহী বাঙালি সৈন্যরা আমাদের এলাকায় অবাঙালি বসতি আক্রমণ করে এবং শত শত অবাঙালি পুরুষকে কুষ্টিয়া কারাগারে নিয়ে যায়। আমার বাড়িতে হামলা করে তারা আমার স্বামীকে ধরে নিয়ে যায়। আমার স্বামী টেলিগ্রাফ বিভাগে চাকরি করতেন।

www.pathagar.com

একজন বিদ্রোহী বললো, তারা তাকে কারাগারে পাঠাবে। আমি, আমার বৃদ্ধা মা এবং আমার দু'সন্তান তার জীবন ভিক্ষা দেয়ার জন্য তাদের অনুরোধ করি। কিন্তু তারা ছিল নিষ্ঠুর।...

'আমরা আমাদের বাড়ির দরজা-জানালা বন্ধ করে দেই এবং আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি। আমাদের খাদ্য ছিল খুব সামান্য। খাদ্যের দোকানগুলো অবাঙালিদের কাছে খাদ্য বিক্রি বন্ধ করে দেয়। বাঙালিদের মালিকানাধীন দোকানের সাইনবোর্ডে লিখা ছিল, 'বিহারীদের কাছে খাদ্য বিক্রি করবেন না।' আমি ও আমার বৃদ্ধা মা তিনদিন পানি পান করে জীবন রক্ষা করি। আমার দুই শিশু পুত্র ও এক কন্যা অসিদ্ধ চাল ও বাসী শাক-সবজি খেতো। আমরা বাঙালি বিদ্রোহীদের এ ধারণা দেয়ার চেষ্টা করছিলাম যে, আমাদের বাড়িতে কেউ জীবিত নেই। জরুরী পরিস্থিতিতে আমরা পালানোর একটি পথ আবিষ্কার করি।...

এপ্রিলের শুরুতে একদল বিদ্রোহী আমাদের দরজা ভেঙ্গে ফেলে। আমরা পেছনের দরজা দিয়ে একটি মাঠে পালিয়ে যাই। আতংক ও ভয়ে আমরা একটি গোলাবাড়িতে কয়েকদিন অবস্থান করি। গোলাবাড়ির চারদিকে ছিল মাটির বিরাট দেয়াল। সারাদিন গোলাগুলির আওয়াজ শোনা যেতো। বিদ্রোহীরা লোকজনকে হত্যায় ব্যস্ত ছিল। আমি আমার তৃষ্ণার্ত সন্তান ও মায়ের জন্য রাতে চুপি চুপি একটি পুকুর থেকে পানি আনতাম। পুকুরের পানি ছিল দূষিত। এ পানি দিয়ে আমরা আমাদের শুকনো গলা ভিজাতাম। পাকিস্তান সেনাবাহিনী এপ্রিলের মাঝামাঝি কুষ্টিয়ার নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করলে আমরা **'জয় বাংলা'র** পরিবর্তে **'পাকিস্তান জিন্দাবাদ'** ধ্বনি শুনতে পাই। আমরা আমাদের গোপন আশ্রয়স্থল থেকে বের হয়ে আসি। পাকিস্তান সেনাবাহিনী ছিল আমাদের প্রতি সহানুভূতিশীল। তারা আমার নিখোঁজ স্বামীকে খুঁজে বের করতে প্রাণপণ চেষ্টা করে। সেনাবাহিনী আমাকে জানায় যে, বিদ্রোহীরা যাদেরকে কারাগারে পাঠিয়েছিল তাদের সকলকে হত্যা করা হয়েছে।'

(১০৪) একশো চারতম সাক্ষীর বিবরণঃ ২২ বছরের সাঈদা খাতুন কুষ্টিয়ার থানাপাড়া এলাকায় তার স্বামী জাফর আলম মালিকের সঙ্গে বসবাস করতেন। এক বাঙালি পরিবারে আশ্রয় গ্রহণ করে তিনি মার্চে অবাঙালি গণহত্যা থেকে রক্ষা পান। সাঈদা খাতুন কয়েক মাস কুষ্টিয়ায় বসবাস করেন। ভারতের কাছে পূর্ব পাকিস্তানের পতন ঘটার ঠিক আগ মুহূর্তে তাকে ঢাকায় স্থানান্তর করা হয়। ১৯৭৩ সালের অক্টোবরে সাঈদা করাচিতে প্রত্যাবাসন করেন। তিনি তার সাক্ষ্যে বলেছেনঃ

'১৯৭১ সালের মার্চে বাঙালি বিদ্রোহীরা অবাঙালিদের কুষ্টিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করে। তাদের ওপর অকল্পনীয় পাশবিক নির্যাতন চালানো হয়। পাকিস্তান সেনাবাহিনী কুষ্টিয়ায় নিজেদের নিয়ন্ত্রণ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার পর আমি কয়েকজন ধার্মিক বাঙালির কাছ থেকে জানতে পারি যে, বাঙালি বিদ্রোহীরা আটক সকল অবাঙালি বন্দিকে হত্যা করেছে। বন্দিদেরকে অনাহারে রাখা হয় এবং জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তাদের পানি পান করতে দেয়া হয়নি। একজন প্রতিবাদ করেছিল। প্রতিবাদীকে টেনে হিঁচড়ে একটি অন্ধকার কুঠুরিতে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানে তাকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়। নির্যাতনকারীরা বন্দিদের উলঙ্গ করে পৈশাচিক আনন্দ লাভ করতো। জলন্ত সিগারেট দিয়ে তাদের উলঙ্গ শরীরে ছ্যাকা দিতো।...

www.pathagar.com

'১৯৭১ সালে মার্চের হত্যাকাণ্ডের আগে আমি যেসব মহিলাকে চিনতাম তাদের অধিকাংশের কোনো চিহ্ন ছিল না। তাদেরকেও হত্যা করা হয়। বিদ্রোহীরা কয়েকজন অন্তঃসত্ত্বা মহিলাকে অবর্ণনীয় নির্মমতার সঙ্গে হত্যা করে। বেয়নেট চার্জ করে তাদের জরায়ু ছিন্নভিন্ন করে দেয়া হয়। তাদের গর্ভজাত সন্তানকেও হত্যা করা হয়।...
'কুষ্টিয়া হাসপাতালে কয়েকজন আহত বাঙালি বিদ্রোহীর চিকিৎসা করা হয়। বিদ্রোহীরা তাদের হাতে আটক কয়েকজন বন্দিকে হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে বন্দুকের মুখে তাদেরকে আহত বাঙালিদের জন্য রক্ত 'দান' করতে বাধ্য করা হয়। আটককারীরা 'দাতাদের' নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কিন্তু তাদের প্রত্যেককে গুলি করে হত্যা করা হয়।...'

(১০৫) **একশো পাঁচতম সাক্ষীর বিবরণ:** ৩৩ বছরের মোহাম্মদ আলী ১৯৭১ সালের মার্চে কুষ্টিয়ায় আটকা পড়েন। পাবনায় একটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে তিনি চাকরি করতেন। অবাঙালিদের বিরুদ্ধে সহিংসতা শুরু হওয়ার সময় তিনি ব্যবসায়িক প্রয়োজনে কুষ্টিয়া গিয়েছিলেন। মোহাম্মদ আলী পূর্ব পাকিস্তানে জন্মগ্রহণ করেন এবং সেখানে বড় হন। এ ভূখণ্ডের সন্তান হিসেবে তিনি বাংলা বলতে পারতেন। মোহাম্মদ আলী বাঙালি সেজে একজন বাঙালি বন্ধুর বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এভাবে তিনি কুষ্টিয়ায় অবাঙালি হত্যাকাণ্ড থেকে রক্ষা পান। ১৯৭৩ সালের অক্টোবরে তিনি লাহোরে প্রত্যাবাসন করেন। মোহাম্মদ আলী তার সাক্ষ্যে বলেছেন:

'আমি আমার পাশের বাড়ি থেকে একটি সিন্ধি মেয়ের আর্তনাদ ও চিৎকার শুনেছি। সেখানে বাঙালি অপহরণকারীরা তাকে নির্যাতন এবং ধর্ষণ করছিল।'

www.pathagar.com

দ্বাদশ অধ্যায়

চুয়াডাঙ্গায় বর্বরতা

(১০৬) **একশো ছয়তম সাক্ষীর বিবরণ:** ৩৮ বছরের মোহাম্মদ হানিফ চুয়াডাঙ্গা রেলওয়ে স্টেশনে চাকরি করতেন। তিনি অলৌকিকভাবে হত্যাকাণ্ড থেকে রক্ষা পান। তিনি পূর্ব পাকিস্তানে ২২ বছর বসবাস করেন। অনর্গল বাংলা বলতে পারতেন। চুয়াডাঙ্গার মুরগি পট্টিতে তার বাড়ি ছিল। ১৯৭২ সালে তিনি নেপালে পালিয়ে যান। নেপাল থেকে তিনি ১৯৭৩ সালের জুলাইয়ে করাচিতে প্রত্যাবর্তন করেন। চুয়াডাঙ্গা গণহত্যা সম্পর্কে মোহাম্মদ হানিফ তার সাক্ষ্যে বলেছেন:

> '১৯৭১ সালে মার্চের শেষ সপ্তাহ এবং এপ্রিলের প্রথমার্ধে বাঙালি বিদ্রোহীরা কুষ্টিয়া জেলার চুয়াডাঙ্গায় বসবাসকারী ৯৫ শতাংশ অবাঙালিকে হত্যা করে।...
> 'বিদ্রোহীরা প্রতিটি অবাঙালির বাড়ি লুট করে। শত শত লাশ পড়ে। কিন্তু তারা লাশ দাফন করেনি। লাশগুলো আমাদের এলাকায় পড়ে থাকে। তারা কয়েকজনকে জ্বলন্ত বাড়িঘরে জীবন্ত পুড়িয়ে মারে। হামলার মাত্র এক ঘণ্টা আগে আমি বাড়ি থেকে পালিয়ে যাই। ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল পাকিস্তান সেনাবাহিনী বিদ্রোহীদের কবল থেকে চুয়াডাঙ্গা মুক্ত করা নাগাদ আমি একজন বাঙালি কৃষকের ছদ্মবেশে মাঠে একটি পরিত্যক্ত চালায় কয়েকদিন অবস্থান করি। এ হত্যাযজ্ঞে চুয়াডাঙ্গা রেল স্টেশনে আমার অধিকাংশ সহকর্মী নিহত হয়।...'
> 'আমি পূর্ব পাকিস্তানকে ভালোবাসতাম। আমি বাঙালি বন্ধুদের বন্ধুত্ব ও ভদ্রতাকে সম্মান করতাম। আমি চুয়াডাঙ্গার প্রতি ইঞ্চি জমি চিনতাম। কিন্তু ১৯৭১ সালের মার্চে আওয়ামী লীগ বিদ্রোহ করায় আমার মতো অবাঙালিদের জীবন ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠে। মার্চের শুরুতে শহরের কয়েকটি স্থান থেকে অবাঙালিদের প্রহার এবং অপহরণ করার সংবাদ পাওয়া যায়। ২৫ মার্চ বাঙালি বিদ্রোহীরা দেশীয় অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে অবাঙালিদের ওপর হামলা চালায়। তারা চুয়াডাঙ্গা রেল স্টেশনে আক্রমণ চালিয়ে সকল অবাঙালিকে হত্যা করে। বিদ্রোহীরা রেল স্টেশনের কাছাকাছি অবাঙালিদের দোকানপাট লুট করে। সন্ধ্যায় বিদ্রোহীরা রেল স্টেশনের স্টাফের বাড়িঘরে হামলা চালায় এবং কয়েক শত নির্দোষ পুরুষ, মহিলা ও শিশুকে হত্যা করে। কয়েকজন কিশোরীকে অপহরণ করা হয়। শ্বাসরোধ করে হত্যা করার আগে তাদের গণধর্ষণ করা হয়। বাঙালি বিদ্রোহীরা এলাকার হাসপাতালে হামলা চালিয়ে অবাঙালি রোগীদের হত্যা করে। তারা ১৯৭১ সালে এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে হাসপাতালের পশ্চিম পাকিস্তানি ইন-চার্জ ডা. এম রহমানকে ধরে ব্যালকনি থেকে ফেলে দেয়। মাটিতে পড়ে আঘাত পাওয়ায় তার মাথার খুলি ফেটে যায়।...

(১০৭) **একশো সাততম সাক্ষীর বিবরণ:** ৪০ বছরের আবিদা খাতুনের স্বামী মাসাহেব আলী ১৯৭১ সালে মার্চের প্রথম সপ্তাহে চুয়াডাঙ্গা রেল স্টেশনে অবাঙালি হত্যাযজ্ঞে নিহত

www.pathagar.com

হন। আবিদা খাতুন সে ঘটনার সাক্ষ্য দিতে গিয়ে বলেছেনঃ

> '২৫ মার্চ একদল সশস্ত্র বাঙালি জনতা আমাদের এলাকায় আক্রমণ চালায় এবং আমাদের দরজা ভেঙ্গে ফেলে। চুয়াডাঙ্গা রেল স্টেশনে পোর্টার হিসেবে কর্মরত আমার স্বামী ছিলেন বাড়ির বাইরে। আমার স্বামী ডিউটিতে আছে একথা বলায় বিদ্রোহীরা আমাকে চড়-থাপ্পর ও লাথি মারে। তারা চোরের মতো আমাদের বাড়ি লুট করে সব মূল্যবান সামগ্রী নিয়ে যায়। তারা বলে যায় যে, পরদিন তারা আমার স্বামীর খোঁজে আবার আসবে।...'
>
> 'মধ্যরাতে আমার এক প্রতিবেশী আমাকে আমার স্বামীর মৃত্যুর দুঃসংবাদ দেন। তিনি আমাকে জানান যে, সকালে চুয়াডাঙ্গা রেল স্টেশনে অবাঙালিদের ওপর হামলায় তিনি নিহত হয়েছেন। এ প্রতিবেশী আমাকে রেল স্টেশনে যেতে নিষেধ করে বললেন, আমি সেখানে গেলে আমাকে অপহরণ করা হবে। আমি ভীতি ও আতংকের মধ্যে আমার বাড়িতে অবস্থান করছিলাম। বিদ্রোহীরা কখন আবার আমার বাড়িতে হামলা করবে সে আশংকায় ছিলাম। কিন্তু কেন জানি তারা আমাকে রেহাই দেয়। এপ্রিলের মাঝামাঝি পাকিস্তান সেনাবাহিনী বিদ্রোহীদের কাছ থেকে চুয়াডাঙ্গা পুনর্দখল করে। বিদ্রোহীরা হয়তো গ্রামাঞ্চলে অদৃশ্য হয়ে যায় কিংবা ভারতে পালিয়ে যায়। সেনাবাহিনী আমাকে যশোরে বিধবা ও এতিমদের জন্য নির্মিত একটি ত্রাণ শিবিরে স্থানান্তর করে। দু'মাস পর আমি চুয়াডাঙ্গায় আমার পুরনো বাড়িতে ফিরে আসি এবং ভারতের কাছে পূর্ব পাকিস্তানের পতন ঘটা নাগাদ সেখানে অবস্থান করি। পরবর্তীতে আমাকে ঈশ্বরদীতে স্থানান্তর করা হয় এবং আমি সেখানে বসবাস করি। ১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে আমি করাচিতে প্রত্যাবাসন করি।'

চুয়াডাঙ্গা হত্যাকাণ্ডের প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, শহরের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণের পর বিদ্রোহীরা পশ্চিম পাকিস্তানি সাব-ডিভিশনাল অফিসারের ওপর পিলে চমকে উঠার মতো নির্যাতন চালায়। বিদ্রোহীরা তার অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীকে মারধর করে। তার বাড়ি লুট করা হয়। অবাঙালিদের বাড়ি থেকে বহু মেয়েকে অপহরণ করা হয় এবং একটি স্কুল ভবনে তাদের ওপর গণধর্ষণ চালানো হয়। ভারতে পালিয়ে যাবার আগে বিদ্রোহীরা এসব হতভাগ্য মেয়েকে হত্যা করে। যেসব মেয়ে বাধা দেয়ার চেষ্টা করতো অথবা চিৎকার করতো তাদেরকে নগ্ন করা হতো। অন্যান্য বন্দিকে উপযুক্ত শিক্ষা দানে তাদের গুলি করে হত্যা করা হতো। মেয়েদের স্তন কেটে এবং তাদের জরায়ুতে বাংলাদেশের পতাকার দণ্ড ঢুকিয়ে কোনো কোনো বিদ্রোহী আনন্দ উপভোগ করতো।

(১০৮) একশো আটতম সাক্ষীর বিবরণঃ ১৯৭১ সালে মার্চের শেষ সপ্তাহে চুয়াডাঙ্গা রেলওয়ে স্টেশনের কাছে অবাঙালিদের বাড়িঘরে বাঙালি বিদ্রোহীদের হামলায় ৫০ বছরের পরী বেগমের ছয় সদস্যের পরিবার নিহত হয়। তিনি তার জীবনের এ ট্রাজেডির বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেনঃ

> 'আমার স্বামী ও মেয়ে জামাই ছিল রেলওয়ের কর্মচারী। বিরাজমান উত্তেজনার প্রেক্ষিতে রেলওয়ে স্টেশনে কাজে যাবার পরিবর্তে তারা বাড়িতে অবস্থান করছিল। আমরা রেলওয়ের একটি কোয়ার্টারে বসবাস করতাম। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ মাগরেবের

www.pathagar.com

নামাজ পড়া শেষ হওয়া মাত্র আমি আমাদের কলোনিতে বন্দুক ও মেশিনগানের ঠা ঠা আওয়াজ শুনতে পাই। গোলাগুলির শব্দের পর পরই নারী-পুরুষ ও শিশুদের কান্নাকাটি ও চিৎকার ধ্বনি ভেসে আসছিল। আমরা আমাদের বাড়ির দরজায় তালা লাগিয়ে দিয়েছিলাম। বাঙালি বিদ্রোহীরা শাবল দিয়ে তালা ভেঙ্গে আমার স্বামী ও আমার মেয়ে জামাইয়ের ওপর স্টেনগান থেকে এক ঝাঁক গুলিবর্ষণ করে। আমি ও আমার মেয়ে তার তিন শিশু পুত্রকে আড়াল করার চেষ্টা করি। এসময় একজন বন্দুকধারী গর্জন করে বললো, 'এসব বিহারী সাপদের হত্যা করো।' চোখের পলকে আমার মেয়ের তিন শিশু পুত্রকে গুলি করে হত্যা করা হয়। আমার ভীতসন্ত্রস্ত মেয়ে তার প্রিয় সন্তানদের লাশের ওপর উপুড় হয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লে আরেকজন বন্দুকধারী তার মাথায় গুলি করে। সে একটি চিৎকার দিয়ে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করে। আমার পায়ে একটি গুলি লাগলে আমি অজ্ঞান হয়ে যাই।...'

'দু'দিন পর আমার জ্ঞান ফিরে আসে। তবে আমি দাঁড়াতে অক্ষম ছিলাম। একটু কাৎ হয়ে আমি আমার শাড়ি ছিঁড়ে এক টুকরো কাপড় দিয়ে ক্ষত স্থান বেঁধে নেই। বাড়িতে আমার আপনজনের লাশ ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। আমি লেপ ও বিছানার চাদর দিয়ে তাদের লাশ ঢেকে দেই। এ দৃশ্য ছিল ভয়াবহ। একটি মাটির পাত্রে কিছুটা পানি ছিল। আমি এ পানি পান করে বেঁচে থাকি। আমি কাঁচা চাল ও ডাল খেতাম। ১৯৭১ সালে এপ্রিলের প্রথম পক্ষকালে সশস্ত্র বাঙালি বিদ্রোহী ও পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষ হয়। বাঙালি বিদ্রোহীরা চুয়াডাঙ্গাকে তাদের সরকারের সদর দপ্তর হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে। ১৭ এপ্রিল পাকিস্তান সেনাবাহিনী চুয়াডাঙ্গা প্রবেশ করে আমাকে উদ্ধার করে। তারা আমার বাড়ির লাশগুলো দাফন করে। আমাকে হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। সেখানে আমার চিকিৎসা করা হয়। আমার ক্ষত স্থান শুকিয়ে আসে। পরবর্তীতে আমাকে ঢাকায় একটি ত্রাণ শিবিরে আশ্রয় দেয়া হয়। ১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে আমি পাকিস্তানে প্রত্যাবাসন করি।...'

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ত্রয়োদশ অধ্যায়

জাফরকান্দি ও মেহেরপুরে হত্যাযজ্ঞ

(১০৯) একশো নয়তম সাক্ষীর বিবরণ: ৩৩ বছরের আবদুল আজিজ মেহেরপুর জুট মিলে কেরাণী হিসেবে চাকরি করতেন। পাকিস্তান সেনাবাহিনী তাকে সৈয়দপুরে স্থানান্তর করে। সেখানে তিনি ১৯৭১ সালে এপ্রিলের শেষদিকে তার কয়েকজন আত্মীয়ের সঙ্গে পুনরায় মিলিত হন। ১৯৭৪ সালের জানুয়ারিতে তিনি ঢাকা থেকে করাচিতে ফিরে আসেন। ১৯৭১ সালে মার্চের প্রথম সপ্তাহে তার নিজ শহরে অবাঙালি হত্যাকাণ্ডের বর্ণনা দিতে গিয়ে আবদুল আজিজ বলেছেন:

> '১৯৭১ সালে মার্চের শুরু থেকে বাঙালি উগ্রপন্থীরা অবাঙালিদের বাড়িঘরে বিচ্ছিন্ন হামলা চালাতো। মেহেরপুর জুট মিলে দেড় শ' অবাঙালি শ্রমিক ছিল। মিলের সার্বিক জনশক্তির তুলনায় তাদের সংখ্যা ছিল অতি নগণ্য। এসব অবাঙালি শ্রমিক মিলের অনতিদূরে কলোনিতে বস্তিঘরে বাস করতো। ২৫ মার্চ রাতে আওয়ামী লীগের উগ্রপন্থী এবং বিদ্রোহী বাঙালি সৈন্যরা এ এলাকায় অবাঙালিদের বিরুদ্ধে ধ্বংসলীলায় মেতে উঠে এবং তাদেরকে পাইকারীভাবে হত্যা করে। প্রায় সাড়ে ৭ শ' অবাঙালি নিহত হয়। আমার মনে হয় না যে, এ হত্যাযজ্ঞ থেকে এক ডজনের বেশি লোক রক্ষা পেয়েছিল।...
> 'আমি ছিলাম অবিবাহিত। মিল প্রাঙ্গণে একটি ছোট্ট রুমে বাস করতাম। বিদ্রোহীরা মিলের কোনো ক্ষতি করেনি। চারদিন আমি এ ছোট্ট রুমে বন্দি ছিলাম। আমি আমার বাঙালি বন্ধুদের কাছে কৃতজ্ঞ। তারা আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেনি। তারা বিশ্বাস-ঘাতকতা করলে আমি মারা যেতাম। পাকিস্তান সেনাবাহিনী মেহেরপুরে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ কায়েম করলে আমি আমার গোপন আশ্রয়স্থল থেকে বের হয়ে আসি। বিদ্রোহীরা শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা বিতাড়িত হয়। আমি বিধ্বস্ত অবাঙালি বস্তিঘরগুলো দেখতে যাই। বাঙালি বিদ্রোহীদের নিষ্ঠুর তাণ্ডবলীলা দেখে ব্যথিত হই। রাস্তা, পুকুর, ভস্মীভূত ঘরবাড়ি, মাঠ ও পরিত্যক্ত ভবনে শত শত লাশ। অধিকাংশ লাশ পচে যাওয়ায় সেনাবাহিনী গণকবরের ব্যবস্থা করে। দৃশ্য দেখে মনে হয়েছে, অনেকে তাদের ভস্মীভূত ঘরবাড়ি থেকে পালানোর চেষ্টা করেছিল। পলায়নরত এসব লোককে গুলি করে হত্যা করা হয়।...
> 'রক্তমাখা শাড়ি ও মহিলাদের ব্যবহৃত অন্যান্য পোশাক সাক্ষ্য দিচ্ছিল যে, অপ-হরণকারীরা এসব মহিলার ওপর নির্যাতন চালিয়েছিল। সৈন্যরা বলেছে, এ জঘন্য হত্যাকাণ্ড থেকে এক ডজনের বেশি অবাঙালি বাঁচতে পারেনি।...
> 'মিলে অবাঙালি শ্রমিকদের ভস্মীভূত বস্তিঘরের ধ্বংসাবশেষে প্রাপ্ত মানুষের দগ্ধ হাড়-হাড্ডি সাক্ষ্য দিচ্ছিল যে, অগ্নিকুণ্ডে বহু মানুষকে পুড়িয়ে মারা হয়েছে।'

১৯৭১ সালের মার্চে মেহেরপুরে অবাঙালিদের সার্বিক নিহতের সংখ্যা ছিল এক হাজারের বেশি। বিদ্রোহীরা প্রায় ২ শ' যুবতী মহিলাকে অপহরণ এবং ধর্ষণ করেছিল। শহর

www.pathagar.com

থেকে পিছু হটার সময় বিদ্রোহীরা তাদের অধিকাংশকে শ্বাসরোধ করে কিংবা গুলি করে হত্যা করে।

জাফরকান্দি

১৯৭১ সালের মার্চ-এপ্রিলে কুষ্টিয়া জেলার জাফরকান্দি শহরে হত্যাযজ্ঞে ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলসের বিদ্রোহী ও আওয়ামী লীগের জঙ্গি ক্যাডাররা প্রায় ৬০০ অবাঙালিকে হত্যা করে। মার্চের শেষ সপ্তাহে উন্মত্ত জনতা তিনটি অবাঙালি এলাকায় হামলা করে। অবাঙালিরা এ তিনটি এলাকায় সমবেত হয়েছিল। তাদের ঘরবাড়ি লুট করা হয়। কয়েকটি বাড়ি পুড়িয়ে দেয়া হয়। এলাকার বাসিন্দাদের উন্মুক্ত সবুজ চত্বরে বধ্যভূমিতে নিয়ে যাওয়া হয়। গুলি করে হত্যা করার আগে কয়েকজনকে নির্যাতন করা হয়। বাদবাকিদের সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে মেশিনগানের গুলি চালিয়ে হত্যা করা হয়। নিহতদের মধ্যে ছিল পুরুষ, মহিলা ও শিশু। এ হত্যাকাণ্ড থেকে কেউ রক্ষা পায়নি।

বিদ্রোহীরা অপহৃত মেয়েদের সঙ্গে পাশবিক আচরণ করেছিল। বিদ্রোহীদের নিয়ন্ত্রণ থেকে সেনাবাহিনী জাফরকান্দি পুনরুদ্ধার করার পর সৈন্যরা বহু যুবতী মহিলার লাশ দেখতে পায়। এসব যুবতী মহিলার স্তন কেটে নেয়া হয়েছিল এবং তাদের জরায়ু ছিল ছিন্নভিন্ন। বাঙালিরা এ হত্যাকাণ্ড প্রত্যক্ষ করেছিল। সেনাবাহিনী তাদের প্রত্যক্ষ সাক্ষ্যের ভিত্তিতে বিদ্রোহীদের পরিচালিত হত্যাকাণ্ডের ছবি তুলেছিল। এ জনবহুল আবাসিক কলোনিগুলোতে ব্যাপক ধ্বংসলীলা ছিল আওয়ামী লীগের বিদ্রোহের স্মারক।

www.pathagar.com

চতুর্দশতম অধ্যায়

ঈশ্বরদীতে গণহত্যা

১৯৭১ সালে মার্চের প্রথম সপ্তাহে অবাঙালিদের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগের সূচিত সহিংসতা মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ঈশ্বরদী শহরে তীব্রতা লাভ করে। আওয়ামী লীগ ক্যাডার, ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস ও আনসারের বিদ্রোহীরা এ শহর নিয়ন্ত্রণ করছিল। তারা বেসামরিক প্রশাসনের কর্তৃত্ব কব্জা করে নেয়। তারা শহরের বিভিন্ন এলাকায় অবাঙালিদের ঘরবাড়ি চিহ্নিত করে এবং অবাঙালি হত্যাযজ্ঞের জন্য দলীয় ক্যাডারদের অস্ত্র চালানোর প্রশিক্ষণ দেয়। এখানকার হত্যাকাণ্ডে প্রায় ২ হাজার অবাঙালি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

(১১০) **একশো দশতম সাক্ষীর বিবরণঃ** ৪২ বছরের শামসুজ্জোহা ঈশ্বরদীর ফতেহ মোহাম্মদপুর এলাকায় বসবাস করতেন। হত্যাকাণ্ডের আগে তিনি ছিলেন একজন উঠতি ব্যবসায়ী। তাদের এলাকায় বিদ্রোহীরা হামলা চালানোর একদিন আগে শামসুজ্জোহা, তার স্ত্রী ও ১০ বছরের পুত্র বাড়ি ত্যাগ করে একজন বাঙালি বন্ধুর বাড়িতে আশ্রয় নেয়। ১৯৭১ সালের ১১ এপ্রিল পাকিস্তান সেনাবাহিনী ঈশ্বরদীতে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করার পর তাদেরকে ঢাকায় স্থানান্তর করা হয়। ১৯৭৩ সালের অক্টোবরে শামসুজ্জোহা ঢাকা থেকে করাচিতে প্রত্যাবাসন করেন। তিনি তার সাক্ষ্যে বলেছেন:

> '২৫ মার্চ সকালে আওয়ামী লীগের একটি সশস্ত্র গ্রুপ এবং বিদ্রোহী সৈন্যরা উরানখোলা রোডে চারটি অবাঙালি পরিবারের ওপর হামলা চালায়। বাজারে এসব পরিবারের লোকদের প্রকাশ্যে হত্যা করা হয়। পুরুষ, মহিলা ও শিশুদের লাশ রাস্তার পাশে স্তূপ করে রাখা হয়। লাশের পাশে একটি প্ল্যাকার্ডে লিখা ছিল, 'যারা বাংলাদেশকে অপছন্দ করে এটাই তাদের পরিণতি।' যেখানে অবাঙালিরা বাস করতো সেসব এলাকার বাড়ির দেয়ালেও অনুরূপ শ্লোগান লিখা ছিল।...
> 'পরদিন প্রায় ৫ হাজার সশস্ত্র বাঙালি পশ্চিম টেংরি কলোনিতে অবাঙালিদের বাড়িঘরে হামলা চালায়। আক্রমণকারী বাঙালিদের কয়েকজনের কাছে ছিল স্টেনগান ও রাইফেল। নিহতদের মধ্যে আমার চাচাতো ভাইও ছিল। তাকে এবং তার চার সদস্যের পরিবারকে গুলি করে হত্যা করা হয়।'

(১১১) **একশো এগারোতম সাক্ষীর বিবরণঃ** ২৭ বছরের আইনুল হক ঈশ্বরদীর পশ্চিম টেংরি কলোনিতে একটি ছোট্ট বাড়িতে বসবাস করতেন। ২৬ মার্চ অবাঙালি হত্যাযজ্ঞের সময় তার ছয় সদস্যের পরিবারকে হত্যা করা হয়। সেদিনের হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে আইনুল হক তার সাক্ষ্যে বলেছেন:

www.pathagar.com

'আমি ঈশ্বরদীতে দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করতাম। আমার একটি ছোট দোকান ছিল। আমি ঈশ্বরদীকে ভালোবাসতাম। ঈশ্বরদী ছিল একটি মনোরম ও শান্ত শহর। বাঙালিদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক ছিল বন্ধুত্বপূর্ণ। আমি ভালোভাবে বাংলা বলতে পারতাম।

২৬ মার্চ খুব ভোরে প্রায় ৩ হাজার বাঙালি রাইফেল ও স্টেনগান সজ্জিত হয়ে আমাদের এলাকায় হামলা চালায়। বিগত তিন সপ্তাহ যাবৎ শহরে উত্তেজনা বিরাজ করলেও আমরা এ ধরনের ব্যাপক হামলার আশংকা করিনি। প্রতিরক্ষার জন্য আমাদের কোনো অস্ত্র ছিল না। আক্রমণকারীরা অবাঙালিদের ঘরের দরজা ভেঙ্গে প্রবেশ করে এবং একটি শব্দও উচ্চারণ না করে তাদের ওপর গুলিবর্ষণ করে। আমার ঘরের সামনের দরজা ছিল তালাবদ্ধ। তারা তালা ভেঙ্গে ভেতরে প্রবেশ করে। আমাদের দিকে অস্ত্র তাক করে। আমার বৃদ্ধা মা ফজরের নামাজ আদায় করছিলেন। আমাদের বাড়িতে তাকে প্রথম গুলি করা হয়। তিনি জায়নামাজে উপুড় হয়ে পড়ে যান এবং জীবনের আশা ছেড়ে দেন। ততক্ষণে আমার সন্তানরা ঘুম থেকে জেগে উঠে। আমি দরজায় পা রাখার আগেই বন্দুকধারীরা আমার, আমার স্ত্রী ও দু'সন্তানের ওপর গুলি চালায়। আমি যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছিলাম। রক্তে ভাসছিলাম। আমি জ্ঞান হারানোর আগে আমার দু'ভাইয়ের ওপর গুলি চালাতে দেখলাম। আমি দু'দিন অচেতন ছিলাম। তৃতীয় দিন আমি জ্ঞান ফিরে পাই। এ দৃশ্য ছিল অসহনীয়। ঘরের মেঝেতে আমার প্রিয়জনদের রক্তমাখা লাশ। আমার মনে হলো আমি দুঃস্বপ্ন দেখছি। আমার শরীরে ছিল জ্বর। আমি ছিলাম ভয়ানক দুর্বল। আমি হামাগুড়ি দিয়ে আমার দু'সন্তানের লাশের কাছে যাই। তাদের স্পন্দনহীন কপালে চুমো দেই। মনে হলো আমিও যেন মৃত। এ ট্রাজেডি ছিল সহ্যের অতীত। আমি আবার মূর্ছা যাই।...

'১৯৭১ সালের ১১ এপ্রিল পাকিস্তানি সৈন্যরা আমার বাড়িতে এসে দাফনের জন্য লাশগুলো সরিয়ে ফেলে। তারা আমাকে ঈশ্বরদী হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে কয়েক সপ্তাহ আমার চিকিৎসা করা হয়। এ হত্যাযজ্ঞে আহতদের মধ্যে খুব কম লোকই বেঁচেছিল। আওয়ামী লীগের উগ্রপন্থী, ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস ও আনসার বাহিনীর বিদ্রোহীদের হামলায় ঈশ্বরদীর প্রায় ৯০ শতাংশ অবাঙালি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। আমি আমার এলাকায় ফিরে যাই। আমাদের কলোনিকে আমার কাছে ভূতুরে বলে মনে হলো। বিদ্রোহীরা প্রতিটি অবাঙালির বাড়ি লুট করে। বহু বাড়ি ভস্মীভূত। আমার অধিকাংশ বন্ধুবান্ধব নিহত। বাড়িতে ফিরে যাওয়া ছিল আমার কাছে এক সীমাহীন যন্ত্রণা। আমার পরিবারের সদস্যদের হত্যাকাণ্ডের স্মৃতি ছিল আমার কাছে অত্যন্ত বেদনাদায়ক। আমি ঢাকায় স্থানান্তরিত হই এবং ১৯৭৪ সালের জানুয়ারিতে করাচিতে প্রত্যাবাসন করি।'

www.pathagar.com

পঞ্চদশ অধ্যায়

পাকসিতে উৎপীড়ন

পাকসি ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ রেলওয়ে কেন্দ্র। ১৯৭১ সালের মার্চে আওয়ামী লীগের বিদ্রোহের আগে এখানে প্রায় এক হাজার অবাঙালি পরিবার বসবাস করতো। মার্চের শুরুতে আওয়ামী লীগ দৃশ্যত এ শহরের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে। পুলিশ, আধা-সামরিক ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস ও আনসার কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। এমন কোনো দিন ছিল না যেদিন মিছিল অথবা সমাবেশের মতো কর্মসূচিগুলোর মধ্য দিয়ে আওয়ামী লীগ শক্তি প্রদর্শন করেনি। সমাবেশগুলোতে অস্ত্রের সমাবেশ ঘটানো হতো। বেশকিছু অবাঙালি যুবক প্রহৃত হয় এবং অবাঙালিদের দোকানপাট লুট করা হয়।

মার্চের শেষ সপ্তাহ এবং এপ্রিলের শুরুতে অবাঙালিদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষের বিষবাষ্প তুঙ্গে পৌঁছে। রেলওয়ে কলোনিতে বসবাসকারী অবাঙালিরা সন্ত্রাসী হামলার টার্গেট হয়ে দাঁড়ায়। কলোনির বাসিন্দাদের অধিকাংশ ছিল রেলওয়ের কর্মচারী এবং তাদের পরিবার। ১৯৭১ সালের ৯ এপ্রিল এ আবাসিক কলোনিতে সর্বাত্মক হত্যাযজ্ঞ চালানো হয়। কলোনির প্রায় ২ হাজারের বেশি বাসিন্দাকে হত্যা করা হয়। ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল পাকিস্তান সেনাবাহিনী শহরের নিয়ন্ত্রণ পুনরুদ্ধার করার ঠিক পূর্বক্ষণে এ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়।

(১১২) **একশো বারোতম সাক্ষীর বিবরণঃ** ৫২ বছরের আবু মোহাম্মদ ছিলেন রেলওয়ের একজন কর্মচারী। তিনি রেলওয়ে কলোনিতে বসবাস করতেন। হত্যাযজ্ঞে তার পরিবারের সাত জনকে হত্যা করা হয়। আবু মোহাম্মদকে ঢাকায় স্থানান্তর করা হয়। ১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে তিনি করাচিতে প্রত্যাবাসন করেন। আবু মোহাম্মদ তার পরিবারের হৃদয়বিদারক হত্যাকাণ্ডের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন:

> '১৯৭১ সালে মার্চের শেষ সপ্তাহে আওয়ামী লীগের উগ্রপন্থী ও বাঙালি বিদ্রোহীরা স্টেনগান ও রাইফেল উঁচিয়ে পাকসি রেলওয়ে স্টেশন এবং রেলওয়ে কর্মচারীদের আবাসিক কলোনি আক্রমণ করে। তারা রেলওয়ের সকল অবাঙালি কর্মচারীকে পাকসি রেলওয়ে প্রাঙ্গণে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে গুলি করে হত্যা করে। সে সময় আমি ছিলাম ডিউটিতে। আমার বাম পায়ে একটি বুলেট বিদ্ধ হলে আমি আহত হই। বুলেট বিদ্ধ হয়ে আমি মাটিতে পড়ে যাই এবং মৃত্যু যন্ত্রণায় কাতরাতে থাকি। প্রচুর রক্তক্ষরণ হচ্ছিল। আমার ক্ষতস্থানে তীব্র ব্যথা করছিল। আক্রমণকারীরা বিকালে রেলওয়ে স্টেশন ত্যাগ করে আবাসিক কলোনি আক্রমণ করে। আমি মেশিনগানের একটানা গুলির আওয়াজ শুনি।...
>
> 'আমার কোয়ার্টার ছিল কিছুটা দূরে। পাশে ছিল একটি মসজিদ। আমি এ মসজিদে নামাজ পড়তাম। মধ্যরাতের পর আমি হামাগুড়ি দিয়ে মসজিদে যেতে সক্ষম হই।

www.pathagar.com

কোথাও আলোর কোনো চিহ্ন ছিল না। চুপি চুপি মসজিদে প্রবেশ করে অন্ধকারে মসজিদের মেঝেতে মহিলাদের মতো একদল মানুষ দেখতে পেলাম। তাদের অনেকেই ছিল প্রায় বিবস্ত্র। আমাকে বিদ্রোহীদের একজন মনে করে কে যেন বলে উঠলে, 'এ নরক যন্ত্রণার চেয়ে আমাদেরকে গুলি করে মেরে ফেলো।' ফিসফিস করে আমি আমার পরিচয় দেয়ায় তারা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে এবং কিভাবে বাঙালি বিদ্রোহীরা তাদের পুরুষদের হত্যা, তাদেরকে অপহরণ এবং ধর্ষণ করেছে আমার কাছে তার বিস্তারিত বিবরণ দেয়।'

'তাদের একজন বললো, 'মসজিদে নিক্ষেপ করার আগে আমাদের জামা-কাপড় খুলে নেয়া হয় এবং আমাদেরকে একটি স্কুলে নগ্ন অবস্থায় হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে অপহরণকারীরা আমাদের সম্ভ্রমহানি করে। গভীর রাতে আমাদেরকে মসজিদে ফেলে দিয়ে যাওয়া হয়। দু'জন মেয়ে পথে পালানোর দুঃসাহস দেখিয়েছিল। তাদের মৃতদেহ মসজিদ প্রাঙ্গণে পড়ে রয়েছে।' এসব ধর্ষিতা মহিলা ছিল রেলওয়েতে আমার সহকর্মীদের কন্যা অথবা স্ত্রী।...

'পরদিন বিদ্রোহীরা পিছু হটে এবং পাকিস্তান সেনাবাহিনীর একটি ইউনিট পাকসিতে প্রবেশ করে। তারা আমাদের উদ্ধার করে। হাসপাতালে আমার চিকিৎসা করা হয়। হত্যাযজ্ঞে আমার পরিবারের সকল সদস্য নিহত হয়। জীবিত মহিলা ও শিশুদের ঢাকায় একটি ত্রাণ শিবিরে স্থানান্তর করা হয়।'

(১১৩) **একশো তেরোতম সাক্ষীর বিবরণঃ** শামসুজ্জোহা হলেন ১৯৭১ সালে ঈশ্বরদী হত্যাকান্ডের একজন প্রত্যক্ষদর্শী। ঈশ্বরদী থেকে ৮ মাইল দূরে তিনি এ হত্যাকাণ্ড প্রত্যক্ষ করেন। হত্যাকান্ড সম্পর্কে তিনি তার সাক্ষ্যে বলেছেনঃ

'আমার চাচাতো ভাই জামাল মালিক পাকসিতে পূর্ব পাকিস্তান রেলওয়ের গার্ড হিসেবে চাকরি করতো। তার ১২ সদস্যের পরিবার বাস করতো রেলওয়ে কলোনির একটি কোয়ার্টারে। ১৯৭১ সালে মার্চের তৃতীয় সপ্তাহে জামাল ও তার পরিবারের সবাই নিহত হয়। কয়েকজন পুরুষকে হত্যা করা হয় কোয়ার্টারে গুলি করে। কয়েকজন বৃদ্ধ, যুবতী মহিলা ও শিশুসহ বাদবাকিদের একটি স্কুল ভবনে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল যে, তাদেরকে সেখানে আশ্রয় দেয়া হবে এবং কোনো ক্ষতি করা হবে না। সেই ভয়াবহ দিনে ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলসের বিদ্রোহীরা স্কুল প্রাঙ্গণে মেশিনগানের গুলিতে তাদের ঝাঝরা করে দেয়। এ হত্যাকাণ্ডের এক ঘন্টা আগে আটক যুবতী মহিলাদের বন্দুকের মুখে অন্য একটি স্কুল ভবনে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে বিদ্রোহীরা তাদের শ্লীলতাহানি ঘটায়। পিছু হটার আগে বিদ্রোহীরা এসব ধর্ষিতা যুবতী মহিলার অনেককে একটি মসজিদে ঠেলে দেয়। পাকিস্তান সেনাবাহিনী তাদের মুক্ত করে।'

(১১৪) **একশো চৌদ্দতম সাক্ষীর বিবরণঃ** ১৯৭১ সালের ৯ এপ্রিল পাকসিতে অবাঙালি হত্যাযজ্ঞের সময় ১৫ বছরের মোহাম্মদ কাইয়ুমের পিতামাতা ও বড় বোনকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। কাইয়ুম সেই উপাখ্যানের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেঃ

'আমরা রেলওয়ে কলোনিতে বসবাস করতাম। খুব ভোরে 'জয় বাংলা' শ্লোগান দিয়ে একদল লোক রেলওয়ে কলোনি আক্রমণ করে। তারা আমাদের বাড়ি লুট করে এবং বন্দুকের মুখে আমাদেরকে কলোনি থেকে একটু দূরে একটি পুরনো স্কুল ভবনে নিয়ে

www.pathagar.com

যায়। আটককৃতদের মধ্যে ছিল রেলওয়ে কলোনির শত শত পুরুষ, মহিলা ও শিশু। আটককারীরা আমাদেরকে ভুল আশ্বাস দিয়েছিল। তারা বলেছিল, আমাদের জীবন রক্ষা করা হবে।'

'শেষ বিকালে বন্দুক, রামদা ও বর্শা উঁচিয়ে আমাদের আটককারীরা সকল বন্দি পুরুষকে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করায়। দু'জন দু'জন করে বন্দি পুরুষদের কম্পাউন্ডের একটি কোণে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে আমাদের চোখের সামনে তাদেরকে প্রথমে রামদা দিয়ে কুপিয়ে পরে গুলি করে হত্যা করা হয়। বন্দুকধারীরা আমার পিতাকে হত্যা করার জন্য টানা হ্যাঁচড়া করে নিয়ে যাবার সময় আমার মা ও বড় বোন নিজেদেরকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেননি। সেই ভয়াবহ দৃশ্য এখনো আমার স্পষ্ট মনে পড়ে। দু'জন বন্দুকধারী আমার মা ও বড় বোনকে গুলি করে। রাইফেল দিয়ে গুলি করার আগে রামদা দিয়ে আমার পিতার বুক এফোড় ওফোড় করে দেয়া হয়। আমার সঙ্গে দাঁড়ানো ছিল আমার ৮ বছরের ছোট বোন। ঠিক তখন কয়েকজন পুরুষ বন্দি খালি হাতে আটককারীদের ওপর হামলা চালালে ছুটোছুটি শুরু হয়।...

'আমার সামনে ছিল একটি পরিত্যক্ত বাড়ি। বাড়িটির অর্ধেক ছিল ভস্মীভূত। আমি আমার ক্রন্দনরত বোনকে আমার কাঁধে তুলে নেই এবং বাড়িটির দিকে দৌড়ে যাই। রুদ্ধশ্বাসে আমরা ধ্বংসযজ্ঞেপূর্ণ একটি রুমে অগ্নিদগ্ধ একটি তোষকের নিচে লুকাই। আমরা এ ভূতুরে বাড়িতে ২৪ ঘন্টা অবস্থান করি। ক্ষুধা ও পিপাসায় আমার ছোট বোন কান্নাকাটি শুরু করলে আমরা চুপিচুপি নিকটবর্তী একটি মাঠে যাই। সেখানে আমরা পানি পান করি। রাতে আমরা মাঠের শেষ প্রান্তে একটি জঙ্গলে আশ্রয় নেই। আমরা বন্য ফলমূল খেতাম। পাতার বিছানায় ঘুমাতাম। পরদিন পাকিস্তান সেনাবাহিনী আমাদের উদ্ধার করে। তারা আমাদেরকে ঈশ্বরদী নিয়ে যায়। সেখানে অন্যান্য এতিম শিশুর সঙ্গে আমরা একটি বাড়িতে বাস করতাম। আমি দিনমজুর হিসেবে কাজ করতাম। তাতে আমাদের দু'ভাই বোনের বেশ চলতো। ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে ভারতীয় বাহিনীর কাছে ঈশ্বরদীর পতন ঘটলে আমরা নতুন করে দুর্ভোগে পড়ি। ১৯৭৪ সালের জানুয়ারিতে আমরা করাচিতে প্রত্যাবাসন করি।'

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ষোড়শ অধ্যায়

নোয়াখালীতে সন্ত্রাসের রাজত্ব

নোয়াখালীতে অবাঙালিদের সংখ্যা আড়াই হাজারের বেশি না হলেও তারা শহরে সম্মানের পাত্র ছিল। বাঙালিদের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ছিল বন্ধুত্বপূর্ণ। তাদের অধিকাংশই নিয়োজিত ছিল ব্যবসায়। কয়েকজন ছিল খুচরা দোকান ও ক্ষুদ্র ব্যবসার মালিক। ১৯৭১ সালে মার্চের মাঝামাঝি থেকে নোয়াখালীতে উত্তেজনা অনুভূত হয় এবং অবাঙালিরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতে শুরু করে। ১৯৭১ সালের ২১-২৩ মার্চ আওয়ামী লীগের সশস্ত্র গ্রুপ এবং ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস ও আনসারের বিদ্রোহীরা নোয়াখালীতে সংখ্যালঘু অবাঙালি জাতিগত নিধনে লিপ্ত হয়। এ হত্যাযজ্ঞে আনুমানিক ২ হাজার অবাঙালি নারী, পুরুষ ও শিশুকে হত্যা করা হয়। ১৯৭১ সালে এপ্রিলের শেষ সপ্তাহে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কাছে পরাজিত হওয়ার আগে বিদ্রোহীরা বহু অবাঙালি মেয়েকে অপহরণ, ধর্ষণ এবং তাদের অধিকাংশকে হত্যা করে।

(১১৫) **একশো পনেরোতম সাক্ষীর বিবরণ :** ৩৭ বছরের ফজলুল হক হলেন নোয়াখালীতে মার্চে সংঘটিত হত্যাযজ্ঞের একজন প্রত্যক্ষদর্শী। তিনি ইস্টার্ন ফেডারেল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির নোয়াখালী ব্রাঞ্চে চাকরি করতেন। ১৯৬৯ সালে নোয়াখালীতে পোস্টিং লাভের আগে তিনি চট্টগ্রামে বাস করতেন। নিজে থাকতেন নোয়াখালীতে। তবে তার পিতামাতা ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন বসবাস করতো চট্টগ্রামে। ফজলুল হক তার সাক্ষ্যে বলেছেন:

> 'ইস্টার্ন ফেডারেল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির এক ডজন উর্দুভাষী কর্মচারী নোয়াখালীতে নিউ রোডে একটি এপার্টমেন্ট ভাড়া করে। এপার্টমেন্টটি ছিল একটি মেসের মতো। আমি এ এপার্টমেন্টে বসবাস করতাম। আমার সহ-বাসিন্দা ও প্রতিবেশী বাঙালিদের সঙ্গে আমার সুসম্পর্ক ছিল।...
>
> '১৯৭১ সালে মার্চের দ্বিতীয় সপ্তাহে আওয়ামী লীগের উগ্রপন্থীরা ন্যূনতম প্ররোচনা ছাড়া কয়েকজন অবাঙালিকে প্রহার করে। ১৯৭১ সালের ২০ মার্চ আমি আমার অফিসে গেলে কয়েকজন বাঙালি সহকর্মী আমাকে সতর্ক করে দেয় যে, আওয়ামী লীগের জঙ্গি কর্মীরা অবাঙালিদের বাড়িঘরে হামলা চালাবে। তারা আমাকে আমার এপার্টমেন্টে ফিরে না যাবার অনুরোধ জানায়। বিকালে আওয়ামী লীগের সশস্ত্র জঙ্গিরা অবাঙালিদের বিরুদ্ধে সহিংসতায় লিপ্ত হয়ে তাদের ঘরবাড়ি লুট করে এবং পুরুষদের গুলি করে হত্যা করে। আমি আমাদের অফিসের বাথরুমে তিনদিন লুকিয়ে থাকি। পরবর্তীতে আমি একজন বাঙালি সহকর্মীর বাড়িতে আশ্রয় নেই। বিদ্রোহীরা আমাদের এপার্টমেন্টে হামলা চালায় এবং এপার্টমেন্টের ৯ জন বাসিন্দার সবাইকে হত্যা করে। আমার মতো আরো দু'জনকে পূর্বাহ্নে হুঁশিয়ার করে দেয়ায় তারা এপার্টমেন্টে ফিরেনি। সহিংসতায়

www.pathagar.com

নোয়াখালীর তিন-চতুর্থাংশ অবাঙালি নিহত হয়। এমনকি শত শত মহিলা ও শিশুকেও হত্যা করা হয়।'

নোয়াখালীর প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, তারা মাইজদী, বেগমগঞ্জ, চৌমুহনী, হাতিয়া ও লক্ষ্মীপুরে অবাঙালি পরিবারগুলোর বিরুদ্ধে সহিংসতার খবর পেয়েছিলেন। এসব জায়গায় বসবাসকারী অবাঙালিদের সংখ্যা বেশি ছিল না এবং তারা ছিল বিচ্ছিন্ন। মনে হচ্ছে মুক্তিপণের জন্য কয়েকজন অবাঙালি ব্যবসায়ীকে আটক করা হয় এবং খুচরা দোকানগুলো লুট করা হয়। ১৯৭১ সালের গোলযোগকালে মাইজদী রেলওয়ে স্টেশনে কয়েকজন অবাঙালি রেল কর্মচারীকে লাঞ্ছিত ও হত্যা করা হয়। ১৯৭১ সালে মার্চের শেষ সপ্তাহ এবং এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে সন্দ্বীপ, দক্ষিণ হাতিয়া ও দক্ষিণ শাহবাজপুরসহ কয়েকটি উপকূলীয় দ্বীপে আওয়ামী লীগের উগ্রপন্থীরা কয়েকজন অবাঙালিকে হত্যা করে।

www.pathagar.com

সপ্তদশ অধ্যায়

সিলেটে দুর্দশা

সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের বহু জেলায় আওয়ামী লীগের বিদ্রোহের তীব্রতা যতটা ছিল সিলেট জেলার অধিকাংশ স্থানে ততটা ছিল না। সিলেটে অবাঙালিদের সংখ্যা সামান্য হওয়া ছিল অন্যতম কারণ। আরেকটি কারণ হলো যে, সিলেটের স্থানীয় অধিবাসীরা (আসাম বংশোদ্ভূত) একটি স্বাধীন বাঙালি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় আওয়ামী লীগের পরিকল্পনার বিপক্ষে ছিল। ১৯৪৭ সালে সিলেট ভারতে নাকি পাকিস্তানে যোগদান করবে সে প্রশ্নে ব্রিটিশের তত্ত্বাবধানে একটি গণভোট হয়। এ গণভোটে সিলেটের লোকেরা পাকিস্তানে যোগদানের পক্ষে ব্যাপকভাবে ভোট দেয়। ১৯০৫ সালে পূর্ববঙ্গকে একটি আলাদা প্রদেশের প্রস্তাবে সিলেট জেলার স্থানীয় অসম অধিবাসীরা ব্যাপক সমর্থন দিয়েছিল।

১৯৭১ সালের মার্চে আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসে সিলেটের শান্তি বিপন্ন হয় এবং আওয়ামী লীগের জঙ্গিরা কয়েকজন অবাঙালিকে হত্যা করে। সিলেট জেলার চা বাগানগুলোতে আওয়ামী লীগের কর্মীরা অবাঙালি নির্বাহী এবং অন্যান্য স্টাফ সদস্যদের বিরুদ্ধে বাঙালি শ্রমিকদের উসকানি দেয়। এ উসকানিতে কয়েকটি পরিবারকে হত্যা করা হয়। ১৯৭১ সালের মার্চে সিলেটে নিহত অবাঙালিদের সঠিক সংখ্যা নির্ণয় করা দুরূহ। তবে এ সংখ্যা ৫শ'র কাছাকাছি বলে ধারণা করা হয়।

(১১৬) **একশো ষোলতম সাক্ষীর বিবরণ :** ৫০ বছরের মিসেস ওয়াহিদা খাতুনের ছেলে জাফর আহমেদ সিদ্দিকী পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল এয়ারলাইন্সের সিলেট অফিসে হিসাব রক্ষক হিসেবে চাকরি করতেন। ১৯৭১ সালের ৪ এপ্রিল জাফর ও তার স্ত্রী সিদ্দিকাকে শহরের কেন্দ্রস্থলে তাদের বাড়িতে গুলি করে হত্যা করা হয়। ওয়াহিদা খাতুন তার ছেলেকে রক্ষা করার চেষ্টা করলে একজন আততায়ী তাকে গুলি করে। গুলি তার মাথায় বিদ্ধ হলে একটি গভীর ক্ষত হয়। সারা জীবন তাকে ক্ষতের চিহ্ন বহন করতে হয়েছে। তবে তার পুত্র ও পুত্রবধূর হত্যাকাণ্ডে সৃষ্ট ক্ষতের দাগ ছিল আরো গভীর। ওয়াহিদা খাতুন তার সাক্ষ্যে বলেছেন :

> 'বন্দুকধারীরা বললো যে, আমরা বাংলাদেশের লোক না হওয়ায় এবং আমাদের মাতৃভাষা উর্দু হওয়ায় তারা আমাদেরকে গুলি করছে। তারা আমাদের বাড়ি লুট করে।...
> 'আমি আহত হই। আমার প্রচুর রক্তক্ষরণ হচ্ছিল। আমার ছেলে জাফরের ছয় সন্তান এতিম হয়। এ ভয়াবহ ট্রাজেডিতে ১৮ বছরের বাঙালি গৃহপরিচারিকা হাজেরা ছিল আমাদের একমাত্র ভরসা। গোলাগুলির সময় সে আমার নাতিদের আগলে রাখে। আমাদের বাড়ির বাঙালি মালিক আমাদের দুরবস্থায় মর্মাহত হন। তিনি আমাদেরকে

www.pathagar.com

তার বাড়িতে আশ্রয় দেন। আমার চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। আমাদের গৃহপরিচারিকা হাজেরা সর্বোচ্চ ত্যাগ ও জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আমার এবং আমার নাতিদের সেবা যত্ন করতো। বাঙালি হাজেরার জন্ম সিলেটে। সে আমাদের বাড়িতে কয়েক বছর ধরে কাজ করতো।...

'আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র নাসিম আহমেদ সিদ্দিকী সিরাজগঞ্জে নির্বাহী প্রকৌশলী হিসেবে চাকরি করতো। ১৯৭১ সালের মার্চে বিদ্রোহীরা তার বাড়ি লুট করে। স্থানীয় কারাগারে তার ওপর নির্যাতন চালানো হয়। তার বাঙালি এসিস্ট্যান্ট তার জীবন রক্ষা করে।...

'বিদ্রোহীরা যখন আমাদের বাড়ি লুট করছিল তখন হাজেরা আমাদেরকে হত্যা না করার জন্য তাদের কাছে করজোড়ে অনুরোধ করে। জাফরের ছোট মেয়েকে আগলে ধরতে গেলে তার পায়ে গুলি লাগে।...

'৪ মে আমরা সিলেট ত্যাগ করে দীর্ঘ ও বিপদসংকুল পথ পাড়ি দিয়ে পাকিস্তানে এসে পৌঁছি। হাজেরা আমাদের সঙ্গে আসে এবং আমাদের যাত্রাপথের সকল বিপত্তি হাসি মুখে বরণ করে নেয়।'

'আমি ১৯৭১ সালের ৪ এপ্রিলের ভয়াবহ রাতের কথা কখনো ভুলতে পারিনি। সেদিন বন্দুকধারীরা আমার অসহায় চোখের সামনে আমার ছেলে ও তার স্ত্রীকে হত্যা এবং আমাকে আহত করে। সারারাত হাজেরা ও আমার নাতিরা জাফর ও তার স্ত্রীর রক্তাক্ত লাশের ওপর উপুড় হয়ে কেঁদেছে। পরদিন আমাদের সিলেটি প্রতিবেশী ও আমাদের বাঙালি মালিক আসেন এবং গোরস্তানে তাদের লাশ দাফন করেন। তাদের সহায়তায় আমি হাসপাতালে ভর্তি হই।...'

১৯৭১ সালের মার্চ-এপ্রিলে লালবাজার, ফেঞ্চুগঞ্জ, গোপালগঞ্জ, গোবিন্দগঞ্জ, বালাগঞ্জ ও জগন্নাথপুরে অবাঙালি পরিবারগুলোর ওপর সহিংসতা চালানো হয়। ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল পাকিস্তান সেনাবাহিনী সিলেট মুক্ত করে।

(১১৭) একশো সতেরোতম সাক্ষীর বিবরণ : ২২ বছরের মোহাম্মদ জামালউদ্দিন খানের পিতা ছিল সিলেটের কাছে মনতলা রেলওয়ে স্টেশনের স্টেশন মাস্টার। ১৯৭১ সালে ডিসেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে ভারতীয় সেনাবাহিনী ও মুক্তিবাহিনী ঢাকা দখল করে নেয়ার পর মোহাম্মদপুর থেকে জামালউদ্দিন ও তার বড় ভাইকে অপহরণ করা হয়। ঢাকায় একটি নদীর তীরবর্তী বধ্যভূমিতে তাদের নিয়ে যাওয়া হয়। গলাকাটার দল তার বড় ভাইকে হত্যা করে। বড় ভাইকে হত্যা করার দৃশ্য দেখে ভয়ে জামালউদ্দিনের শরীরের রক্ত হীম হয়ে আসছিল। জীবনের এ ভয়াবহ অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিতে গিয়ে জামালউদ্দিন বলেছে:

'আমি ছিলাম মনতলায় শাহজালাল কলেজের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র। ১৯৪৭ সালে উপমহাদেশ বিভক্তিকালে আমার পিতামাতা ভারতের উত্তরপ্রদেশ থেকে পূর্ব পাকিস্তানে অভিবাসন করেন। ১৯৭১ সালের ২ মার্চ আওয়ামী লীগের একদল গুণ্ডা মনতলায় আমাদের বাড়িতে হামলা করে এবং আমাদের যাবতীয় মূল্যবান সামগ্রী লুট করে নিয়ে যায়। তবে তারা আমাদের হত্যা করেনি। রেলওয়ে সার্ভিস থেকে অবসর গ্রহণের পর বসবাস করার জন্য আমার পিতা ঢাকার অদূরে ঘোড়াশালে একটি বাড়ি নির্মাণ করেছিলেন। মনতলায় আমাদের বাড়ি লুট হওয়ার পর পরই আমরা ট্রেনে ঘোড়াশালের

www.pathagar.com

উদ্দেশে রওনা হই। রেলওয়ে স্টেশনে জামায়াতে ইসলামীর একজন বাঙালি সদস্য আমাদেরকে জানান যে, অবাঙালিদের জন্য ঘোড়াশাল নিরাপদ নয়। আমাদের বরং ঢাকা যাওয়া উচিত। ঢাকার মোহাম্মদপুর এলাকায় আমার মামা বসবাস করতেন। আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসীরা ঢাকাকে জিম্মি করে রেখেছিল। অবাঙালিদের জীবন ছিল দুঃস্বপ্ন। আমরা মোহাম্মদপুরে বাস করতাম। এ এলাকা ছিল অবাঙালিদের নিরাপত্তার জন্য একটি মরুদ্যান। আমরা কয়েকদিন আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসীদের কোণঠাসা করে রাখি। মোহাম্মদপুরের কয়েকজন অবাঙালি রাতে এলাকায় ত্রাস সৃষ্টি করেছিল। তাদেরকে আর কখনো দেখা যায়নি। বিদ্রোহীরা তাদেরকে গণধোলাই দিয়ে হত্যা করে। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পাকিস্তান সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপ ছিল আমাদের জন্য জীবন রক্ষাকারী একটি উদ্যোগ।'

www.pathagar.com

www.pathagar.com

অষ্টাদশ অধ্যায়

মৌলভীবাজার ও ভেড়ামারায় গোলাগুলি

(১১৮) **একশো আঠারোতম সাক্ষীর বিবরণঃ** ৩৪ বছরের কামরুদ্দিন খান ছিলেন মৌলভী-বাজারের তুলসিতলায় একটি টেইলারিং দোকানের মালিক। তিনি অলৌকিকভাবে বেঁচে যান। কামরুদ্দিন খান একটি মসজিদে আশ্রয় নেন। সেখানে তিনি এক মাস একজন বধির ভিক্ষুক হিসেবে বাস করেন। ১৯৭৩ সালের অক্টোবরে তিনি ঢাকা থেকে করাচিতে প্রত্যাবাসন করেন। কামরুদ্দিন তার সাক্ষ্যে বলেছেনঃ

> 'বাঙালি বিদ্রোহীরা গুলি করে হত্যা করার আগে অবাঙালি বন্দিদের নিজেদের কবর খুঁড়তে বাধ্য করেছিল। ১৯৭১ সালের মার্চ-এপ্রিলে সংঘটিত গণহত্যা থেকে খুব কম সংখ্যক অবাঙালি রক্ষা পেয়েছিল। আমি ১৯৫০ সালে বিহার থেকে পূর্ব পাকিস্তানে অভিবাসন করেছিলাম। মৌলভীবাজারকে আমি ভীষণ পছন্দ করতাম এবং সেখানে একটি টেইলারিং দোকান খুলি। আমি ভালোভাবে বাংলা বলতে পারতাম। আমার ক্রেতাদের মধ্যে বাঙালি ও অবাঙালি সবাই ছিল।...
>
> 'বাঙালি ও অবাঙালিদের মধ্যে কখনো কোনো উত্তেজনা ছিল না। ১৯৭১ সালের মার্চ থেকে আওয়ামী লীগ মিথ্যা গুজব রটানোর মধ্য দিয়ে অবাঙালিদের বিরুদ্ধে ঘৃণা ছড়াতে থাকে।...
>
> '১৯-২০ মার্চ আগ্নেয়গিরির লাভার উদ্গিরণ ঘটে। আওয়ামী লীগ এবং ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস ও পুলিশ বাহিনীর বিদ্রোহীরা অবাঙালি পুরুষ, মহিলা ও শিশুদের পাইকারী হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত হয়। অবাঙালিরা বাঙালি বিদ্রোহীদের প্রতিহত করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ নিজ নিজ বাড়িঘরে গুলি করে তাদের হত্যা করা হয়। অন্যদের টেনে হিঁচড়ে ধান ক্ষেত কিংবা নদীর ধারে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে গুলি করে তাদের হত্যা করা হয়। বহু মৃতদেহ অগভীর গর্তে একসঙ্গে মাটি চাপা দেয়া হয়। অন্যদের লাশ নদীতে ভাসিয়ে দেয়া হয়। বিদ্রোহীরা শিশু বিশেষ করে ছেলে শিশুদের প্রতি কোনো করুণা প্রদর্শন করেনি। বিদ্রোহীরা যৌন নির্যাতনের জন্য সুন্দরী মেয়েদের অপহরণ করে। ১৯৭১ সালের ২৮ এপ্রিল পাকিস্তান সেনাবাহিনী শহর পুনর্দখল করার পর পালানোর আগে অপরাধীরা কোনো কোনো সুন্দরী মেয়েকে গুলি করে কিংবা গলা টিপে হত্যা করে।'
>
> 'কোনো কোনো বাঙালি তাদের অবাঙালি প্রতিবেশীদের রক্ষা করার চেষ্টা করে। জীবনের ওপর গুরুতর হুমকি নিয়ে তারা এ চেষ্টা চালায়। পুলিশ ছিল নিষ্ক্রিয়। পুলিশ বাহিনী বিদ্রোহীদের সঙ্গে হত্যা ও লুণ্ঠনে অংশগ্রহণ করে। যারাই বিদ্রোহীদের চ্যালেঞ্জ করেছে তাদেরকে সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হয়। আমার হিসেবে মৌলভীবাজারে ১৯৭১ সালের মার্চ-এপ্রিলে সংঘটিত হত্যাযজ্ঞে প্রায় ২ হাজার অবাঙালি নিহত হয়।'

www.pathagar.com

ভেড়ামারা

(১১৯) একশো উনিশতম সাক্ষীর বিবরণঃ ১৯৭১ সালের মার্চে পূর্ব পাকিস্তানে বাঙালি বিদ্রোহীরা ২১ বছরের নাসিম জাহানকে অপহরণ ও ধর্ষণ করেছিল। তার আগে হত্যা করা হয়েছিল তার স্বামীকে। পাকিস্তান সেনাবাহিনী ভেড়ামারা মুক্ত করার পর নাসিম জাহানকে ঢাকায় একটি ত্রাণ শিবিরে স্থানান্তর করা হয়। কয়েকজন আত্মীয়ের সঙ্গে তিনি নেপালে পালিয়ে যেতে সক্ষম হন এবং কয়েক মাস কাঠমন্ডুতে অবস্থান করেন। ১৯৭৩ সালের নভেম্বরে নাসিম জাহান করাচিতে প্রত্যাবাসন করেন। তিনি তার জীবনের নির্মম ঘটনার সাক্ষ্য দিতে গিয়ে বলেছেনঃ

'আমরা ভেড়ামারার তালতলা এলাকায় বসবাস করতাম। আমাদের প্রতিবেশীদের বেশির ভাগ ছিল অবাঙালি। আমার স্বামী কদরতুল্লাহ স্থানীয় একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে চাকরি করতেন। বাড়িতে তার দোনলা একটি বন্দুক ছিল।...

'১৯৭১ সালে মার্চের প্রথম সপ্তাহ থেকে আওয়ামী লীগ ক্যাডাররা অবাঙালিদের হুমকি ও ভয়ভীতি প্রদর্শন শুরু করে। মার্চের মাঝামাঝিতে ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস ও আনসার আওয়ামী লীগের সঙ্গে যোগ দিলে রাস্তায় কয়েকজন অবাঙালিকে প্রহার করা হয়।...

'২২ মার্চ সশস্ত্র একদল বিদ্রোহী আমাদের এলাকায় হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত হয়। আমাদের এলাকা রক্তে ভেসে যায়। আক্রমণকারীদের অনেকের কাছে ছিল রাইফেল ও মেশিন-গান। তারা আমাদের বাড়িতে হামলা চালালে আমার সাহসী স্বামী তার দোনলা বন্দুক থেকে গুলি চালিয়ে তাদেরকে কোণঠাসা করে রাখার চেষ্টা করেন। বিদ্রোহীদের গুলিতে আমাদের বাড়ি ঝাঝরা হয়ে যায়। আমাদের গুলি শেষ হয়ে গেলে বন্দুকধারীরা আমাদের বাড়ির সামনের দরজা ভেঙ্গে ভেতরে প্রবেশ করে এবং নিষ্ঠুরভাবে আমার স্বামীকে হত্যা করে। তিনি মৃত্যু যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছিলেন। ঠিক তখন বিদ্রোহীরা বেয়নেট দিয়ে তার মাথায় আঘাত করে। এ হৃদয়বিদারক দৃশ্য এখনো আমাকে তাড়া করে। তাদের কব্জা থেকে আত্মরক্ষায় আমি ছোরা দিয়ে আত্মহত্যা করার চেষ্টা করেছিলাম। এসময় একজন বিদ্রোহী আমাকে কাবু করে ফেলে এবং আমাকে একটি পরিত্যক্ত ভবনে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যায়। সেখানে আমার মতো আরো বহু বন্দি মহিলাকে কঠোর প্রহরায় রাখা হয়েছিল। গভীর রাতে একদল লম্পট আমাদের ভোগ করার জন্য আসে। আমরা ছিলাম তাদের গণিমতের মাল। তাদের ক্রীতদাসী। এ রাত ছিল অবাঙালি আটক মহিলাদের জন্য অসহ্য নির্যাতন, লজ্জা ও পাপের। আমার মনে হতো আমার স্বামীকে বিদ্রোহীরা ১৯৭১ সালের ২২ মার্চ যেভাবে হত্যা করেছে সেভাবে তারা আমাকেও হত্যা করেছে।...

'পরদিন ভোরে একজন আটককারী আমাকে তার লুটের মাল হিসেবে দাবি করে। সে ছিল অবিবাহিত। সে বললো, বাড়িতে তার একজন রাঁধুনি দরকার। বন্দুকের মুখে ছিন্ন শাড়ি পরে লজ্জা ও অশ্রু জলে আমি তার মাটির দেয়াল ঘরে যাই। সে আমাকে হুঁশিয়ার করে দেয় যে, আমি পালানোর চেষ্টা করলে আমাকে ধরে এনে হত্যা করা হবে। এক পক্ষকাল আমি তার বাড়িতে অবস্থান করি। তার জন্য আমি রান্না করতাম। আর সে আমাকে ধর্ষণ করতো। পাকিস্তান সেনাবাহিনী ভেড়ামারা পুনর্দখল করার একদিন আগে

www.pathagar.com

সে আমাকে বললো, সে শহর পরিত্যাগ করবে এবং করুণা হিসেবে আমার জীবন ভিক্ষা দিচ্ছে। শহর থেকে সরে যাবার আগে বিদ্রোহী কমান্ডার অন্যান্য অবাঙালি মহিলাকে হত্যা করার জন্য আটককারীদের নির্দেশ দিয়েছিলেন।'

নারকেলডাঙ্গা

(১২০) **একশো বিশতম সাক্ষীর বিবরণ:** ২২ বছরের মাকসুদ আহমেদ ছিল ভেড়ামারার একজন ছাত্র। ১৯৭১ সালের মার্চে নারকেলডাঙ্গায় অবাঙালি হত্যাযজ্ঞে তার দু'ভাই ও মামা নিহত হয়। মাকসুদ নেপালে পালিয়ে যায় এবং ১৯৭৪ সালের জানুয়ারিতে সে সেখান থেকে করাচিতে প্রত্যাবাসন করে। মাকসুদ তার সাক্ষ্যে বলেছে:

'ভেড়ামারা ও নারকেলডাঙ্গায় বাঙালি ও অবাঙালিরা ভাইয়ের মতো বসবাস করতো। আমরা নারকেলডাঙ্গার ফিরোজপুর কলোনিতে বসবাস করতাম। এ কলোনির অধিকাংশ বাসিন্দা ছিল অবাঙালি। কয়েক বছর আগে একজন অবাঙালি ধর্মীয় নেতা ইন্তেকাল করেন। বাঙালি ও অবাঙালিরা মিলিতভাবে তার জন্য একটি মাজার নির্মাণ করে। প্রতি বছর তার মৃত্যুবার্ষিকীতে ফিরোজপুর বাবা মাজারে বাঙালি ও অবাঙালিদের বিশাল সমাবেশ ঘটতো। আমাদের এলাকার মসজিদে প্রতি ওয়াক্ত নামাজে মুসল্লিদের ভিড় হতো।...

'১৯৭১ সালে মার্চের প্রথম সপ্তাহ থেকে আওয়ামী লীগ মিথ্যা গুজব ছড়িয়ে বাঙালি ও অবাঙালিদের মধ্যে অবিশ্বাসের বীজ বপন করে। আমরা জানতে পেরেছিলাম যে, ভারত থেকে কয়েকজন সশস্ত্র বাঙালি উদ্দেশ্যমূলকভাবে ভেড়ামারা ও নারকেলডাঙ্গায় এসেছে এবং তারা আওয়ামী লীগের স্থানীয় কর্মীদের আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের প্রশিক্ষণ দিচ্ছে।...

৫২ বছরের জমির আলী নারকেলডাঙ্গার ফিরোজপুর কলোনিতে বসবাস করতেন। ১৯৭১ সালে মার্চের শেষ দু'সপ্তাহে তিনি তার চাচাতো ভাইয়ের সঙ্গে রাইতায় অবস্থান করছিলেন। তার চাচাতো ভাই একজন বাঙালি মহিলাকে বিয়ে করেছিলেন। তিনি ছিলেন একজন ঠিকাদার এবং রাইতায় রেলওয়ের স্টাফের সঙ্গে ব্যবসা করতেন। জমির আলীর জানা মতে, ১৯৭১ সালে মার্চের শেষ সপ্তাহে রাইতায় বাঙালি বিদ্রোহীরা ৬টি অবাঙালি পরিবারকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়। তাদের লাশ পদ্মা নদীতে ভাসিয়ে দেয়া হয়। মার্চের মাঝামাঝি রাইতায় জমির আলীর চাচাতো ভাইয়ের বাড়ি আক্রান্ত হয়। কিন্তু তার বাঙালি স্ত্রী যার পিতা ছিলেন একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি তার আকুল আবেদনে জমিরের চাচাতো ভাইয়ের পরিবার রক্ষা পায়। ১৯৭৩ সালের ডিসেম্বরে জমির আলী পাকিস্তানে প্রত্যাবাসন করেন।

রাইতায় অবস্থানকালে নারকেলডাঙ্গায় জমির আলীর এক রুমের বাড়ি লুট করা হয়। তার কোনো পরিবার ছিল না। ১৯৬৭ সালে গুটিবসন্তে তার স্ত্রী ও ছেলে মারা যায়। জমির আলী জানান, রাইতা এবং কুষ্টিয়া জেলার অন্যান্য জায়গা থেকে বাঙালি বিদ্রোহীরা ব্যাপকভাবে ভারতে পালিয়ে যায়। ভেড়ামারা ও নারকেলডাঙ্গা থেকে পশ্চিমবঙ্গের পথে

www.pathagar.com

পলায়নকারী বাঙালি বিদ্রোহীরা রাইতায় বহু অবাঙালি কিশোরীকে সঙ্গে করে নিয়ে আসে। যেসব অবাঙালি মেয়ে পালানোর চেষ্টা করেছিল তাদেরকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়।

(১২১) **একশো একুশতম সাক্ষীর বিবরণ:** ৪৪ বছরের রাজ্জাক আলী ভেড়ামারায় একটি ক্ষুদ্র ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে চাকরি করতেন এবং বসবাস করতেন সেখানেই। তবে তিনি ১৯৭১ সালে মার্চের শেষ সপ্তাহে কুমারখালীতে অবস্থান করছিলেন। তিনি জানান, ১৯৭১ সালে মার্চের শেষ সপ্তাহে কুমারখালীতে বাঙালি বিদ্রোহীরা ১০০ অথবা তার চেয়ে বেশি অবাঙালিকে হত্যা করে। ১৯৭৪ সালের জানুয়ারিতে তিনি পাকিস্তানে প্রত্যাবাসন করেন। তিনি তার সাক্ষ্যে বলেছেন:

> 'আমার জন্ম কলকাতায় এবং আমার পিতা বিহারের লোক হলেও আমি স্থানীয়দের মতো বাংলা বলতে পারতাম। ১৯৪৭ সালে উপমহাদেশ বিভক্তিকালে আমি কুষ্টিয়া জেলায় বসতি স্থাপন করি। আওয়ামী লীগ ও তাদের সমর্থকরা ভেড়ামারার প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের অধিকাংশকে হত্যা করে। আমি ছিলাম অবিবাহিত। আমি একটি বাঙালি পরিবারের সঙ্গে বসবাস করতাম। এ বাঙালি পরিবারকে কলকাতা থেকে চিনতাম। জরুরী ব্যবসায়িক প্রয়োজনে আমাকে কাঠমন্ডু যেতে হয়েছিল। বাংলা ভাষায় চমৎকার দখল থাকায় বাঙালি বিদ্রোহীরা আমাকে শনাক্ত করতে পারেনি। ২৮ মার্চ আমি কুমারখালীতে কয়েক ডজন অবাঙালির লাশ দেখেছি। তাদের ঘরবাড়ি ছিল লুণ্ঠিত ও অগ্নিদগ্ধ।...'

www.pathagar.com

উনিশতম অধ্যায়

রংপুরে হত্যাকাণ্ড

১৯৭১ সালে মার্চের দ্বিতীয় সপ্তাহে রংপুরে আওয়ামী লীগের জঙ্গি কর্মী ও ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলসের বাঙালি বিদ্রোহীরা অবাঙালিদের বিরুদ্ধে রণ উন্মাদনায় মেতে উঠে। বাঙালি অধ্যুষিত এলাকায় বসবাসকারী অবাঙালিদের আতঙ্কিত করে তোলা হয় এবং ঘরবাড়ি থেকে তাদের বের করে দেয়া হয়। কাউকে কাউকে অপহরণ করা হয় এবং নিকটবর্তী ধানক্ষেতে তাদের কুপিয়ে হত্যা করা হয়। পুলিশ বাহিনী বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগদান করে। ১৯৭১ সালে মার্চের শেষ সপ্তাহে বাঙালি বিদ্রোহীরা অবাঙালিদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধ ঘোষণা করে। সে সময় সশস্ত্র জনতা শহরে অবাঙালি প্রধান এলাকাগুলোতে হামলা চালায় এবং ৫ হাজারের বেশি নিরাপরাধ পুরুষ, মহিলা ও শিশুকে হত্যা করে।

রংপুর জেলার প্রায় প্রতিটি শহরকে বিদ্রোহ ও রক্তপাতের অগ্নিশিখা গ্রাস করে। সৈয়দপুর, নীলফামারি ও লালমনিরহাটে অবাঙালিদের প্রাণহানি ঘটে সবচেয়ে বেশি। এ তিনটি শহরে অবাঙালিদের মৃত্যুর সংখ্যা ছিল ৬ থেকে ১০ হাজার। লাশ নদীতে ভাসিয়ে দেয়ায় অথবা প্রজ্বলিত বাড়িঘরে পুড়িয়ে ফেলায় নিহতদের প্রকৃত সংখ্যা কখনো নির্ণয় করা সম্ভব নয়।

(১২২) **একশো বাইশতম সাক্ষীর বিবরণ:** ২৬ বছরের মোহাম্মদ ইউসুফ রংপুরে একজন মোটর মেকানিক হিসেবে কাজ করতেন। ইউসুফ হলেন ১২-সদস্যের একটি পরিবারের একমাত্র জীবিত ব্যক্তি। ১৯৭১ সালে মার্চের শেষ সপ্তাহে বিদ্রোহীরা তার পিতামাতা, পাঁচ ভাই ও চার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়কে হত্যা করে। ১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে তিনি ঢাকা থেকে করাচিতে প্রত্যাবাসন করেন। ইউসুফ রংপুর শহরে অবাঙালি হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে তার সাক্ষ্যে বলেছেন:

> '১৯৭১ সালের ২৭ মার্চ রাতে আওয়ামী লীগের প্রায় ৫০০ সশস্ত্র কর্মী এবং ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলসের বিদ্রোহী সৈন্যরা আমাদের বিহারী অধ্যুষিত কলোনি ঘেরাও করে বহু বাড়িঘর লুট ও অগ্নিসংযোগ করে। ঘেরাও থেকে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করায় বহু অবাঙালি গুলিতে নিহত হয়। বিদ্রোহীরা আমাদের ছোট বাড়িতে প্রবেশ করে এবং তাদের বন্দুক থেকে আমাদের ওপর গুলিবর্ষণ করে। আমরা সবাই রক্তস্রোতে মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করছিলাম। আমাদের ক্ষত স্থান থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত বের হচ্ছিল। আমার বাম উরুতে গুলি লাগলে আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলি। পরদিন সকালে আমার জ্ঞান ফিরে এলে আমি দেখতে পাই যে, আমাদের ১২-সদস্যের পরিবারের মধ্যে একমাত্র আমি জীবিত। একটি পরিত্যক্ত গোলাঘর ছিল আমার গোপন আশ্রয়স্থল। পাকিস্তান সেনাবাহিনী এসে পৌঁছানো নাগাদ আমি এ গোপন আশ্রয়স্থলে অবস্থান করি। ১৯৭১ সালের ২৬ এপ্রিল বিদ্রোহীরা শহর থেকে পিছু হটে।'

www.pathagar.com

'রংপুরে বিদ্রোহীদের ধ্বংসলীলা সাধন ছিল পূর্বপরিকল্পিত ও বেপরোয়া। এ ধ্বংসযজ্ঞের পরিধি ও ভয়াবহতা ছিল অবাঙালিদের ধারণার অতীত। হত্যাযজ্ঞ থেকে বেঁচে যাওয়া কয়েকজনের কাছ থেকে আমি জানতে পারি যে, অবাঙালি পুরুষ ও তাদের পুত্র সন্তানদের হত্যা করার পর বিদ্রোহীরা মহিলাদের ইকবাল হাই স্কুলে তাড়িয়ে নিয়ে যায়। বন্দুকের মুখে যুবতী মহিলাদের উলঙ্গ করা হয় এবং তাদেরকে উলঙ্গ অবস্থায় পার্শ্ববর্তী একটি ভবনে যেতে বাধ্য করা হয়। সেখানে বিদ্রোহীরা তাদের ওপর যৌন উৎপীড়ন চালায়। রংপুর থেকে পিছু হটার আগে বিদ্রোহীরা এসব হতভাগ্য যুবতীকে হত্যা করে। তাদের নগ্ন লাশ হয়তো নদীতে কিংবা চির সবুজ মাঠে ফেলে দেয়া হয়।'

(১২৩) **একশো তেইশতম সাক্ষীর বিবরণ:** ২১ বছরের জুনায়েদ আহমেদ ছিল রংপুরের একজন কলেজ ছাত্র। সে সাত গম্বুজ রোডে তার পিতামাতা ও দু'ভাইয়ের সঙ্গে একটি ভাড়া বাসায় বাস করতো। ১৯৭১ সালের ২৩ মার্চ তাদের এলাকায় অবাঙালি নিধনকালে সে আহত হয়। ১৯৭৪ সালের জানুয়ারিতে জুনায়েদ ঢাকা থেকে করাচিতে প্রত্যাবাসন করে। অবাঙালি নিধনের বর্ণনা দিতে গিয়ে সে বলেছে:

'আমার পিতা আকিল আহমেদ ছিলেন বিহারের পাটনা হাইকোর্টের একজন কেরাণী। ১৯৪৭ সালের আগস্টে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর আমার পিতামাতা পূর্ব পাকিস্তানে অভিবাসন করেন এবং রংপুরে বসতি স্থাপন করেন। আমার জন্ম রংপুরে। আমরা চমৎকার বাংলা বলতে পারলেও আমাদেরকে বিহারী হিসেবে গণ্য করা হতো। বিহারে আমাদের কোনো আত্মীয়-স্বজন ছিল না। রংপুর ছিল আমার আবাসভূমি।...

'১০ মার্চ আওয়ামী লীগের একদল লোক বন্দুক, বর্শা ও ছোরা সজ্জিত হয়ে অবাঙালি বসতি ও দোকানপাটে হামলা চালালে রংপুরে শান্তি বিপন্ন হয়। কয়েকজন বিহারীকে হত্যা অথবা আহত করা হয়। এ ঘটনার পর অবাঙালিরা ভীতির মধ্যে বাস করতো এবং প্রায় প্রতিদিন আওয়ামী লীগের গুণ্ডাদের হাতে একজন বা দু'জন অবাঙালি প্রহৃত হওয়ার খবর পাওয়া যেতো। বিদ্রোহীরা অবাঙালিদের ব্যাপক ধরপাকড় করছিল।...

'২৩ মার্চ আওয়ামী লীগের প্রায় ৬শ' সন্ত্রাসী এবং ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলসের বিদ্রোহী সৈন্যরা আমাদের এলাকায় হামলা চালায়। তারা অবাঙালিদের বাড়িঘরে গুলিবর্ষণ এবং হত্যাকাণ্ড চালায়। এসব সশস্ত্র লোককে প্রতিহত করার মতো কোনো অস্ত্র আমাদের কাছে ছিল না। তারা আমার এবং আমার পরিবারের অন্যান্য সদস্যের ওপর গুলি চালায়। আমি অলৌকিকভাবে বেঁচে যাই।...

'আমার হিসেব অনুযায়ী আমাদের এলাকায় মৃতের সংখ্যা পাঁচ হাজারের কাছাকাছি। বন্দুকধারীরা ২ হাজার পুরুষ, ৭শ' মহিলা এবং ২ হাজার তিন শ' শিশুকে হত্যা করে। তারা অন্তত ৫০০ কিশোরী মেয়েকে অপহরণ করে। অপহৃত কিশোরীদের অনেককে ধর্ষণ ও হত্যা করা হয়। বিদ্রোহীরা কয়েকজনকে ভারতে নিয়ে যায়।

(১২৪) **একশো চব্বিশতম সাক্ষীর বিবরণ:** ৪৮ বছরের জামাল আহমেদ রংপুর শহরের আলমনগর কলোনিতে বসবাস করতেন। তিনি রংপুরে একটি খুচরা দোকানে চাকরি করতেন। ব্যবসায়িক প্রয়োজনে জামাল আহমেদ মাঝে মধ্যে পার্শ্ববর্তী শহরগুলোতে যাতায়াত করতেন। তিনি অনর্গল বাংলায় কথা বলতে পারতেন। কিশোরগঞ্জে তার প্রচুর

www.pathagar.com

বাঙালি ও অবাঙালি বন্ধু ছিল। ২৩-২৪ মার্চ তিনি কিশোরগঞ্জে অবস্থান করছিলেন। সেদিন আওয়ামী লীগের একটি মিছিলে অংশগ্রহণকারীরা বেপরোয়া হয়ে উঠে এবং অবাঙালিদের বাড়িঘর ও দোকানপাট লুট করে। পরবর্তী দিনগুলোতে আওয়ামী লীগের সন্ত্রাস অবাঙালিদের জন্য আকস্মিক বিপর্যয় ডেকে আনে। পাইকারীভাবে অবাঙালিদের হত্যা করা হয়। জামাল আহমেদ জানিয়েছেন, সন্ত্রাসীরা অবাঙালিদের কোনো প্রশ্ন না করে তাদের ওপর গুলিবর্ষণ করে। কিশোরগঞ্জে জামাল আহমেদের বাঙালি ব্যবসায়ী বন্ধু তাকে রক্ষা করেন। তিনি তার বাড়িতে এক সপ্তাহের বেশি অবস্থান করেন। এপ্রিলের তৃতীয় সপ্তাহে রংপুরে ফিরে এসে বিস্মিত হয়ে তিনি দেখতে পান যে, আলমনগরে তার বাড়ি লুণ্ঠিত এবং স্ত্রী ও ভ্রাতৃবধূ অপহৃত। কয়েক মাস তিনি পাগলের মতো তাদের খুঁজেছেন। কিন্তু তিনি তাদের কোনো সন্ধান পাননি। ১৯৭৩ সালের নভেম্বরে তিনি করাচিতে প্রত্যাবাসন করেন।

জামাল আহমেদ জানান যে, ১৯৭১ সালে মার্চের শেষ সপ্তাহ এবং এপ্রিলের প্রথম পক্ষকালে বাঙালি বিদ্রোহীরা বদরগঞ্জ, মহীগঞ্জ, পীরগাছা ও কাউনিয়ায় বসবাসকারী সংখ্যালঘু অবাঙালিদের নির্মূল করে দেয়। আওয়ামী লীগ ও তাদের সমর্থকরা ছিল অবাঙালি হত্যাকাণ্ডের মূল পরিকল্পনাকারী ও বাস্তবায়নকারী। ১৯৭১ সালে এপ্রিলের শেষদিকে পাকিস্তান সেনাবাহিনী রংপুরে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার পর তাদের অধিকাংশ ভারতের পশ্চিমবঙ্গে পালিয়ে যায়। জামাল আহমেদ দাবি করেছেন, তিনি কিশোরগঞ্জে কুচবিহার জেলার বাঙালি হিন্দুদের দেখেছেন। এসব হিন্দু ছিল সুসজ্জিত। তিনি আরো জানিয়েছেন, আওয়ামী লীগের ক্যাডাররা তিস্তা নদীতে লঞ্চে বহু অবাঙালি যাত্রীকে হত্যা করে। একজন সারেংয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একজন বাঙালি বন্ধুর কাছ থেকে তিনি এ তথ্য জানতে পেরেছেন। তিনি তার সাক্ষ্যে আরো বলেছেন, ১৯৭১ সালে মার্চের তৃতীয় সপ্তাহে বাঙালি বিদ্রোহীরা কিশোরগঞ্জের প্রায় সব অবাঙালিকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বিশতম অধ্যায়

নীলফামারি ও সৈয়দপুর বিধ্বস্ত

১৯৭১ সালের মার্চে গোলযোগের আগে রংপুর জেলার নীলফামারি শহরে প্রায় ৫ হাজার অবাঙালি বসবাস করতো। ২৩ থেকে ৩০ মার্চ পর্যন্ত তাদের প্রায় অর্ধেক নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। আওয়ামী লীগের স্বেচ্ছাসেবকরা ছিল এ হত্যাকাণ্ডের উসকানিদাতা ও বাস্তবায়নকারী। ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস বা ইপিআরের বিদ্রোহীরা তাদের সহযোগিতা করে।

(১২৫) **একশো পঁচিশতম সাক্ষীর বিবরণঃ** ২৪-২৫ মার্চ রাতে কপিলমনি এলাকায় হত্যাযজ্ঞে ৫৫ বছরের জামিলা খাতুনের তিন পুত্র, দু'কন্যা ও পুত্রবধূ নিহত হয়। জামিলা খাতুন জানিয়েছেন, পিশাচরা বহু অবাঙালি কিশোরীকে অপহরণ করেছিল এবং শহর থেকে পিছু হটার আগে পরিত্যক্ত পুকুরে তাদের লাশ পাওয়া যায়। জামিলা খাতুন তার সাক্ষ্যে বলেছেনঃ

> 'আমরা নীলফামারিতে দীর্ঘদিন বসবাস করছিলাম। আমরা সবাই চমৎকার বাংলা বলতে পারতাম। আমার স্বামীর মৃত্যুর পর ছেলেরা আমার দেখাশোনা করতো।...
> '১৯৭১ সালে মার্চের তৃতীয় সপ্তাহ থেকে অবাঙালিরা বিক্ষিপ্ত সহিংসতার শিকার হয়। আমরা গুজব শুনতে পেয়েছিলাম যে, আওয়ামী লীগ ও বিদ্রোহী পুলিশ অবাঙালিদের হত্যার পরিকল্পনা করছে। তবে আমাদের পালানোর কোনো পথ ছিল না।...
> '২৪ মার্চ সকালে সুসংগঠিত সহিংসতার লেলিহান শিখা আমাদের এলাকাকে গ্রাস করে। একদল সশস্ত্র দুষ্কৃতকারী অবাঙালিদের বাড়িঘরে হামলা চালিয়ে বাসিন্দাদের নির্মমভাবে হত্যা এবং তাদের বাড়িঘর লুট করে। কয়েকটি বাড়ি পুড়িয়ে দেয়া হয়। রাতে সন্ত্রাসীরা আমাদের বাড়ির দরজা ভেঙ্গে ভেতরে প্রবেশ করে এবং কোনো কথা না বলে আমাদের ওপর গুলি চালায়। আমিসহ আমার তিন পুত্র, দু'কন্যা ও পুত্রবধূ গুলিবিদ্ধ হই। গুলিবিদ্ধ হয়ে আমরা রক্তের নদীতে ভাসতে থাকি। আক্রমণকারীরা দ্রুত আমাদের বাড়ি লুট করে এবং পরবর্তী হত্যাকাণ্ড চালানোর জন্য বেরিয়ে যায়। আমার পায়ে গুলি লাগলে আমি অজ্ঞান হয়ে যাই। পরদিন ভোরে আমি জ্ঞান ফিরে পাই। তাকিয়ে দেখলাম আমি ছাড়া আমার আর কোনো আপনজন জীবিত নেই। আমার বাড়িতে এক বীভৎস দৃশ্য! পাকিস্তান সেনাবাহিনী নীলফামারিতে নিয়ন্ত্রণ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার পর লাশগুলো দাফন করা হয়। আমি দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেললে ১৯৭১ সালের শেষদিকে চট্টগ্রামে এক আত্মীয়ের সঙ্গে বসবাস করতে যাই। আমার জীবনের ট্রাজেডি আমাকে অন্ধ করে দিয়েছে। ১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে আমি করাচিতে প্রত্যাবাসন করি।'

www.pathagar.com

সৈয়দপুর

(১২৬) **একশো ছাব্বিশতম সাক্ষীর বিবরণ:** ৪২ বছরের নূরুদ্দিন আহমেদ ছিলেন পূর্ব পাকিস্তান রেলওয়ের একজন কর্মচারী। তিনি সৈয়দপুরে ৫৯/এ রেলওয়ে কোয়ার্টারে বসবাস করতেন। সৈয়দপুরে নিহত অবাঙালিদের মধ্যে তার মেয়ে জামাইও ছিল। বিদ্রোহীরা তার মেয়েকে অপহরণ করেছিল। অবাঙালিদের বাড়িঘরে হামলার ভয়াবহ দিনে নূরুদ্দিন তার বাড়িতে ছিলেন না। তাই তিনি হত্যাকাণ্ড থেকে রক্ষা পান। সৈয়দপুরে অবাঙালি হত্যাকাণ্ডের বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন:

> '১৯৪৭ সালে আমি পাকিস্তানে চাকরি করার পক্ষে মত দেই এবং হাওড়া রেলওয়ে স্টেশন থেকে চট্টগ্রামে স্থানান্তরিত হই। পরে আমি সৈয়দপুরে বদলি হই। আমি সেখানে ১১ বছর বসবাস করেছি। আমি রেলওয়ের একজন তরুণ কর্মচারীর কাছে আমার মেয়ে শেহলাকে বিয়ে দেই। তারা রেলওয়ের একটি পৃথক কোয়ার্টারে বসবাস করতো।...
> '১৯৭১ সালে মার্চের শেষ সপ্তাহে গুরুত্বপূর্ণ রেলওয়ে কেন্দ্র সৈয়দপুর হত্যাযজ্ঞে কমপক্ষে ৫ হাজার অবাঙালি নিহত হয়। ২৫ মার্চ আওয়ামী লীগের একদল সশস্ত্র স্বেচ্ছাসেবক এবং ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলসের বিদ্রোহীরা সৈয়দপুরে রেলওয়ে কলোনিসহ অবাঙালি আবাসিক এলাকা আক্রমণ করে। তারা আমার মেয়ে জামাই ও তার দু'ভাইকে হত্যা করে। আমার মেয়ে ও তার ননদকে অপহরণ করে। পাকিস্তান সেনাবাহিনী সৈয়দপুরে নিয়ন্ত্রণ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করলে আমি তাদের খুঁজে বের করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করি। কিন্তু আমি তাদের ভাগ্য সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারিনি।...
> '১৯৭১ সালে এপ্রিলের শুরুতে পাকিস্তান সেনাবাহিনী সৈয়দপুর পুনর্দখল করার পর শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং বাঙালি বিদ্রোহীদের পরিচালিত হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ গ্রহণে অবাঙালিদের বিরত রাখার উদ্দেশ্যে স্থানীয় প্রশাসন একটি শান্তি কমিটি গঠন করে। ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে পূর্ব পাকিস্তানে ভারতীয় সামরিক বাহিনী বিজয়ী হলে আমরা নতুন করে দুর্ভোগের শিকার হই। মুক্তিবাহিনী বহু অবাঙালিকে হত্যা করে। অনেক কষ্টে আমি নেপালে পালিয়ে যেতে সক্ষম হই। ১৯৭৩ সালের জুলাইয়ে সেখান থেকে আমি করাচিতে ফিরে আসি।'

(১২৭) **একশো সাঁইশতম সাক্ষীর বিবরণ:** ৪২ বছরের হাসিনা বেগম হলেন সৈয়দপুরে অবাঙালি হত্যাকাণ্ডের আরেকজন প্রত্যক্ষদর্শী। তার ছেলে ছিল কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশনের কর্মচারী। হাসিনা বেগম জানিয়েছেন যে, ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ বাঙালি বিদ্রোহীরা তার বাড়ি লুট করে। সেদিন বিদ্রোহীরা অবাঙালিদের বিরুদ্ধে তাণ্ডবলীলায় মেতে উঠে। হাসিনা বেগমের ছেলে মার্চে সংঘটিত হত্যাযজ্ঞ থেকে বেঁচে যায়। তবে ১৯৭১ সালে ডিসেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে মুক্তিবাহিনী তাকে অপহরণ করে। পরে তার আর কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি। ১৯৭৩ সালের ডিসেম্বরে হাসিনা বেগম করাচিতে এসে পৌঁছান।

অন্যান্য প্রত্যক্ষদর্শী জানিয়েছেন, ১৯৭১ সালের ২৪-২৫ মার্চ সৈয়দপুরে অবাঙালিদের বিরুদ্ধে কমপক্ষে ৮ হাজার সশস্ত্র বাঙালি বিদ্রোহী রক্তপাতে অংশগ্রহণ করে। হত্যাযজ্ঞ শুরু

www.pathagar.com

করার আগে বিদ্রোহী জনতা হত্যাকাণ্ডের নীলনকশা প্রণয়ন করে এবং সৈয়দপুরে অবাঙালিদের বাড়িঘর চিহ্নিত করে। বাড়িঘরে হামলা চালানোর আগে অবাঙালিদের প্রতিটি বাড়ি লুট এবং ভস্মীভূত করা হয়। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর একটি জীপ মহাসড়ক ধরে এগিয়ে আসছিল। একদল উচ্ছৃঙ্খল জনতা শহরের প্রান্তসীমায় এ জীপে হামলা চালায়। জীপের আরোহী ৫ জন পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যকে নাস্তানাবুদ করা হয় এবং গুলি করে তাদের হত্যা করা হয়। জীপটি কেড়ে নেয়া হয় এবং ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলসের একটি বিদ্রোহী গ্রুপ তাদের ধ্বংসাত্মক কাজে জীপটি ব্যবহার করে।

সৈয়দপুরের প্রত্যক্ষদর্শীরা আরো জানিয়েছেন, ১৯৭১ সালে মার্চের তৃতীয় সপ্তাহে গোটা প্রশাসন আওয়ামী লীগের বিদ্রোহে যোগদান করে। ১৯ মার্চ আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ ও জেলা কর্মকর্তাদের একটি বৈঠকে রংপুরের জেলা প্রশাসক সভাপতিত্ব করেন। এ বৈঠকে অবাঙালিদের কয়েকজন নেতাকে তলব করে জানিয়ে দেয়া হয় যে, বিদ্রোহে সক্রিয়ভাবে সমর্থন না দিলে তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হবে।

১৯৭১ সালের ২৩ মার্চ গভীর রাতে এক লাখের বেশি সশস্ত্র বাঙালি বিদ্রোহী সৈয়দপুর ও গোলাহাটে অবাঙালি বসতি ও সৈয়দপুর সেনানিবাসে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ছাউনিতে হামলা চালায়। ৩৬ ঘণ্টা অবরোধ অব্যাহত থাকে। এসময় বাঙালি বিদ্রোহীরা সৈয়দপুর শহরে অবাঙালিদের ৯৪টি বাড়ি ও দোকান লুট করে। সেনানিবাসে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের বাঙালি সৈন্যরা বিদ্রোহ করে এবং পশ্চিম পাকিস্তানি অফিসার ও সৈন্যদের ওপর হামলা চালায়। প্রাথমিক বিপর্যয় কাটিয়ে উঠে পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যরা বাঙালি সৈন্য এবং এ শহর ও তার আশপাশের বিদ্রোহীদের পরাজিত করে। পশ্চিম পাকিস্তানি সেনা কর্মকর্তা ক্যাপ্টেন ফতেহ মোহাম্মদ শাহ সেনানিবাস থেকে এক কোম্পানি সৈন্য নিয়ে বের হয়ে যান এবং সৈয়দপুর ও রেলওয়ে স্টেশনে অবরুদ্ধ অবাঙালিদের উদ্ধার করেন। ১৯৭১ সালে ২৯ মার্চের সকাল নাগাদ সৈয়দপুর শহর ও গোলাহাটে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর দৃঢ় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বিশৃঙ্খল অবস্থায় বিদ্রোহীরা পিছু হটে। ২৩-২৪ মার্চ বাঙালি বিদ্রোহীরা সৈয়দপুর সেনানিবাসে আক্রমণ চালানোর কয়েকদিন আগে আওয়ামী লীগের বিদ্রোহীরা সৈয়দপুর রেলওয়ে স্টেশন থেকে সেনাবাহিনীর ছাউনিতে সরবরাহ প্রেরণে অবরোধ সৃষ্টি করে। তবে ইসলামাবাদ থেকে সর্বোচ্চ সংযম প্রদর্শনে সেনাবাহিনীর প্রতি নির্দেশ থাকায় সৈয়দপুরে পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যরা আওয়ামী লীগের জঙ্গিদের বিরুদ্ধে কোনো ধরনের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। তবে সেনানিবাস দখলে বিদ্রোহীদের ব্যর্থ চেষ্টার পরই পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যরা ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

পূর্ব পাকিস্তান সংকটে ১৯৭১ সালের আগস্টে প্রকাশিত পাকিস্তান সরকারের শ্বেতপত্রে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ সৈয়দপুরে উসকানিমূলক ঘটনাবলীর নিম্নোক্ত বর্ণনা দেয়া হয়:

> 'রাইফেল, শটগান ও ছোরা সজ্জিত হয়ে আশপাশের গ্রামগুলো থেকে আগত উন্মত্ত জনতার চারটি দল সৈয়দপুর শহরে সমবেত হয় এবং পার্শ্ববর্তী গোলাহাটে হামলা চালিয়ে তিনজনকে হত্যা এবং ১৭ জনকে আহত করে।...

www.pathagar.com

'আহতদের মধ্যে দু'জন গুলিবিদ্ধ হয়েছিল। অন্যদিকে আরো ৭ জন শটগানের গুলিতে আহত হয়। বাদবাকিরা আহত হয় লাঠি ও ছোরার আঘাতে। ৫০টি বাড়ি ভস্মীভূত হয়। সৈন্যদেরকে গুলি চালাতে হয়। এতে তিনজন আহত হয়। পরবর্তীতে আরেক দল উন্মত্ত জনতা সৈয়দপুর সেনানিবাস আক্রমণ করে। তারা সৈন্যদের প্রতি শটগানের গুলিবর্ষণ করে। সৈন্যরা গুলি চালালে ৫ জন আহত হয়।'

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, ২৫ মার্চ আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সৈয়দপুরে অবাঙালিদের ওপর একটি উন্মত্ত জনতা হামলা চালায়। আওয়ামী লীগের জঙ্গিরা অবাঙালিদের বাড়িঘর লুট ও অগ্নিসংযোগ এবং তাদের হত্যা করতে জনতাকে উসকানি দিয়েছিল। বিদ্রোহীরা নিকটবর্তী গোলাহাটে সহিংসতায় লিপ্ত হয়। সেখানে অবাঙালিদের বেশির ভাগ নিহত কিংবা আহত হয়। ট্রেন থামিয়ে অবাঙালি যাত্রীদের তুলে নেয়া বাঙালি বিদ্রোহীদের কাছে একটি আনন্দদায়ক বিষয়ে পরিণত হয়।

www.pathagar.com

একুশতম অধ্যায়

লালমনিরহাটে হত্যাকাণ্ড

১৯৭১ সালে মার্চের প্রথম সপ্তাহে রংপুর জেলার গুরুত্বপূর্ণ রেলওয়ে কেন্দ্র লালমনিরহাটে আওয়ামী লীগের বিদ্রোহের রেশ অনুভূত হয়। স্থানীয় আওয়ামী লীগ ও তাদের সমর্থকরা অবাঙালিদের ভীতি প্রদর্শনে নিয়মিত শক্তির মহড়া দিতো। লাঠি, ছোরা ও শটগান সজ্জিত হয়ে তারা অবাঙালি অধ্যুষিত এলাকাগুলোয় মিছিল বের করতো। ১৯৭১ সালের ৯ মার্চ আওয়ামী লীগের সশস্ত্র স্বেচ্ছাসেবক ও ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলসের বিদ্রোহীরা রেলওয়ে স্টেশনের অদূরে অবাঙালিদের বাড়িঘরে হামলা চালায় এবং ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে। তারা লুণ্ঠন ও অগ্নিসংযোগ করে। প্রায় ২শ' অবাঙালিকে হত্যা করে। মার্চের শেষ সপ্তাহে তাদের উন্মত্ততা তুঙ্গে পৌঁছে। বিদ্রোহীরা শহরে আরো ৮ শ' অবাঙালিকে হত্যা করে। প্রায় ৫শ' অবাঙালি মহিলাকে অপহরণ করা হয়। অপহরণকারীরা তাদের ধর্ষণ করে।

(১২৮) **একশো আটাইশতম সাক্ষীর বিবরণ:** ৩০ বছরের জোহরা বেগমের স্বামী মোহাম্মদ ইসরাইল ছিলেন একটি দোকান ও একটি বাড়ির মালিক। ১৯৭১ সালের মার্চে লালমনিরহাটে সংঘটিত লোমহর্ষক ঘটনাবলীর বিবরণ দিতে গিয়ে জোহরা বেগম বলেছেন:

> 'প্রতিবেশী বাঙালিদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক সৌহার্দপূর্ণ হলেও শহরের অন্যান্য অংশে সক্রিয় আওয়ামী লীগের স্বেচ্ছাসেবকরা আমাদের এলাকায় অবাঙালিদের আতঙ্কিত করে তোলে। আমি ও আমার স্বামী আমাদের সন্তানদের নিয়ে চট্টগ্রামে স্থানান্তরিত হতে চেয়েছিলাম। সেখানে আমাদের আরেকটি ছোট বাড়ি ছিল। কিন্তু ট্রেন ও বাসে অবাঙালি হত্যাকাণ্ড চলতে থাকায় লালমনিরহাট থেকে আমাদের রওনা দেয়া ছিল ঝুঁকিপূর্ণ।...
>
> '৯ মার্চ বড় ধরনের গোলযোগ হয়। সেদিন প্রায় ২শ' সশস্ত্র বাঙালি বিদ্রোহী আমাদের এলাকায় হামলা চালায় এবং অবাঙালিদের বাড়িঘর লুট ও অগ্নিসংযোগ করে। তারা আমাদের দোকান লুট করে পুড়িয়ে দেয়। বিদ্রোহীরা আমাদের বাড়িতে প্রবেশ করে আমার স্বর্ণালঙ্কারসহ মূল্যবান জিনিস লুট করে। আমার স্বামী ছিলেন বাইরে। বাঙালি বিদ্রোহীরা আমাকে ও আমার দু'সন্তানকে বের করে দিয়ে আমাদের বাড়িতে আগুন দেয়। কয়েকজন বাঙালি প্রতিবেশী আমাদের জীবন রক্ষার অনুরোধ করে। তাদের অনুরোধে বিদ্রোহীরা আমাদের রেহাই দেয়। আমরা আমাদের বাড়ি জ্বলতে দেখি। আমরা হতাশায় আমাদের হাত পাকাই। বন্দুকের গুলির শব্দ এবং বাসিন্দাদের আর্তচিৎকারে আমার কানে তালা লেগে যায়।...
>
> 'সারারাত আমরা উঠানে বসে থাকি। সকালে অগ্নিকাণ্ডের তীব্রতা কমে আসে। আগুনে আমাদের বাড়ির তিন-চতুর্থাংশ পুড়ে যায়। আমরা ভেতরে ঢুকি এবং সেনাবাহিনী লালমনিরহাট মুক্ত করা নাগাদ আমরা সেখানে অবস্থান করি। সত্যি কথা বলতে গেলে আমাদের বাড়ির বেশির ভাগ পুড়ে যাওয়ায় আমাদের জীবন রক্ষা পায়। বিদ্রোহীরা

www.pathagar.com

মার্চের তৃতীয় সপ্তাহে আবার আমাদের এলাকায় তৎপর হয়ে উঠে। আমার স্বামী আমাদের সঙ্গে মিলিত হন। কিন্তু বিদ্রোহীরা সকল অবাঙালি পুরুষকে হত্যা করতে শুরু করায় আমরা তাকে লুকিয়ে রাখি।...

'আমাদের বাড়িতে কোনো খাদ্য ও পানীয় ছিল না। এ সময় ২৯ মার্চ পাকিস্তানি সৈন্যরা লালমনিরহাটে প্রবেশ করে আমাদের উদ্ধার করে। তারা আমাদেরকে চট্টগ্রামে স্থানান্তরের ব্যবস্থা করে। কিন্তু চট্টগ্রামে আমাদের বাড়ি পুড়িয়ে দেয়া হয়েছিল। আওয়ামী লীগের ক্যাডাররা মার্চের মাঝামাঝি আমাদের বাড়িটি পুড়িয়ে দেয়। আমরা একটি ভাড়া বাসায় বসবাস করতাম। আমার স্বামী ফেরি করতেন। এতে তার যথেষ্ট রোজগার হতো।...

'১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর ভারতীয় সৈন্য ও মুক্তিবাহিনী পূর্ব পাকিস্তান দখল করে নিলে আমাদের নতুন করে দুর্ভোগ শুরু হয়। মুক্তিবাহিনী আমাদের বাড়ি লুট করে এবং আমাদেরকে রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে। আমরা চট্টগ্রামে সরদার বাহাদুর স্কুলে অবাঙালিদের একটি শিবিরে আশ্রয় নেই। ১৯৭১ সালের ১৮/১৯ ডিসেম্বর রাতে মুক্তিবাহিনীর নেতৃত্বে একদল সশস্ত্র লোক এ স্কুল আক্রমণ করে এবং সকল অবাঙালি পুরুষ ও কিশোরীকে 'গ্রেফতার' করে। আমার স্বামী ছিলেন তাদের অন্যতম। আমি একজন সশস্ত্র লোকের পা জড়িয়ে ধরি। লোকটি আমার মুখে একটি লাথি মারলে আমার কপাল বেয়ে রক্ত ঝরতে থাকে। আমি ছিলাম চরম অসহায়। আমি ও আমার সন্তানরা এ শিবিরে দু'বছর বাস করি। আমি আমার স্বামীর অনুসন্ধানে মরিয়া চেষ্টা করি। গুজব শোনা যাচ্ছিল যে, আমাদের শিবির থেকে যাদের ধরে নেয়া হয়েছে মুক্তিবাহিনী তাদের সকলকে হত্যা করেছে। ১৯৭৪ সালের জানুয়ারিতে আমি ও আমার সন্তানরা চট্টগ্রাম থেকে করাচিতে ফিরে আসি। আমার স্বামীর সঙ্গে আমাদের পুনর্মিলনের জন্য আমরা সারাক্ষণ আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি।'

(১২৯) **একশো উনত্রিশতম সাক্ষীর বিবরণ:** ৩০ বছরের জাহিদা খাতুনের স্বামী মোহাম্মদ ইসমাইল লালমনিরহাটে পূর্ব পাকিস্তান রেলওয়েতে চাকরি করতেন। তবে তিনি নিখোঁজ হয়ে যান। জাহিদা বিশ্বাস করছিলেন, তার স্বামী জীবিত। তিনি আবার তাদের জীবনে ফিরে আসবেন। তিনি মনে করেন, ১৯৭১ সালের মার্চে একটি 'বন্য উন্মত্ততা' লালমনিরহাটে বাঙালি জনগোষ্ঠীর একটি বিরাট অংশকে গ্রাস করেছিল। উন্মত্ত হয়ে তারা অকল্পনীয় নৃশংসতা চালিয়েছে। জাহিদা খাতুন তার অকাল বৈধব্যের মর্মস্পর্শী বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন:

'আমরা দীর্ঘদিন লালমনিরহাটে বসবাস করতাম। সেখানে আমার স্বামী রেলওয়েতে চাকরি করতেন। আমার স্বামী সাপ্তাহারে ট্রেনে কাজে চলে গেলে ২০ মার্চ একদল বাঙালি বিদ্রোহী আমাদের এলাকায় হামলা চালায় এবং বহু অবাঙালিকে হত্যা করে। তারা আমার বাড়িতে প্রবেশ করে এবং বন্য জন্তুর মতো আমার বাড়ি লুট করে।...

'আমার স্বামী সাপ্তাহার থেকে ফিরে না আসায় আমি উদ্বিগ্ন হয়ে উঠি। আমি রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের কাছে পাগলের মতো ছুটোছুটি করি। কিন্তু তারা কোনো জবাব দিতে পারছিল না। পাকিস্তানি সৈন্যরা আমাদের শহরে তাদের নিয়ন্ত্রণ পুনঃপ্রতিষ্ঠার পর আমি জানতে পারি যে, সাপ্তাহারে বসবাসকারী আমার সকল আত্মীয়-স্বজনকে হত্যা করা হয়েছে।...

'নিজের ভরণ-পোষণে আমি অতি কষ্টে জীবিকার্জন করতাম। নিজে খেতাম এবং তিন সন্তানকে খাওয়াতাম। ১৯৭১ সালের ১৭ ডিসেম্বর মুক্তিবাহিনী লালমনিরহাট দখল করে নিলে নতুন করে আমাদের দুর্ভোগের যাত্রা শুরু হয়।'

www.pathagar.com

বাইশতম অধ্যায়

যশোরে হত্যাযজ্ঞ

১৯৭১ সালে মার্চের প্রথম সপ্তাহ এবং এপ্রিলের শুরুতে ভারতীয় সীমান্তবর্তী কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ সেনানিবাস শহর যশোরে হাজার হাজার অবাঙালি এবং কিছুসংখ্যক পাকিস্তানপন্থী বাঙালি প্রাণ হারায়। হত্যাকারীরা ছিল ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস ও পুলিশের বিদ্রোহী এবং আওয়ামী লীগের স্বেচ্ছাসেবক ও ভারতীয় অনুপ্রবেশকারী বাঙালি হিন্দু। যশোর সেনানিবাসে অবরুদ্ধ পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যদের আওয়ামী লীগ ও তাদের সমর্থক বিদ্রোহী সৈন্যদের বিদ্বেষী প্রতিহিংসা এবং আত্মঘাতি উন্মত্ততা দমনে পর্যাপ্ত শক্তি ছিল না। ১৯৭১ সালের ৪ মার্চ সংঘটিত হয় সবচেয়ে নৃশংশতম হত্যাকাণ্ড। সেদিন যশোরে অন্তর্ঘাতকরা খুলনা থেকে আগত একটি ট্রেন লাইনচ্যুত করে। সশস্ত্র বাঙালি বিদ্রোহীরা ট্রেনের বগি থেকে শত শত অবাঙালি পুরুষ, মহিলা ও শিশু যাত্রীকে টেনে হিঁচড়ে বের করে নিয়ে আসে। যাত্রীদের জিনিসপত্র লুট করে তাদের হত্যা করা হয়। মৃতদেহগুলো রেললাইনে ছুঁড়ে ফেলে দেয়া হয়। যশোরে আওয়ামী লীগের এক মাসের সন্ত্রাসে মৃত্যুর সংখ্যা ছিল ১২ থেকে ২০ হাজার। ২৫ মার্চ থেকে ৪ এপ্রিল পর্যন্ত যশোরের ঝুমঝুমপুর কলোনিতে ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলসের বিদ্রোহী সৈন্যরা ৫ হাজারের বেশি অবাঙালিকে হত্যা, আহত অথবা অপহরণ করে। আনুমানিক ৫শ' অবাঙালি যুবতী মহিলাকে অপহরণ করে ভারতে নিয়ে যাওয়া হয়। তাদের অনেককে পতিতালয়ের দালালদের কাছে বিক্রি করা হয়। ২৯ ও ৩০ মার্চ বাঙালি বিদ্রোহী সৈন্য ও আওয়ামী লীগের গুণ্ডারা রামনগর কলোনিতে অবাঙালিদের এক গুচ্ছ বস্তিঘর পুড়িয়ে ছাই করে দেয়। এ নৃশংসতায় ঝুমঝুমপুর থেকে পালিয়ে আসা কয়েকজনসহ দেড়শ'র বেশি অবাঙালি প্রাণ হারায়। ৩০ মার্চ ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলসের বিদ্রোহী সৈন্য ও আওয়ামী লীগের সশস্ত্র ক্যাডাররা তারাগঞ্জ কলোনিতে হামলা চালায়। এ কলোনির সাড়ে চার হাজার অবাঙালির মধ্যে খুব কমই বেঁচে থাকার সুযোগ পেয়েছে। ২৬ মার্চ থেকে ৫ এপ্রিল পর্যন্ত যশোর শহরের হামিদপুর, আমবাগান, বাচ্চাচর ও পুরাতন কসবায় কমপক্ষে এক হাজার অবাঙালিকে হত্যা করা হয়।

মার্চের প্রথম সপ্তাহে আওয়ামী লীগের ক্যাডাররা পার্শ্ববর্তী মোবারকগঞ্জ, কালিগঞ্জ, কোটচাঁদপুর ও তফসিডাঙ্গায় অবাঙালিদের বাড়িঘর চিহ্নিত করে। মাসের শেষ দিনগুলোয় অবাঙালিদের হত্যা করা হয়। এসব এলাকায় নিহতদের সংখ্যা ছিল দেড় হাজারের বেশি।

১৯৭১ সালে এপ্রিলের গোড়ার দিকে বিবিসির সাংবাদিক এলান হার্ট এবং লন্ডনের সানডে টাইমসের নিকোলাস টমালিন যশোর সফর করেন। এ সময় যশোর ছিল আওয়ামী লীগ ও বিদ্রোহী বাঙালি সৈন্যদের নিয়ন্ত্রণে। তাদের সঙ্গে ছিলেন বাঙালি ফটোগ্রাফার

www.pathagar.com

মোহাম্মদ আমিন। আওয়ামী লীগের সশস্ত্র প্রহরায় এ দুই ব্রিটিশ সাংবাদিক যশোরে বাঙালি বিদ্রোহীদের সদর দপ্তরের উপকণ্ঠে দুর্ঘটনাবশত অবাঙালিদের হত্যা করার দৃশ্য দেখে ফেলেন। ১৯৭১ সালের ৪ এপ্রিল সানডে টাইমসে প্রকাশিত যশোর থেকে নিকোলাস টমালিনের প্রেরিত একটি রিপোর্টে বলা হয়:

> 'বিবিসি প্যানোরমার এলান হার্ট এবং বাংলাভাষী ফটোগ্রাফার মোহাম্মদ আমিনের সঙ্গে আমিও সেখানে ছিলাম। আমরা ভেবেছিলাম পাকিস্তানি সৈন্য ও তাদের অনুগত স্থানীয় নাগরিকরা হামলা চালাচ্ছে। কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই আমরা প্রকৃত ঘটনা বুঝে ফেলি। মুক্তিবাহিনীর সদর দপ্তরে আনীত প্রতিটি গ্রুপের লোকজন ছিল লম্বা। শ্মশ্রুমণ্ডিত পাঞ্জাবী। তাদের হাত ছিল বাঁধা এবং তাদেরকে নিষ্ঠুরভাবে রাইফেলের বাট দিয়ে পেটানো হচ্ছিল।...
>
> 'পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যরা আক্রমণ করছে ভেবে আমরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে যাই। এসময় আমরা রাস্তার পাশে সবুজ ধানক্ষেতে সদ্য ছুরিকাহত ও লাঠিপেটা করা কয়েকজন পুরুষকে দেখতে পাই। ভূতলশায়ী লোকগুলোর শরীর থেকে রক্ত ঝরছিল। তাদের চারজন ছিল তখনো জীবিত। তারা হাত-পা ছোড়াছুড়ি করছিল। তবে তাদের কেউ কোনো গোলমাল করছিল না। ঠিক তখন আওয়ামী লীগের গাইড অস্থির হয়ে উঠে এবং আমাদেরকে দ্রুত পেছনে হটিয়ে দেয়ার চেষ্টা করে। তিনি বললেন, এখানে অবস্থান করা নিরাপদ নয়। পশ্চিম পাকিস্তানিরা হামলা করছে। গাইড আমাদেরকে লোকগুলোর কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দেন। তবে আমি, এলান হার্ট ও মোহাম্মদ আমিন মুমূর্ষু লোকগুলো কারা তা বুঝতে পারি। আমরা নিশ্চিত যে, তারা বাঙালি নয়। এক ঘন্টা আগে আমরা যাদের হাত বাঁধা দেখেছিলাম তারা ছিল আসলে পাঞ্জাবী বন্দি।...
>
> 'স্থানীয় অবাঙালি অনিয়মিত বাহিনী ছাড়া অন্য কারো পক্ষে তাদের হত্যা করা সম্ভব নয়। কেননা যশোরের কেন্দ্রস্থল নিয়ন্ত্রণ করছিল তারা। আওয়ামী লীগ ও জনতার সন্ত্রাস এবং আচরণ ছিল তার পারিপার্শ্বিক প্রমাণ। আমাদের ফটোগ্রাফার আমিন পাকিস্তানিদের শারীরিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। তিনি নিশ্চিত যে, হতভাগ্যরা পাঞ্জাবী।...
>
> 'স্থানীয়রা আমাদের হুমকি দেয়ায় আমরা পিছিয়ে যেতে বাধ্য হই। পিছিয়ে গিয়ে আমরা দেখতে পাই যে, একই সবুজ ধানক্ষেতে হাত মাথার ওপরে উত্তোলিত অবস্থায় আরো ৪০ জন পাঞ্জাবী 'গুপ্তচর'কে নিয়ে আসা হয়েছে।'

১৯৭১ সালের ৩ এপ্রিল লন্ডনের ডেইলি মিররে প্রকাশিত পাঞ্জাবী ব্যবসায়ীদের হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে ব্রায়ান রিমার প্রেরিত একটি ছবির পরিচিতিতে লিখা হয়:

> 'যশোর সফরকালে বিবিসির প্যানোরমা টিম এ ছবিটি তুলেছে। মিলিশিয়ারা এসব ব্যবসায়ীকে আটক করে একসঙ্গে দড়ি দিয়ে বেঁধে নিয়ে যায়। পশ্চিমা সাংবাদিকরা লোকগুলোকে দেখার একটু পরে তাদের ছুরিকাঘাত ও পিটিয়ে হত্যা করা হয়। একজন তখনো মৃত্যু যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছিল।...

পাকিস্তান সেনাবাহিনী যশোরে নিয়ন্ত্রণ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার এক মাস পর নিউইয়র্ক টাইমসের ম্যালকম ব্রাউন সেখানে সফর করতে যান। ১৯৭১ সালের ৯ মে নিউইয়র্ক টাইমসে প্রকাশিত তার প্রেরিত এক রিপোর্টে বলা হয়:

www.pathagar.com

'স্থানীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট জাতীয় সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার চারদিন পর ৪ এপ্রিল ছিল যশোরের জন্য এক বিভীষিকাময় রাত।...

'যশোর ও খুলনা হলো পূর্ব পাকিস্তানে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত শহর। বহু বাজার ও ভবন ভস্মীভূত। রাস্তাগুলো জনশূন্য।...

'সফরকালে সাক্ষাৎকারে সরকারি কর্তৃপক্ষ ও বেসামরিক লোকজন জানিয়েছে যে, মহিলা ও শিশুসহ হাজার হাজার লোক নিহত হয়েছে। নির্যাতনের পর বিচ্ছিন্নতাবাদীরা তাদের হত্যা করেছে।...'

(১৩০) **একশো ত্রিশতম সাক্ষীর বিবরণ:** ৫৭ বছরের মোহাম্মদ জুবায়ের যশোরে স্যাটেলাইট শহরের এন বকে বসবাস করতেন। ১৯৭৪ সালের জানুয়ারিতে তিনি ঢাকা থেকে করাচিতে প্রত্যাবাসন করেন। মোহাম্মদ জুবায়ের তার সাক্ষ্যে বলেছেন:

'১৯৭১ সালে গোটা মার্চে যশোরে অবাঙালিরা ভীতি ও আতঙ্কের মধ্যে বসবাস করে। শহরের বিহারী অধ্যুষিত এলাকায় আওয়ামী লীগ এবং ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস ও পুলিশের বিদ্রোহীরা হত্যাযজ্ঞে লিপ্ত হলে মার্চের শেষদিনগুলোতে অশান্তির বিস্ফোরণ ঘটে। বিদ্রোহীরা পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যদের কাছে খাদ্য সরবরাহ বন্ধে সেনানিবাস অভিমুখী রাস্তাগুলোর প্রবেশমুখে অবরোধ সৃষ্টি করে। তারা শহর থেকে সেনানিবাস পর্যন্ত পানির মূল পাইপ লাইন উড়িয়ে দেয়।...

'সেনানিবাসে পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যদের সঙ্গে কয়েকজন অবাঙালি তরুণের বন্ধুত্ব ছিল। এসব অবাঙালি তরুণ একটি ট্রাকে খাদ্য বোঝাই করে সেনানিবাস অভিমুখে যাত্রা করে। শটগান সজ্জিত এসব তরুণ বাঙালি বিদ্রোহীদের গুলি উপেক্ষা করে অবরোধ ভাঙ্গার চেষ্টা করছিল। কিন্তু বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ বিদ্রোহীরা সেনানিবাসের প্রবেশদ্বারে অবাঙালি ত্রাণ স্কোয়াডকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়। সেনানিবাসে বাঙালিদের অবরোধ ভাঙ্গার দুঃসাহসী প্রচেষ্টায় এক ডজন অবাঙালি তরুণ প্রাণ দেয়। তাদের লাশ নিকটবর্তী একটি জলাশয়ে নিক্ষেপ করা হয়।...

'মধ্যবিত্ত পরিবারের এসব অবাঙালি তরুণ যশোরে স্যাটেলাইট শহরে বসবাস করতো। এ কারণে শত শত বিদ্রোহী ২৮-২৯ মার্চ এ এলাকা আক্রমণ করে এবং অকল্পনীয় নৃশংসতা চালায়। তারা অবাঙালিদের বাড়িঘর লুট ও অগ্নিসংযোগ করে। হাজার হাজার লোককে হত্যা করে। শত শত মেয়ের ইজ্জত নষ্ট এবং অপহরণ করে।

'তারা আমার বাড়িও লুট করে। তারা আমার তিন ছেলেকে হত্যা এবং আমার দুই যুবতী মেয়েকে অপহরণ করে। তাদের একজন আমার কাঁধে ছুরিকাঘাত করে। আমি রক্তে ভাসতে থাকি। হত্যাকারীরা ভেবেছিল আমি মরে গেছি। আমার বাড়ির একটি অংশ ভস্মীভূত হয়। আমি বাড়ির পেছনে এক সপ্তাহ লুকিয়ে থাকি। পাকিস্তান সেনাবাহিনী বিদ্রোহীদের কবল থেকে যশোর মুক্ত করার পর আমি আমার ছেলেদের লাশ দাফন করি। আমি আমার অপহৃত মেয়েদের খুঁজে বের করতে যশোরের প্রতি ইঞ্চি মাটি তন্ন তন্ন করে খুঁজেছি। কিন্তু তাদের কোনো সন্ধান পাইনি।...'

(১৩১) **একশো একত্রিশতম সাক্ষীর বিবরণ:** ২১ বছরের তাহেরা বেগমের স্বামীকে ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলসের বিদ্রোহীরা ১৯৭১ সালের ২৯ মার্চ হত্যা করে। সে তার সাক্ষ্যে বলেছে:

www.pathagar.com

'আমরা যশোরের রামনগর কলোনিতে বসবাস করতাম। আমাদের জন্ম কলকাতায়। উর্দু ছিল আমাদের মাতৃভাষা। আমি ও আমার স্বামী অনর্গল বাংলায় কথা বলতে পারতাম। রামনগর কলোনির অধিকাংশ বাসিন্দা ছিল অবাঙালি। আমার স্বামী আমজাদ আলী ছিলেন একজন স্বচ্ছল ব্যবসায়ী ও সমাজকর্মী। মার্চের শুরুতে যশোরে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়লে আমার স্বামী শান্তি ও সম্প্রীতির সঙ্গে বসবাস করার জন্য বাঙালি ও অবাঙালি নির্বিশেষে সবাইকে অনুরোধ করেন।...

'২৯ মার্চ সন্ধ্যায় তিনি আমাকে জানান যে, তিনি শান্তি কমিটির একটি বৈঠকে যোগদান করতে যাচ্ছেন। বৈঠকে বাঙালি ও অবাঙালি প্রতিনিধিরা প্রকৃত মুসলিম ভাইয়ের মতো একে অন্যকে রক্ষা করার শপথ গ্রহণ করবে। আমি আতঙ্কিত হলেও তাকে ইউনিয়ন কমিটি হলে শান্তি কমিটির বৈঠকে যোগদানে উৎসাহিত করি। তিনি সেখানে গিয়ে পৌঁছে দেখেন যে, কমিটির বাঙালি সদস্যরা অনুপস্থিত। তিনি এবং তার অবাঙালি সহযোগীরা এক ঘণ্টা নিষ্ফল অপেক্ষা করেন। তারপর তিনি বাড়িতে ফিরে আসেন। তিনি আমাদের এলাকায় বাঙালি বিদ্রোহীদের হামলার আশঙ্কা করছিলেন। আমাদের কোনো অস্ত্র ছিল না। আমাদের হৃদয়বান ও খাঁটি বাঙালি বন্ধু মোহাম্মদ মাহমুদ নিরাপত্তার জন্য তার বাড়িতে আমাদের স্থানান্তরিত হওয়ার পরামর্শ দেন। কিন্তু আমার স্বামী বাড়িতে অবস্থান করার সিদ্ধান্ত নেন।...

'২৯ মার্চ গভীর রাতে প্রায় ৫ হাজার বাঙালি বিদ্রোহী ও আওয়ামী লীগ ক্যাডার স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র সজ্জিত হয়ে আমাদের এলাকায় হামলা চালায়। তারা আমার বাড়িতে হ্যান্ডগ্রেনেড নিক্ষেপ করে। রামনগর কলোনিতে হত্যা ও লুটতরাজ চালায়। বিদ্রোহীরা আমাদের এলাকা ঘেরাও করে প্রতিটি প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষকে হত্যা করে। আমার স্বামী নিরপরাধ লোকদের রেহাই দেয়ার জন্য বিদ্রোহীদের প্রতি অনুরোধ জানান। এ সময় একজন বিদ্রোহী বাঙালি সৈন্য তাকে গুলি করে হত্যা করে। বিদ্রোহীরা ট্রাকে করে তার লাশ নিয়ে যায় এবং একটি গর্তে ফেলে দেয়। গর্তটি একটি গণকবরে পরিণত হয়েছিল। বিদ্রোহীরা অবাঙালিদের বাড়িঘর থেকে শত শত তরুণীকে অপহরণ করে। তাদের অনেককে ধর্ষণ করা হয়। বাঙালি বিদ্রোহীরা পিছু হটার সময় তাদের কাউকে কাউকে ভারতে নিয়ে যায়। আমি আমাদের এলাকায় একটি বাঙালি পরিবারের সঙ্গে কয়েকদিন বসবাস করি। এপ্রিলের মাঝামাঝি আমি আমার পিতামাতার সঙ্গে বসবাস করার জন্য ঢাকায় চলে যাই। ১৯৭৪ সালের জানুয়ারিতে জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে আমি পাকিস্তানে প্রত্যাবাসন করি।'

(১৩২) একশো বত্রিশতম সাক্ষীর বিবরণ: ২২ বছরের আঞ্জুমান বেগম ও তার স্বামী কায়সার হোসেন ১৯৭১ সালের ২৮ মার্চ যশোরে তফসিডাঙ্গা কলোনিতে অবাঙালি হত্যাকাণ্ড থেকে অলৌকিকভাবে রক্ষা পায়। ১৯৭১ সালের শরৎকালে আঞ্জুমান ও তার স্বামী ঢাকায় চলে যায়। ১৯৭৪ সালের জানুয়ারিতে তারা বিমানে করে করাচিতে ফিরে আসে। আঞ্জুমান বেগম সেই দুঃস্বপ্নের সাক্ষ্য দিতে গিয়ে বলেছে:

'আমরা তফসিডাঙ্গার পাইকগাছায় একটি বস্তিতে বাস করতাম। এ বস্তিকে 'বিহারীপাড়া' বলে ডাকা হতো। বস্তিতে বসবাসকারীদের অধিকাংশই ছিল স্বল্প আয়ের মানুষ। আমার স্বামী রিক্সা চালাতেন। আমাদের এলাকায় বাঙালিদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক ছিল বন্ধুত্বপূর্ণ। আমাদের কলোনিতে আমরা কখনো কোনো দাঙ্গা দেখিনি।

www.pathagar.com

'১৯৭১ সালে মার্চের শেষদিকে আওয়ামী লীগের একদল ক্যাডার ও কয়েকজন গুণ্ডা আমাদের এলাকা আক্রমণ করে আমাদের বস্তিঘরে আগুন দেয়। কয়েক মিনিটের মধ্যে গোটা এলাকায় আগুন ছড়িয়ে পড়ে। প্রজ্বলিত বাড়িঘর থেকে পালিয়ে যাবার সময় গুলিবর্ষণে শত শত নির্দোষ পুরুষ, মহিলা ও শিশু নিহত হয়। বিদ্রোহীরা আমাদের এলাকার একমাত্র মসজিদটি জ্বালিয়ে দেয়।...

'আমি ও আমার স্বামী জ্বলন্ত ঘর থেকে পালিয়ে পার্শ্ববর্তী একটি ধানক্ষেতে আশ্রয় নেই। আমরা সেখানে সারারাত শুয়ে থাকি। সেখান থেকে আমরা গুলির ঠা-টা ঠা-টা শব্দ, মুমূর্ষু মানুষের আর্তনাদ এবং অপহৃত মেয়েদের চিৎকার শুনতে পাই। সূর্যোদয়ের একটু আগে আমরা হামাগুড়ি দিয়ে একটি কুঁড়ে ঘরে গিয়ে পৌছাই। সেই কুঁড়ে ঘরে একজন বৃদ্ধা বাঙালি মহিলা বাস করতেন। আমরা তাকে একজন দয়ালু মানুষ হিসেবে জানতাম। তিনি আমাদেরকে আশ্রয় দেন এবং পাকিস্তান সেনাবাহিনী যশোর মুক্ত করা নাগাদ আমরা সেখানে বসবাস করি।...

'আমরা আমাদের এলাকায় ফিরে এসে ধ্বংসযজ্ঞ এবং নিহত অবাঙালিদের গলিত লাশ দেখতে পাই। সেনাবাহিনী তাদের গণকবর দেয়ার ব্যবস্থা করে।...'

(১৩৩) **একশো তেত্রিশতম সাক্ষীর বিবরণঃ** ৫১ বছরের কোরবান আলী যশোরের রামনগরে বাস করতেন। ১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে তিনি জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে চট্টগ্রাম থেকে করাচিতে এসে পৌছান। কোরবান আলী তার সাক্ষ্যে বলেছেনঃ

'১৯৭০ সালে ডিসেম্বরের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বিজয়ী হওয়ার পর থেকে যশোরে অবাঙালিরা নিরাপত্তাহীনতা বোধ করতে থাকে। অনেকে আওয়ামী লীগ কর্মীদের হাতে প্রহৃত ও লাঞ্ছিত হয়। ১৯৭১ সালের মার্চে আওয়ামী লীগ ও কতিপয় ভারতীয় অনুপ্রবেশকারী বাঙালি হিন্দু অবাঙালিদের বিরুদ্ধে স্থানীয় বাঙালিদের উসকানি দেয়। ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস ও আনসারের বিদ্রোহী বাঙালি সদস্য এবং আওয়ামী লীগ যশোরে অবাঙালিদের নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার পরিকল্পনা করে। তারা সেনানিবাস অবরোধ করে। মার্চের মাঝামাঝি কয়েকজন পশ্চিম পাকিস্তানি অফিসার ও সৈন্যকে হত্যা করা হয়। অবাঙালি এলাকায় গোলাগুলির ঘটনা ঘটে।...

'২৯ মার্চ শত শত সশস্ত্র বিদ্রোহী রামনগর কলোনি আক্রমণ করে এবং হাজার হাজার অবাঙালি পুরুষ, মহিলা ও শিশুকে হত্যা করে। শত শত অবাঙালি যুবতী মহিলাকে নির্যাতন, অপহরণ অথবা হত্যা করা হয়। দু'দিন পর্যন্ত বিদ্রোহীরা রামনগরে অবাঙালিদের হত্যা করে। আমি আহত হই এবং লাশের স্তূপের ভেতর শুয়ে থাকি। রাতে আমি কিছুটা সুস্থ বোধ করি এবং একটি পরিত্যক্ত স্কুল ভবনে লুকাই। আমার কন্যা নিহত হয়। তবে আমার মেয়ে জামাই পালাতে সক্ষম হয়। সে সাবেক পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থান করছে।...'

মোবারকগঞ্জে একশো অবাঙালি পরিবার বসবাস করতো। ১৯৭১ সালের ২৯ মার্চ বাঙালি বিদ্রোহীরা এ এলাকায় হামলা চালায় এবং প্রায় সকল প্রাপ্তবয়স্ক অবাঙালি পুরুষকে হত্যা করে। ৮ দিন পর্যন্ত হত্যাকাণ্ড অব্যাহত থাকে। দু'শতাধিক অবাঙালি নিহত হয়। আনুমানিক একশো অবাঙালি যুবতী মহিলাকে অপহরণ করা হয়। অপহৃতদের অধিকাংশকে ধর্ষণ করা হয়। ভারতে নিয়ে যাবার পথে যারা বাধার সৃষ্টি করেছিল তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হয়।

www.pathagar.com

যশোরের প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, ১৯৭১ সালে মার্চের শেষ সপ্তাহ এবং এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে ভারতে পালিয়ে যাবার আগে বিদ্রোহীরা কালিগঞ্জের অবাঙালি পুরুষদের হত্যা করে। এমনকি ছোট শিশুদেরও রেহাই দেয়া হয়নি। শিশুদের যুবতী মায়েদের অপহরণ করা হয়। অপহৃত গৃহবধূদের ধর্ষণ করা হয়। বিদ্রোহীরা ভারতে পালিয়ে যাবার পর পরিত্যক্ত বাড়িঘরে বহু যুবতী মহিলার লাশ পাওয়া যায়। এসব মহিলার স্তন ছিল ছিন্ন ভিন্ন। বিদ্রোহীরা যৌন নির্যাতন কেন্দ্র গড়ে তুলেছিল। এসব যৌন নির্যাতন কেন্দ্রে অবাঙালি বন্দি যুবতী মহিলাদের গণধর্ষণ করা হতো। কালিগঞ্জ হত্যাযজ্ঞে কমপক্ষে তিন শ' অবাঙালি নিহত হয়।

কোটচাঁদপুরে বিদ্রোহী বাঙালি সৈন্য ও আওয়ামী লীগ ক্যাডাররা সাড়ে ৮ শ'র বেশি অবাঙালি পুরুষ, মহিলা ও শিশুকে হত্যা করে। এখানে খুব কম লোকই জীবিত ছিল। তফসিডাঙ্গায় অবাঙালিদের মৃত্যুর সংখ্যা ছিল ৩শ'র কাছাকাছি। ১৯৭১ সালে মার্চের মাঝামাঝিতে আওয়ামী লীগ ও সংগ্রাম পরিষদের জঙ্গিরা এ কলোনির বাসিন্দাদের ভয়ভীতি প্রদর্শন শুরু করে। তারা অবাঙালিদের বাড়িঘর চিহ্নিত করে। ৩০ ও ৩১ মার্চ এ দু'দিন হত্যাযজ্ঞ চালানো হয়। এ হত্যাকাণ্ড থেকে কয়েক ডজনের বেশি লোক রক্ষা পায়নি।

একজন প্রত্যক্ষদর্শী পাকিস্তান সেনাবাহিনীর একজন পাঞ্জাবী লেফটেন্যান্টকে হত্যার নৃশংস ঘটনার বর্ণনা দেন। ১৪ মার্চ এই লেফটেন্যান্ট তার একজন অসুস্থ বন্ধুকে দেখতে সেনানিবাস থেকে শহরে এসেছিলেন। ফিরে যাবার পথে আওয়ামী লীগের একদল গুণ্ডা তার ওপর হামলা চালায় এবং গুলি করে তাকে হত্যা করে। মার্চের শেষ সপ্তাহে ক্যান্টনমেন্টের কাছে বাঙালি বিদ্রোহীরা পশ্চিম পাকিস্তানের বহু সৈন্যকে হত্যা করে। বিদ্রোহীরা অনেক পাঞ্জাবীকে কারাগার ও পুলিশ লক-আপে আটক করে। এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে ধানক্ষেতে ফায়ারিং স্কোয়াডে তাদের হত্যা করা হয়। ধানক্ষেতগুলো বধ্যভূমি হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

(১৩৪) **একশো চৌত্রিশতম সাক্ষীর বিবরণ:** ৩৫ বছরের গোলাম ওয়ারসি যশোরের কোটচাঁদপুরের বড়বাজারে বসবাস করতেন। ১৯৭১ সালের মার্চে আওয়ামী লীগের সশস্ত্র লোকজন তার স্ত্রীকে হত্যা এবং তার কিশোরী মেয়েকে অপহরণ করে। ১৯৭১ সালের মাঝামাঝি গোলাম ওয়ারসি তার তিন সন্তান নিয়ে ঢাকায় স্থানান্তরিত হন। ১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে তিনি করাচিতে ফিরে আসেন। নামাজ আদায় করে তিনি আল্লাহর কাছে তার নিখোঁজ মেয়েকে ফিরিয়ে দেয়ার জন্য মোনাজাত করেন। তার বিশ্বাস তিনি তার মেয়েকে ফিরে পাবেন। আল্লাহ তার মোনাজাত কবুল করবেন। তিনি তার সাক্ষ্যে বলেছেন:

> '১৯৭১ সালের যন্ত্রণা ও দুর্ভাগ্য আমাকে অকালে বৃদ্ধ করে দিয়েছে। এই দুর্ভাগ্য আমার জীবনকে ধ্বংস করে দিয়েছে। আমি ছিলাম একজন কাপড় ব্যবসায়ী। আমাদের কিছুটা স্বচ্ছলতা ছিল। আমার অনেক বাঙালি বন্ধু ছিল। আমরা দীর্ঘদিন কোটচাঁদপুরে বসবাস করতাম। আমি খুব ভালো করে বাংলা বলতে পারতাম। প্রায় এক হাজার অবাঙালি এ ছোট শহরে বসবাস করতো। অনেকেই বিহার ও উত্তর প্রদেশ থেকে অভিবাসন করে এসেছিল এবং কেউ কেউ ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের লোক।...

www.pathagar.com

'অবাঙালিরা জানতো যে, আওয়ামী লীগের মধ্যে একটি উগ্র জাতীয়তাবাদী গোষ্ঠী অবাঙালিদের বিরুদ্ধে স্থানীয় বাঙালিদের ক্ষেপিয়ে তুলছে। ২৮ মার্চ আমি ছিলাম আমার কাপড়ের দোকানে। সেদিন দুঃসংবাদ পাই যে, আওয়ামী লীগের সশস্ত্র লোকেরা আমাদের আবাসিক এলাকা আক্রমণ করেছে। সেখানে ছিল আমার এবং আরো শত শত অবাঙালির বাড়িঘর। আমি দোকান বন্ধ করে বাড়ির দিকে ছুটে যাই। বিদ্রোহী জনতার দৃষ্টি এড়াতে আমি পেছনের একটি সংকীর্ণ পথ দিয়ে অনেক কষ্টে বাড়িতে পৌঁছি। আমার বাড়িসহ আরো শত শত বাড়ি জ্বলছিল। আগুনের তীব্র লেলিহান শিখা উপেক্ষা করে আমি বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করি এবং আমার ছোট তিন পুত্রকে উদ্ধার করি। আমার স্ত্রী ছিল গুলিবিদ্ধ। সে রক্তে ভাসছিল। আমার কিশোরী মেয়ের কোনো খোঁজ ছিল না। আমার সন্তানরা আমাকে জানায় যে, বিদ্রোহীরা আমার স্ত্রীকে গুলি করে হত্যা করেছে। আমার মেয়েকে ধরে ফেলায় সে সাহসের সঙ্গে বিদ্রোহীদের বাধা দেয়ার চেষ্টা করায় তাকে হত্যা করা হয়েছিল। পাকিস্তান সেনাবাহিনী কোটচাঁদপুরে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার পর আমি আমার অপহৃত মেয়েকে খুঁজে বের করার জন্য গোটা যশোর জেলা ঘুরেছি। কিন্তু কোথাও তাকে খুঁজে পাইনি। নিষ্ঠুর হত্যাকারীরা মাত্র দু'দিনে সহস্রাধিক অবাঙালির একটি কলকোলাহলময় কলোনিকে শশ্মানে পরিণত করে। তারা ৮০ জন কিশোরী মেয়েকে অপহরণ করে।...'

৪ এপ্রিল ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের বিদ্রোহী সৈন্যরা যশোরে ক্রিশ্চিয়ান ফাতিমা ক্যাথলিক হাসপাতালের ইতালীয় ধর্মযাজক রেভারেন্ড মারিও ভেরোনসিকে হত্যা করে। তবে ভারতীয় অপপ্রচারকারী ও তাদের ক্রীড়নক আওয়ামী লীগ ইতালীয় যাজকের হত্যাকাণ্ডের জন্য পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে অভিযুক্ত করে। ফাদার ভেরোনসির মৃত্যু রহস্য উদ্ঘাটনে পাকিস্তানে নিযুক্ত ইতালির রাষ্ট্রদূত যশোরে রোমান ক্যাথলিক মিশন পরিদর্শনে যান। তখন পাকিস্তানি সামরিক কর্তৃপক্ষ তার কাছে ঘটনার ব্যাখ্যা দেন এবং প্রমাণ পেশ করেন যে, তাকে পাকিস্তানি সৈন্যরা নয়, বাঙালি বিদ্রোহীরা হত্যা করেছে। বাস্তবতা হচ্ছে যে, ৪ এপ্রিল থেকে যশোর ছিল ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের বিদ্রোহী সৈন্যদের নিয়ন্ত্রণে। সেদিন দু'জন বিদ্রোহী সৈন্য স্টেনগান উঁচিয়ে রোমান ক্যাথলিক হাসপাতাল প্রাঙ্গণে প্রবেশ করে এবং ফাদার ভেরোনসিকে গুলি করে হত্যা করে। হত্যাকাণ্ডের সময় তার পরনে আলখালা ছিল না। পূর্ব পাকিস্তানে ১৮ বছর বসবাস করায় তার মুখের রং অনেকটা তামাটে হয়ে গিয়েছিল। তাকে পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের পাঠানের মতো মনে হতো। বাঙালি সৈন্যরা তাকে পশ্চিম পাকিস্তানি বলে ভুল করেছিল। এমন একটি ভুল ধারণা থেকে তাকে গুলি করে হত্যা করা হয়। বইটি লেখার আগে করাচিতে যশোরের প্রত্যক্ষদর্শীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। এসব প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, বাঙালি বিদ্রোহীরা ফাদার ভেরোনসি এবং রোমান ক্যাথলিক হাসপাতালের আরো চারজনকে গুলি করে হত্যা করে। ৫৬ বছরের এ ইতালীয় যাজককে হাসপাতালের প্রাঙ্গণে সমাহিত করা হয়।

প্রত্যক্ষদর্শীরা একথাও বলেছেন যে, নাশকতা ও সন্ত্রাসে বাঙালি বিদ্রোহীদের সহায়তা করার জন বিপুলসংখ্যক ভারতীয় অনুপ্রবেশকারী যশোরে ঢুকে পড়েছিল। বার্তা সংস্থা রয়টার্সের মরিস কুইন্সটান্স আরো পাঁচ বিদেশি সাংবাদিকসহ ১৯৭১ সালের ৮ মে যশোর

www.pathagar.com

সফর করেন। যশোর এরিয়া কমান্ডারের উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি লিখেছেন:

> 'এ শহর দখলের লড়াইয়ে যশোর এলাকায় প্রেরিত ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনী বিএ-সএফ'র দু'টি কোম্পানি বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সহায়তা করেছে।'

যশোর ভারত সীমান্তের কাছাকাছি হওয়ায় ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীদের অনুপ্রবেশ সহজতর ছিল। ঐ সময় ভারত-পূর্ব পাকিস্তান সীমান্ত বরাবর মোতায়েন ভারতীয় সৈন্য সংখ্যা ছিল এক লাখের বেশি।

www.pathagar.com

তেইশতম অধ্যায়

নড়াইলে দুর্ভোগ

নড়াইল হলো যশোর জেলার একটি ছোট শহর। ১৯৭১ সালে পুরো মার্চ জুড়ে এখানে আওয়ামী লীগের বিদ্রোহের কম্পন অনুভূত হয়। এ শহরে বসবাসকারী অবাঙালিদের সংখ্যা এক হাজারের অধিক ছিল না। ২৫ মার্চ থেকে ৬ এপ্রিল পর্যন্ত আওয়ামী লীগের সশস্ত্র ক্যাডার ও বাঙালি বিদ্রোহী সৈন্যরা এ শহরের প্রায় ৮০০ অবাঙালিকে হত্যা করে। প্রায় ৭০ জন পাঠান পুরুষ, মহিলা ও শিশুর হত্যাকাণ্ড ছিল সবচেয়ে মর্মান্তিক।

(১৩৫) একশো পঁয়ত্রিশতম সাক্ষীর বিবরণ: ৩৫ বছরের গফুর আহমেদ নড়াইলে একটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে চাকরি করতেন। তিনি, তার স্ত্রী ও দু'সন্তান সৌভাগ্যক্রমে এ শহরে পরিচালিত হত্যাকাণ্ড থেকে রক্ষা পায়। একজন সাহসী বাঙালি তাদের জীবন রক্ষায় সহায়তা করেন। এ বাঙালি নিজের জীবনের ওপর চরম ঝুঁকি নিয়ে তাদেরকে আশ্রয় দেন এবং ঢাকায় পালিয়ে যেতে সহায়তা করেছিলেন। ১৯৭৪ সালে জানুয়ারির শুরুতে গফুর জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে বিমানযোগে করাচিতে ফিরে আসেন। তিনি জানিয়েছেন, পাকিস্তান সেনাবাহিনী বাঙালি বিদ্রোহীদের কাছ থেকে নড়াইল পুনরুদ্ধার করার পর অবাঙালি ও পাকিস্তানপন্থী বাঙালি মুসলমানদের হত্যাকাণ্ডে জড়িত বিদ্রোহী ও স্থানীয় হিন্দুরা ভারতে পালিয়ে যায়। গলিত লাশ দাফন করতে কয়েকদিন সময় লাগে। বিদ্রোহীরা আহত পুরুষদের জ্বলন্ত বাড়িঘরে নিক্ষেপ করে। সেনাবাহিনী ধ্বংসস্তূপ অপসারণ করার পর তাদের দগ্ধ কঙ্কাল উদ্ধার করা হয়। গফুর আহমেদ তার সাক্ষ্যে বলেছেন:

> 'আমি ১৫ বছর নড়াইলে বসবাস করেছি। আমি মৌলভীপাড়ায় এক খণ্ড জমি কিনে সেখানে একটি মাটির ঘর তৈরি করি। আমি বাঙালি মুসলমানদের পছন্দ করতাম। তাদের মধ্যে আমার অনেক বন্ধু-বান্ধব ছিল। আমাদের এলাকার কাছে একটি মন্দির ছিল। এ মন্দিরের উপকণ্ঠে বহু হিন্দু বাস করতো। তাদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক সুখকর ছিল না। তারা ভারত থেকে অভিবাসনকারী অবাঙালি মুসলমানদের পছন্দ করতো না।...
>
> '১৯৭১ সালে মার্চের শেষ সপ্তাহে স্থানীয় আওয়ামী লীগ, হিন্দু ও ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলসের বিদ্রোহীরা অবাঙালিদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে গণহত্যায় লিপ্ত হয়। ২৯-৩১ মার্চ একদল দুর্বৃত্ত অবাঙালিদের বাড়িঘরে হামলা চালিয়ে শত শত পুরুষ, মহিলা ও শিশুকে হত্যা করে।...
>
> 'গণহত্যা শুরু হওয়ার দু'দিন আগে একজন ধার্মিক বাঙালি মুসলমান বন্ধু আমাকে আমার শহর ছেড়ে তার বাড়িতে গিয়ে আশ্রয় নিতে রাজি করান। তিনি আমাকে জানান যে, বিদ্রোহীরা অবাঙালিদের হত্যা করার পরিকল্পনা করছে। তিনি নড়াইলের উপকণ্ঠে

www.pathagar.com

তার বাড়িতে আমাকে, আমার স্ত্রী এবং আমার সন্তানদের লুকিয়ে রাখেন। ২৯ মার্চ আমাদের এলাকায় হত্যাকাণ্ডের দিন বাঙালি বিদ্রোহীরা আমার বাড়ি লুট ও অগ্নিসংযোগ করে। তারা বেশ কয়েকজন ইসলামপ্রিয় বাঙালিকে হত্যা করে। এসব বাঙালি ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে মুসলিম লীগ ও জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ নিয়েছিলেন। দুর্বৃত্তরা স্থানীয় সম্মানিত নেতা মোহাম্মদ ইমামুদ্দিন ও তার পরিবারের ১০ জন সদস্যকে হত্যা করে। হত্যা করার আগে তারা তার ওপর পৈশাচিক নির্যাতন চালায়।'

(১৩৬) **একশো ছত্রিশতম সাক্ষীর বিবরণঃ** নড়াইলের মুজগুন্নিতে ৩১ বছরের বশীর আহমেদের একটি দোকান ছিল। বাংলায় চমৎকার দখল থাকায় তিনি হত্যাকাণ্ড থেকে বেঁচে যান। ১৯৭৪ সালের জানুয়ারিতে তিনি করাচিতে প্রত্যাবাসন করেন। ১৯৭১ সালের মার্চে সংঘটিত ট্রাজেডি সম্পর্কে বশীর আহমেদ তার সাক্ষ্যে বলেছেনঃ

'যশোরে আমি দীর্ঘদিন বসবাস করেছি। আমার পিতার মৃত্যুর পর আমার স্ত্রী ও শ্যালকরা আমাকে নড়াইলে স্থানান্তরে রাজি করায়। বাংলায় আমার দখল এত চমৎকার ছিল যে, আমি নিজেকে সহজে একজন বাঙালি হিসেবে চালিয়ে দিতে পারতাম। মুজগুন্নি এলাকায় আমার একটি ছোট দোকান ছিল। বাঙালি প্রতিবেশী ও অবাঙালি সবার সঙ্গে আমার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। মার্চের তৃতীয় সপ্তাহে রাজনৈতিক উত্তেজনা নড়াইলকে গ্রাস করে। উত্তেজনা সৃষ্টি হওয়ায় অবাঙালিরা আতঙ্কিত হয়ে উঠে। ২৬ মার্চ আমি মূল বাজারে যাই এবং একজন বাঙালি বন্ধুর সঙ্গে পরামর্শ করি। আমার বাঙালি বন্ধু ছিল বাইসাইকেলের একটি দোকানের মালিক। তিনি আমাকে জানান যে, আওয়ামী লীগ ও কতিপয় বাঙালি হিন্দু অবাঙালিদের বিরুদ্ধে গুজব ছড়াচ্ছে। তাদের হত্যা করার জন্য বাঙালিদের উসকানি দিচ্ছে। তিনি সন্দেহ প্রকাশ করে বলেন, ভারতীয় এজেন্টরা পশ্চিমবঙ্গ থেকে নড়াইলে অনুপ্রবেশ করেছে। তিনি আমাকে নড়াইলের বাইরে আমাদের এক অভিন্ন বাঙালি বন্ধুর বাড়িতে কয়েক দিনের জন্য আমার পরিবারকে স্থানান্তরের পরামর্শ দেন। আমি তার পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করি।...

'২৯ মার্চ বাড়িতে ফেরার পথে আমি একদল উন্মত্ত বাঙালি জনতাকে দু'জন অবাঙালি যুবককে হত্যা করতে দেখতে পাই। জনতা সড়কি ও লোহার রড দিয়ে তাদেরকে পিটিয়ে ও কুপিয়ে হত্যা করে। আরেকদল সশস্ত্র জনতা পাইকারীভাবে অবাঙালিদের বাড়িঘরে হামলা চালায়। তারা আমাকে বাঙালি হিসেবে ধরে নেয়। আমি আমার বাঙালি বন্ধুর বাড়িতে পালিয়ে যাই। ওই রাতে আমার এলাকায় অবাঙালিদের বেশিরভাগ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। তাদের ঘরবাড়ি লুট করে জ্বালিয়ে দেয়া হয়।...'

(১৩৭) **একশো সাঁইত্রিশতম সাক্ষীর বিবরণঃ** ২৬ বছরের আবদুস সাত্তার ১৯৭১ সালে মার্চে নড়াইল গণহত্যা থেকে রক্ষা পান। এপ্রিলের মাঝামাঝি সেনাবাহিনী নড়াইলে নিয়ন্ত্রণ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার পর তিনি যশোর থেকে তার স্ত্রী ও সন্তানদের উদ্ধার করেন। একজন বাঙালি বন্ধু তার পরিবারকে আশ্রয় দিয়েছিল। ১৯৭৪ সালের জানুয়ারিতে আবদুস সাত্তার ঢাকা থেকে করাচিতে প্রত্যাবাসন করেন। তিনি তার সাক্ষ্যে বলেছেনঃ

'নড়াইলে একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে আমি চাকরি করতাম। আমরা শহরের সোনাডাঙ্গা এলাকায় বসবাস করতাম। ১৯৭১ সালের মাঝামাঝি আমার স্ত্রী ও দু'সন্তান আমাদের

www.pathagar.com

এক আত্মীয়ের বিয়ে খেতে যশোরে যায়। আমার পরিবারের অনুপস্থিতিতে আমি আমার এক বাঙালি বন্ধুর বাড়িতে খাওয়া-দাওয়া করতাম।...

'২৮ মার্চের দিকে এক রাতে আমার বাঙালি বন্ধু আমাদের বাড়িতে ছুটে আসেন এবং আমাকে তার বাড়িতে তৎক্ষণাৎ স্থানান্তরিত হওয়ার পরামর্শ দিয়ে বললেন, ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলসের বিদ্রোহী এবং আওয়ামী লীগের সশস্ত্র জঙ্গিরা সকল অবাঙালিকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আমি আমার বন্ধুর সঙ্গে তার বাড়িতে যাই। সেনাবাহিনী নড়াইল পুনরুদ্ধার করা নাগাদ তার বাড়িতে অবস্থান করি। আমি আমার বাড়িতে ফিরে এসে দেখতে পাই যে, আমার বাড়ি পুড়িয়ে ছাই করে দেয়া হয়েছে। বহু বাড়িতে লাশের স্তূপ। কয়েকটি কুকুর ও বিড়াল লাশের গন্ধ শুকছে এবং লাশে জমাটবাঁধা শুষ্ক রক্ত খাচ্ছে। আমি কয়েকজন জরাজীর্ণ বৃদ্ধ পুরুষ ও মহিলাকে দেখতে পাই। ছোট ছোট বাচ্চারা ধ্বংসযজ্ঞের ভেতর তাদের প্রিয়জনদের লাশ খুঁজছিল। এ হত্যাযজ্ঞ থেকে কদাচিৎ প্রাপ্তবয়স্ক লোক রক্ষা পায়।'

১৯৭১ সালের ২০-২১ মার্চ আওয়ামী লীগের সশস্ত্র ক্যাডার এবং ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলসের বিদ্রোহীরা যশোর জেলার ছোট শহর বজরডাঙ্গা রেলওয়ে স্টেশনে অবাঙালি কর্মচারীদের হত্যা করে।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

চব্বিশতম অধ্যায়

ঝিনাইদহের বজরডাঙ্গায় নির্মূল অভিযান

(১৩৮) **একশো আটত্রিশতম সাক্ষীর বিবরণ:** ২০ বছরের মোজাফফর আলীর পিতা মনসুর আলী বজরডাঙ্গা স্টেশনে সহকারী স্টেশন মাস্টার হিসেবে চাকরি করতেন। মোজাফফর আলী ও তার মা ১৯৭৪ সালের জানুয়ারিতে ঢাকা থেকে করাচিতে প্রত্যাবাসন করে। সে তার সাক্ষ্যে বলেছে:

> '১৯৭১ সালে মার্চের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে আওয়ামী লীগের কর্মীরা বজরডাঙ্গা রেলওয়ের অবাঙালি কর্মচারীদের হুমকি প্রদর্শন এবং অপমান করতে থাকে। হুমকি সত্ত্বেও অবাঙালি কর্মচারীরা রেলওয়ে স্টেশনে তাদের কাজ অব্যাহত রাখে। সংখ্যায় স্বল্প হওয়ায় তারা তাদের পরিবারকে যশোর ও খুলনায় আত্মীয়-স্বজনের কাছে পাঠিয়ে দেয়। আমি ও আমার মা যশোরে আমাদের এক চাচার সঙ্গে বসবাস করতে যাই। আমার পিতা ছিলেন অত্যন্ত সচেতন। তিনি তার ডিউটিতে অনুপস্থিত থাকতে অস্বীকৃতি জানান।...
>
> '২০ মার্চ আওয়ামী লীগ এবং বিদ্রোহী সৈন্যদের ৪০ জনের একটি সশস্ত্র গ্রুপ বজরডাঙ্গা রেলওয়ে স্টেশন আক্রমণ করে। তারা রেল লাইনের একটি অংশ তুলে ফেলে এবং স্টেশন ভাঙচুর করে। তারা অবাঙালি কর্মচারীদের লাইনে দাঁড় করিয়ে গুলি করে হত্যা করে।...
>
> 'পাকিস্তান সেনাবাহিনী যশোর ও বজরডাঙ্গা পুনরুদ্ধার করার পর আমরা আমার পিতার হত্যাকাণ্ডের খবর পাই। তার লাশের কোনো চিহ্ন নেই। আল্লাহর অসীম কুদরতে আমরা যশোরে বিদ্রোহীদের হাত থেকে বেঁচে যাই।'

ঝিনাইদহ

আওয়ামী লীগের বন্দুকধারী এবং ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলসের বিদ্রোহীরা যশোর জেলার ঝিনাইদহ মহকুমার অনেক জায়গায় অবাঙালিদের হত্যা এবং তাদের বাড়িঘর ধ্বংস করে। ২৪ মার্চ ঝিনাইদহ ও তার আশপাশে হত্যাকাণ্ড শুরু হয় এবং ১৯৭১ সালের ১৪ এপ্রিল পাকিস্তান সেনাবাহিনীর একটি বহর বিদ্রোহীদের বিতাড়িত করা নাগাদ বিরতিহীনভাবে এ হত্যাকাণ্ড চলতে থাকে। যশোর ও নড়াইলে অবাঙালি হত্যাকাণ্ডে যে ধরনের কৌশল অবলম্বন করা হয় ঝিনাইদহ হত্যাকাণ্ডেও অনুরূপ কৌশল অনুসরণ করা হয়। ঝিনাইদহ মহকুমায় অবাঙালিদের মৃত্যুর সংখ্যা ছিল ৫৫০ জনের বেশি। ৫০ জনের অধিক অবাঙালি যুবতী মহিলাকে অপহরণ করা হয়। তাদের কাউকে কাউকে উন্মুক্ত ধানক্ষেতে ধর্ষণ করা হয় এবং শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়।...

www.pathagar.com

(১৩৯) **একশো উনচল্লিশতম সাক্ষীর বিবরণঃ** ১৯ বছরের সৈয়দ হাসান জাভেদ ছিল ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজের ছাত্র। ১৯৭১ সালের শেষদিকে সে তার পিতামাতার সঙ্গে করাচিতে প্রত্যাবাসন করে। ১৯৭৪ সালে সাক্ষ্যদানের সময় জাভেদ ছিল করাচি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিএ (অনার্স)-এর ছাত্র। জাভেদ জানিয়েছে, ১৯৭১ সালের ১০ মার্চ সে খালিশপুরে রাস্তার পাশে ছাত্রলীগের একটি সশস্ত্র গ্রুপকে একজন পাঠান প্রহরীকে নির্যাতন করার দৃশ্য দেখেছে। লোকটি ঘটনাস্থলে নিহত হয়। জাভেদ আরো জানিয়েছে, ১৯৭১ সালের ১৭ মার্চ আওয়ামী লীগপন্থী একদল গুণ্ডা তার এক পাঞ্জাবী প্রতিবেশীর বাড়িতে হামলা চালিয়ে তাকে হত্যা করে এবং তার দু'মেয়েকে অপহরণ করে। তিনদিন পর জাভেদ নিকটবর্তী একটি পুকুরে তাদের লাশ ভাসতে দেখে। জাভেদ খালিশপুরে ১৯৭১ সালের ২৮ মার্চ বাঙালি বিদ্রোহী বিশেষ করে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলসের সপক্ষত্যাগী সৈন্যদের হামলা এবং একদল সশস্ত্র অবাঙালির প্রতিরোধের ঘটনার বিবরণ দিয়ে জানায় যে, এসব অবাঙালি মধ্য মার্চে অস্ত্র সমর্পণে আওয়ামী লীগের সমান্তরাল প্রশাসনের আহ্বানে সাড়া দেয়নি। পরবর্তীতে পাকিস্তানি সৈন্যরা বিদ্রোহীদের বিতাড়িত করে। জাভেদ তার সাক্ষ্যে বলেছে:

> '১৯৭১ সালের ৩ মার্চ শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণ প্রচারের পর পরই ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ ও কলেজের হোস্টেলগুলোকে উত্তেজনা গ্রাস করে। শেখ মুজিবুর রহমান তার ভাষণে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করেন। ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজের ৩টি হোস্টেলে বসবাসকারী ২৫১ জন ছাত্রের মধ্যে উর্দুভাষীদের সংখ্যা ছিল মাত্র ২৫ জন। বাঙালিরা তাদেরকে বিহারী বলতো। ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ ১০ সহস্রাধিক বাঙালি বিক্ষোভকারী ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজে জোরপূর্বক প্রবেশ করে পাকিস্তান সরকার ও অবাঙালি বিরোধী শ্লোগান দেয় এবং পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা দাবি করে। গোলযোগ আঁচ করতে পেরে অধ্যক্ষ মিছিলে যোগদান এবং বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে বিবাদে জড়িত না হওয়ার জন্য সকল ছাত্রকে নির্দেশ দেন। মিছিলকারীরা মিছিল নিয়ে শহীদ মিনারে এগিয়ে যায়। শহীদ মিনারে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার শপথ নেয়া হয়। পরদিন পরিস্থিতি আরো উত্তপ্ত হয়ে উঠে। আওয়ামী লীগের জঙ্গিরা সহিংসতার হুমকি দেয়ায় শহরে বসবাসকারী অবাঙালিরা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। ৯ মার্চ অধ্যক্ষ ক্যাডেট কলেজ বন্ধ ঘোষণা করেন এবং হোস্টেলে অবস্থানকারী ছাত্রদের নিজ নিজ বাড়িতে ফিরে যাবার নির্দেশ দেন। আমার পিতামাতা ৬৮ মাইল দূরে খুলনায় বসবাস করতেন। আমি খুলনার উদ্দেশে রওনা দেই। তবে রাস্তাঘাট ছিল পরিত্যক্ত। মাঝে মাঝে রাইফেলের গুলির আওয়াজ ভেসে আসছিল। আমি অনেক কষ্টে খুলনার খালিশপুরে আমাদের বাড়িতে পৌঁছি। আমার মা কয়েকদিন ধরে কান্নাকাটি করছিলেন। তিনি আমাকে জীবিত দেখার আশা ছেড়ে দিয়েছিলেন। তিনি আমাকে দেখে জড়িয়ে ধরেন এবং আল্লাহর কাছে শোকরিয়া আদায় করেন।'

www.pathagar.com

পঁচিশতম অধ্যায়

নোয়াপাড়া ও দর্শনায় রক্তগঙ্গা

১৯৭১ সালে মার্চের দ্বিতীয় সপ্তাহে যশোর জেলার ক্ষুদ্র শহর নোয়াপাড়াতে আওয়ামী লীগের বিদ্রোহের ঢেউ লাগে। এখানে অবাঙালিদের সংখ্যা ছিল খুবই কম। অনেকেই স্থানীয় জুট মিলে কাজ করতো অথবা মিলের সঙ্গে ব্যবসা করতো। মিলের মালিক অবাঙালি হওয়ায় মিলটি বাঙালি বিদ্রোহীদের উন্মত্ততার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়।

(১৪০) **একশো চল্লিশতম সাক্ষীর বিবরণঃ** ২৯ বছরের শেখ আজিজ এ জুট মিলে একজন নিরাপত্তা রক্ষী হিসেবে চাকরি করতেন। তিনি ১৯৭১ সালের ২১ মার্চ মিল এলাকায় অবাঙালি স্টাফ এবং তাদের পরিবারবর্গের হত্যাকাণ্ড প্রত্যক্ষ করেন। তার চাচা নিহত হয়। তবে তার চাচার স্ত্রী ও ছেলেমেয়েরা রক্ষা পায়। শেখ আজিজ তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে নাটকীয়ভাবে ঢাকায় পালিয়ে আসেন। ১৯৭৩ সালের মার্চে তিনি তাদেরকে নিয়ে নেপাল হয়ে করাচিতে এসে পৌঁছান। শেখ আজিজ তার সাক্ষ্যে বলেছেনঃ

> 'আমি ছিলাম নোয়াপাড়ায় কার্পেটিং জুট মিলের ৬ জন অবাঙালি নিরাপত্তা রক্ষীর একজন। অন্য ১৩ জন নিরাপত্তা রক্ষী ছিল বাঙালি। প্রধান নিরাপত্তা কর্মকর্তা ফরিদ আহমেদ ছিলেন অত্যন্ত ভদ্র ও ধার্মিক অবাঙালি। তার স্ত্রী ছিলেন বাঙালি। ফরিদ আহমেদ এ মিলে প্রচুর বাঙালি যুবককে চাকরিতে নিয়োগ করেছিলেন।...
>
> '২১ মার্চ আওয়ামী লীগের একটি সশস্ত্র গ্রুপ এ জুট মিলে হামলা চালায়। তারা কয়েকজন বাঙালি শ্রমিকের সমর্থন লাভে সক্ষম হয়। এসব বাঙালি শ্রমিক আন্দোলন ও ধর্মঘটের অগ্রভাগে থাকতো। সশস্ত্র গ্রুপের উন্মত্ততার প্রথম শিকার ছিলেন প্রধান নিরাপত্তা কর্মকর্তা ফরিদ আহমেদ। তারা তার অফিসে তাকে মারধর করে। তারা তাকে টেনে হিঁচড়ে মিলের বাইরে নিয়ে আসে। সন্ত্রাসীরা তাকে লাঠি দিয়ে পেটায় এবং লোহার রড দিয়ে আঘাত করে। একজন বাঙালি নিরাপত্তা রক্ষী গুলি করে তাকে হত্যা করে। কয়েক বছর আগে ফরিদ আহমেদ এ বাঙালি নিরাপত্তা রক্ষীকে চাকরি দিয়েছিলেন। সন্ত্রাসীরা মিলের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করায় এবং মূল প্রবেশ পথ বন্ধ করে দেয়ায় অবাঙালি স্টাফের পালানোর কোনো সুযোগ ছিল না। অবাঙালিরা আসন্ন মৃত্যুর ঝুঁকির মুখোমুখি হয়। দুর্বৃত্তরা মিল প্রাঙ্গণে প্রায় সকল অবাঙালিকে হত্যা করে। আমি দু'দিন একটি স্টোর রুমে আত্মগোপন করে থাকি। নিহতদের মধ্যে আমার চাচাও ছিলেন।...
>
> 'তারপর দুর্বৃত্তরা মিলের অবাঙালি স্টাফের পরিবারগুলোর ওপর চড়াও হয়। এসব পরিবার মাটির ঘর ও বস্তিতে বসবাস করতো। প্রাপ্তবয়স্ক সকল পুরুষকে হত্যা করা হয়। যুবতী মহিলাদের ধর্ষণ এবং অনেককে অপহরণ করা হয়। আমার নিহত চাচার স্ত্রী ও তার দু'সন্তান অলৌকিকভাবে রক্ষা পায়। আমি তাদেরকে পাকিস্তানে নিয়ে এসেছি।...'

www.pathagar.com

(১৪১) **একশো একচল্লিশতম সাক্ষীর বিবরণ:** ২০ বছরের হুসনা বেগমের পিতা তাহের হোসেন নোয়াপাড়ায় পাটের ব্যবসার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। সে তার মামার এক বাঙালি বন্ধুর সহায়তায় বেঁচে যায়। তার মামার বাঙালি বন্ধু তাকে এবং তার মাকে শহরে গোলযোগের পুরো সময় আশ্রয় দেন এবং পাকিস্তান সেনাবাহিনী বিদ্রোহীদের তাড়িয়ে দেয়ার পর তাদেরকে চট্টগ্রামে স্থানান্তরে সহায়তা করেন। ১৯৭৪ সালে জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে হুসনা ও তার মা চট্টগ্রাম থেকে জাহাজে করে করাচিতে এসে পৌঁছায়। সে তার পিতার নির্মম হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে বলেছে:

> 'আমার পিতার জন্ম ভারতের বিহার রাজ্যে। তিনি পঞ্চাশ দশকের শেষদিকে নড়াইলে বসতি স্থাপন করেন। আমার জন্ম নড়াইলে। বাড়িতে আমরা উর্দুতে কথাবার্তা বললেও আমি এমন একটি স্কুলে ভর্তি হই যে স্কুলে শিক্ষার মাধ্যম ছিল বাংলা। আমি আমার বাঙালি সহপাঠীদের মতো বাংলায় কথা বলতাম। স্কুলে আমাকে উর্দু পড়ানো হতো না। আমি উর্দু লিখতে ও পড়তে পারতাম না।...
>
> '১৯৭১ সালের ২২ মার্চ আওয়ামী লীগের দুর্বৃত্তরা আমার পিতার গুদাম ঘরে হামলা চালিয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়। তারা তাকে জ্বলন্ত আগুনে নিক্ষেপ করে। দুর্বৃত্তরা আমাদের বাড়িতে হামলা চালায় এবং বর্বর অসভ্যদের মতো আমাদের বাড়ি ভাঙচুর করে। তারা আমার এবং আমার মায়ের খোঁজ করে। তবে আমরা ছিলাম আমাদের বাঙালি বন্ধুর বাড়িতে নিরাপদ আশ্রয়ে। পরদিন আমরা আমার পিতার নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের খবর পাই।...
>
> 'আমাদের আশ্রয়স্থলের কাছাকাছি একজন অবাঙালি ব্যবসায়ীর বাড়িতে দুর্বৃত্তরা হামলা চালায়। আমি গোলাগুলির আওয়াজ এবং পুরুষ ও মহিলাদের বাঁচার আর্তনাদ শুনতে পাই। দুর্বৃত্তরা এ ব্যবসায়ী ও তার স্ত্রীকে হত্যা এবং তার তিন মেয়েকে ধর্ষণ করে। তারা এ তিনটি মেয়েকে প্রায় উলঙ্গ অবস্থায় নোয়াপাড়ার প্রধান বাজারে হাঁটিয়ে নিয়ে যায় এবং একটি ধানক্ষেতে কুপিয়ে হত্যা করে। আমাদের আশ্রয়দাতার এক বাঙালি বন্ধু এ লোমহর্ষক ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। আমাদের আশ্রয়দাতার কাছে এ ঘটনার বিবরণ দেয়ার সময় তিনি কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছিলেন।...'

www.pathagar.com

দর্শনা

১৯৭১ সালে মার্চের প্রথম সপ্তাহ থেকে দর্শনা শহরে আওয়ামী লীগ অবাঙালিদের ভীত সন্ত্রস্ত করে তুলেছিল। দর্শনায় অবাঙালিদের সংখ্যা খুব বেশি ছিল না। তবে তাদের সবাই ছিল স্বচ্ছল। অনেকেই পূর্ব পাকিস্তান রেলওয়েতে চাকরি করতো। ২০ মার্চ থেকে ১৯ এপ্রিল পর্যন্ত আওয়ামী লীগ ও ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলসের বিদ্রোহীরা এ শহরের তিন-চতুর্থাংশ অবাঙালিকে হত্যা করে। দুর্বৃত্তরা অবাঙালিদের বাড়িঘরে হামলা ও লুটতরাজ চালায় এবং সকল পুরুষকে হত্যা করে। বিদ্রোহীরা শত শত অবাঙালি কিশোরীকে অপহরণ করে। বিদ্রোহী নিয়ন্ত্রিত ভবনগুলোয় এসব কিশোরীকে ধর্ষণ করা হয়। প্রতিবেশী ভারতে পালিয়ে যাবার আগে তারা ধর্ষিতা অবাঙালি কিশোরীদের হত্যা করে। কিছুসংখ্যক অপহৃত অবাঙালি কিশোরীকে ভারতে নিয়ে যাওয়া হয়।

(১৪২) **একশো বিয়াল্লিশতম সাক্ষীর বিবরণ:** ৫০ বছরের মদিনা খাতুনের স্বামী আবদুল হামিদ ছিলেন দর্শনা রেলওয়ের একজন কর্মচারী। ১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে মদিনা খাতুন চট্টগ্রামে একটি বিহারী ক্যাম্প থেকে করাচিতে প্রত্যাবাসন করেন। তিনি তার সাক্ষ্যে বলেছেন:

> '২৫ মার্চ দর্শনায় বাঙালি বিদ্রোহীরা অবাঙালিদের বিরুদ্ধে হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত হয়। একটি দুর্বৃত্ত দল আমার বাড়িতে আসে। তারা সামনের দরজা ভেঙ্গে জোরপূর্বক আমার স্বামী ও আমার ভাইকে ধরে নিয়ে যায়। আমি তাদের কাছে আমার স্বামী ও আমার ভাইয়ের জীবন ভিক্ষা চাই। তাদের একজন আমার দিকে চেয়ে চেঁচিয়ে বললো, 'বাংলাদেশে বিহারীদের কোনো স্থান নেই। তাদেরকে অবশ্যই হত্যা করা হবে।' দুর্বৃত্তরা আমাদের সব মূল্যবান জিনিস লুট করে। এমনকি আমাদের রান্না করা ভাতও। আমি পরে জানতে পারি যে, বিদ্রোহীরা কসাইখানায় আমার স্বামী ও ভাইকে হত্যা করেছে।...
>
> 'বিদ্রোহীরা দর্শনায় অবাঙালিদের অর্ধেক বাড়ি পুড়িয়ে দেয়। এমনকি তারা অক্ষম অবাঙালি পুরুষকেও ছাড় দেয়নি। বিদ্রোহীরা অবাঙালি ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে চাঁদা আদায় করেছিল। অবাঙালি ব্যবসায়ীদের আশ্বাস দেয়া হয়েছিল যে, তাদের হত্যা করা হবে না। কিন্তু তারা তাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেনি। অবাঙালিদের সঙ্গে এমনি আরো কত ধরনের প্রতারণা করা হয়েছিল তার ইয়ত্তা নেই। হত্যাকাণ্ডের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে তারা প্রতিটি অবাঙালি পুরুষের গতিবিধির প্রতি নজর রাখতো। বিদ্রোহী কমান্ডার দর্শনা থেকে অবাঙালিদের পালিয়ে যাবার প্রতিটি সফল বা ব্যর্থ উদ্যোগের ত্বরিত তথ্য পেয়ে যেতেন। ১৫ মার্চ থেকে এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত বিদ্রোহীরা নিয়মিত অবাঙালিদের হত্যা করতো। নিহত অবাঙালিদের লাশের স্তূপ পড়ে থাকতো হয়তো মসজিদে অথবা স্কুল ভবনে কিংবা স্থানীয় হাসপাতালে।'

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ছাব্বিশতম অধ্যায়

বরিশালে ধ্বংসলীলা

১৯৭১ সালের দ্বিতীয় সপ্তাহে বরিশাল জেলার বহু স্থানে আওয়ামী লীগের বিদ্রোহে বাঙালি ও অবাঙালিদের মধ্যকার সম্পর্কের ওপর মারাত্মক চাপ সৃষ্টি হয়। গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে, পশ্চিম পাকিস্তানে বাঙালিদের হত্যা করা হচ্ছে এবং পাকিস্তান সেনাবাহিনী ঢাকায় বাঙালিদের গণহত্যা করছে। পশ্চিম পাকিস্তানি ও অন্যান্য অবাঙালিদের বিরুদ্ধে বাঙালি জনগোষ্ঠীকে উত্তেজিত করে তুলতে আওয়ামী লীগ এসব গুজবকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে। শুরুতে অবাঙালিদের বিরুদ্ধে বিচ্ছিন্ন সহিংসতা শুরু হয়। কিন্তু মার্চের চতুর্থ সপ্তাহে বরিশাল শহর এবং এ জেলার অন্যান্য জায়গায় অগ্নিসংযোগ, লুটতরাজ ও হত্যাকাণ্ড দাবাগ্নির মতো ছড়িয়ে পড়ে। এ হত্যাযজ্ঞে নিহতদের সংখ্যা ছিল ১৫ হাজারের বেশি।

(১৪৩) **একশো তেতাল্লিশতম সাক্ষীর বিবরণ:** ২৩ বছরের আহমেদ আলম মার্চে গোলযোগের পুরো সময় বরিশালে বসবাস করেন। ১৯৭৩ সালের অক্টোবরে তিনি করাচিতে প্রত্যাবাসন করেন। আহমেদ আলম ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে বরিশাল স্টীমার জেটির উপকণ্ঠে ৬০টি অবাঙালি পরিবার নিধনের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন:

> 'আওয়ামী লীগের জঙ্গিরা স্থানীয় শান্তি কমিটির একটি বৈঠকে যোগদানে এলাকার অবাঙালি বাসিন্দাদের আমন্ত্রণ জানায়। এসব অবাঙালিকে আশ্বাস দেয়া হয়েছিল যে, তাদের পরিবারকে রক্ষা করা হবে। রাত ৯টায় এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। হঠাৎ করে আওয়ামী লীগের সশস্ত্র জঙ্গিরা বৈঠকে যোগদানকারী অবাঙালিদের ওপর গুলিবর্ষণ করে এবং ঘটনাস্থলে অনেককে হত্যা করে। কয়েকজন অবাঙালি এ ফাঁদ থেকে পালাতে সক্ষম হয় এবং নিজ নিজ পরিবারকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিতে বাড়িতে ছুটে যায়।...
> 'মাঝরাতের ঠিক পূর্বক্ষণে আওয়ামী লীগের জঙ্গি, বিদ্রোহী পুলিশ ও গুণ্ডারা অবাঙালি কলোনি আক্রমণ করে এবং কয়েক ডজন বাড়ি পুড়িয়ে দেয়। তারা প্রায় সকল প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষকে হত্যা, ৫০ জন মহিলাকে অপহরণ এবং অনেককে ধর্ষণ করে। কয়েকদিন পর পাকিস্তান সেনাবাহিনী সেখানে পৌঁছে ভস্মীভূত অবাঙালি কলোনির ধ্বংসস্তূপ থেকে ১১২টি লাশ উদ্ধার করে। একটি পুকুরে বহু মহিলার লাশ পাওয়া যায়। শ্বাসরোধ করে এসব মহিলাকে হত্যা করা হয়েছিল। অন্যান্য অপহৃত অবাঙালি মহিলার কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি। এ হত্যাযজ্ঞ থেকে মাত্র এক ডজন লোক রক্ষা পেয়েছিল।...

(১৪৪) **একশো চুয়াল্লিশতম সাক্ষীর বিবরণ** ২৭ বছরের ফারজানা খাতুনের স্বামী বরিশাল জেলার পিরোজপুর মহকুমার ডাক বিভাগে চাকরি করতেন। ১৯৭১ সালে মার্চের তৃতীয়

www.pathagar.com

সপ্তাহে একটি লঞ্চে আওয়ামী লীগের দুর্বৃত্তরা তার স্বামীকে হত্যা করে। ফারজানা তার স্বামীর হত্যাকাণ্ডের বিবরণ দিতে গিয়ে বলেছেন:

> 'আমরা পিরোজপুর মহকুমায় ৬ বছর বসবাস করেছি। আমাদের বাঙালি প্রতিবেশীদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক ছিল আন্তরিক। তবে ১৯৭০ সালের ডিসেম্বরে সাধারণ নির্বাচনের পর আমাদের সম্পর্কে কিছুটা উত্তেজনা দেখা দেয়। ১৯৭১ সালে মার্চের শুরুতে এ শহরের অবাঙালিরা আশংকা ও অস্বস্তির মধ্যে ছিল। আওয়ামী লীগের জঙ্গিরা কয়েকজন অবাঙালিকে মারধর করে।...
>
> '২০ মার্চ আমি ও আমার স্বামী পিরোজপুর ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নেই। রাতে খুলনা অভিমুখী যাত্রীবাহী একটি লঞ্চে আরোহণ করি। লঞ্চটি ছিল যাত্রীতে বোঝাই। যাত্রীদের মধ্যে ছিল ৬০ জন অবাঙালি পুরুষ, মহিলা ও শিশু। এসব অবাঙালি নিরাপত্তা ও ভীতির কারণে শহর ত্যাগ করছিল। আমরা তাদের কয়েকজনকে চিনতাম।...
>
> 'দু'ঘন্টা পর লঞ্চটি একটি ছোট জেটিতে নোঙর ফেললে ৫০ জন সশস্ত্র দুস্কৃতকারী 'জয় বাংলা' ও 'আওয়ামী লীগ দীর্ঘজীবী হোক' শ্লোগান দিয়ে আমাদের লঞ্চকে অভ্যর্থনা জানায়। তাদের মধ্যে এক ডজন লোক বন্দুক ও ছোরা সজ্জিত হয়ে আমাদের লঞ্চে আরোহণ করে। তারা কয়েকজন অবাঙালিকে প্রহার করে এবং কয়েকজন মহিলার শাড়ি খুলে ফেলে। দুর্বৃত্তরা চিৎকার করে সকল বাঙালিকে লঞ্চ ত্যাগের নির্দেশ দেয়। বাঙালিরা নেমে যাওয়ায় তাদের জন্য অবাঙালিদের খুঁজে বের করা সহজ হয়। তারা লঞ্চের সকল অবাঙালি পুরুষকে হত্যা করে এবং শিশুদের নদীতে ফেলে দেয়। মায়েরা তাদের শিশুদের উদ্ধারে পানিতে ঝাঁপ দিলে দুর্বৃত্তরা ডুবন্ত মহিলা ও শিশুদের গুলি করে। তারা কয়েকজন কিশোরী অবাঙালিকে অপহরণ করে। নিহতদের মধ্যে আমার স্বামীও ছিলেন। লঞ্চের বাঙালি সারেং আমার স্বামীকে চিনতেন। তিনি আমার এবং আমার শিশু পুত্রের প্রতি সদয় হন। তার কেবিনে আমাদের লুকিয়ে রাখেন। সারেং আমাদেরকে খুলনায় নামিয়ে দেন। খুলনায় আমরা কয়েকজন আত্মীয়ের বাসায় দু'তিন মাস অবস্থান করে হত্যাকাণ্ড থেকে বেঁচে যাই। আমি আমার অলঙ্কার বিক্রি করে দেই এবং কিছু নগদ অর্থ সংগ্রহ করি। এ নগদ অর্থ আমাকে এবং আমার পুত্রকে নেপাল পৌঁছতে সহায়তা করে। আমাদের এ যাত্রা ছিল বিপজ্জনক ও কষ্টদায়ক। ১৯৭৩ সালের জুলাইয়ে আমরা করাচিতে পৌঁছি।'

(১৪৫) একশো পঁয়তাল্লিশতম সাক্ষীর বিবরণ: ১৯৭১ সালে মার্চে বরিশাল জেলার ঝালকাঠির কুর্মিটোলায় আওয়ামী লীগের দুর্বৃত্তরা ৫০ বছরের আবদুস শাকুরের স্ত্রী ও দু'সন্তানকে হত্যা করে। এ হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন:

> '১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পরই আমি বিহার থেকে পূর্ব পাকিস্তানে অভিবাসন করি। আমি বঙ্গদেশ বিভক্তির আগে শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, খাজা নাজিমুদ্দিন, নূরুল আমিন ও মাওলানা তমিজউদ্দিন খানের জনসভায় যোগদান করতাম। আমি পাকিস্তানের আদর্শে বিশ্বাস করতাম। পূর্ব পাকিস্তানে অভিবাসন করার পর আমি এক বাঙালি মেয়েকে বিয়ে করি। আমি একটি ব্যবসা শুরু করি। ব্যবসায় আমার উন্নতি হয়। বাঙালিদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিল চমৎকার। আমি আমার স্ত্রীর মতো বাংলা বলতে পারতাম। আমাদের ছিল দুই পুত্র ও এক কন্যা। জন্মগতভাবে তারা ছিল বাঙালি। তাদের মাতৃভাষা ছিল বাংলা।...

www.pathagar.com

'১৯৭১ সালে মার্চের প্রথম সপ্তাহ থেকে আমাদের শহরে আওয়ামী লীগের বিদ্রোহ শুরু হয় এবং বাঙালি ও অবাঙালিদের সম্পর্কে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। ২৪ মার্চ আওয়ামী লীগ কর্মীদের একটি দল এবং ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস ও আনসারের বিদ্রোহীরা আমাদের এলাকায় অবাঙালি বসতিতে আক্রমণ চালায়। তারা আমার দুই পুত্রকে টেনে হিঁচড়ে বাইরে নিয়ে যায়। দড়ি দিয়ে তাদেরকে একটি ল্যাম্প পোস্টে বেঁধে গুলি করে হত্যা করে। তারা আমার মেয়েকেও অপহরণ করে। তাকে খুঁজে বের করতে আমি বরিশালে এক মাস নিষ্ফল চেষ্টা চালাই। দুর্বৃত্তরা আমাকে ও আমার স্ত্রীকে রাইফেলের বাট দিয়ে আঘাত করে। কয়েকজন দয়ালু বাঙালি প্রতিবেশী আমাদেরকে হত্যা না করার জন্য তাদের অনুরোধ করে। আমার স্ত্রী এ ধকল ও শোক সহ্য করতে পারেনি। ১৯৭১ সালের এপ্রিলে তিনি মারা যান। বরিশালে অসংখ্য মেয়েকে অপহরণ করা হয়। আমাদের ওপর আক্রমণকারীদের উন্মত্ততা ছিল ধারণার অতীত। আমি আর কখনো এমন উন্মাদনা দেখিনি। আমি চট্টগ্রামে স্থানান্তরিত হই। ১৯৭৪ সালে জাতিসংঘ আমাকে চট্টগ্রাম থেকে করাচিতে প্রত্যাবাসন করে।'

(১৪৬) **একশো ছিচল্লিশতম সাক্ষীর বিবরণ:** ১৯৭১ সালের মার্চে বরিশালের ঝালকাঠিতে আওয়ামী লীগের দুর্বৃত্তরা ২৪ বছরের নাসরিনের স্বামী আলা রাখাকে হত্যা করে। নাসরিন তার সাক্ষ্যে বলেছেন:

'১৯৭১ সালের মার্চ থেকেই আমাদের ছোট শহরে উত্তেজনা অনুভূত হয়। আমরা গুজব শুনতে পেয়েছিলাম যে, আওয়ামী লীগ অবাঙালিদের হত্যার পরিকল্পনা করছে। আমার স্বামী স্থানীয় একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে পাহারাদার হিসেবে চাকরি করতেন।...

'১৯ মার্চ অবাঙালিদের বিরুদ্ধে আগ্নেয়গিরির লাভার উদ্গিরণ ঘটে। আমাদের এলাকায় প্রায় এক হাজার অবাঙালি বসবাস করতো। এলাকার অধিকাংশ পুরুষকে হত্যা করা হয়। রাতে দুর্বৃত্তদের একটি দল আমাদের বাড়িতে প্রবেশ করে আমার স্বামী ও আমার দুই শিশু পুত্রকে গুলি করে। একজন দুর্বৃত্ত আমার ওপর হামলা চালায়। ভেবেছিলাম আমি যেন মরে গেছি। তারা আমার শাড়ি ছিঁড়ে ফেলে। বন্দুকের মুখে তারা আমাকে তাদের সঙ্গে যেতে বাধ্য করে। শহরের প্রধান বাজারে আমি এক ডজন অবাঙালি যুবতী মহিলাকে দেখতে পাই। তাদের পরনের কাপড় ছিল ছিন্ন ভিন্ন। তাদের কেউ কেউ ছিল প্রায় বিবস্ত্র। দুর্বৃত্তরা শহরে আমাদের প্যারেড করায়। তারা জানায় যে, আমাদেরকে তাদের চাকরানী করা হবে। কয়েকটি মেয়ে পালিয়ে যাবার এবং একটি কুয়ায় লাফিয়ে পড়ার চেষ্টা করে। এসব মেয়েকে গুলি করে হত্যা করা হয়।...

'ভিড়ের মধ্যে ছিলেন মাঝবয়সী একজন বাঙালি। আমার প্রতি তার দয়া হয়। লোকটি আমাকে তার বাড়িতে নিয়ে যেতে সহযোগীদের রাজি করান। তিনি বললেন, বাড়িতে তার কাজের লোকের দরকার। সত্যি লোকটি ছিলেন একজন ফেরেশতা। প্রথম দিন লোকটি তার মায়ের সামনে আমাকে বললেন, তিনি আমাকে তার মায়ের পেটের বোনের মতো সম্মান করবেন। আমি তার বাড়িতে ১৪ দিন অবস্থান করি। তিনি তার কথা রেখেছিলেন। আমি তার বাড়িতে বসবাস করতাম। তার জন্য রান্না করতাম। পাকিস্তান সেনাবাহিনী বিদ্রোহীদের হটিয়ে দেয়ার পর আমি আমার বোন ও দেবরের খোঁজ পাই। তারা আমার যত্ন করতো। ১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে আমি জাহাজে করে চট্টগ্রাম থেকে করাচিতে প্রত্যাবাসন করি।'

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সাতাইশতম অধ্যায়

ময়মনসিংহে গণহত্যা

১৯৭১ সালে মার্চের তৃতীয় সপ্তাহ থেকে এপ্রিলের তৃতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত আওয়ামী লীগের জঙ্গি, ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলসের বিদ্রোহী সৈন্যরা ময়মনসিংহে অবাঙালি হত্যাকাণ্ডে মেতে উঠে। এপ্রিলের তৃতীয় সপ্তাহে পাকিস্তান সেনাবাহিনী বিদ্রোহীদের কবল থেকে ময়মনসিংহ পুনরুদ্ধার করা নাগাদ এ হত্যাকাণ্ড অব্যাহত ছিল। সাক্ষ্য প্রমাণে দেখা গেছে যে, এখানে ২০ হাজার অবাঙালিকে হত্যা করা হয়েছিল। ১৯৭১ সালের ২৬-২৭ মার্চ ময়মনসিংহ সেনানিবাসে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের বাঙালি সৈন্য এবং আধা-সামরিক ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস বিদ্রোহ করে এবং ব্যারাক ও আবাসিক কোয়ার্টারে মধ্যরাতে আকস্মিক হামলা চালিয়ে শত শত পশ্চিম পাকিস্তানি অফিসার ও সৈন্যকে হত্যা করে। রক্তপাত থেকে মহিলা ও শিশুরাও রেহাই পায়নি।

১৬ এপ্রিল ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের একদল বিদ্রোহী সৈন্য ময়মনসিংহ জেলা কারাগারে হামলা চালিয়ে ১৭ জন বিশিষ্ট অবাঙালি নাগরিককে হত্যা করে। এসব বিশিষ্ট নাগরিককে বিদ্রোহীরা সেখানে আটক রেখেছিল। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে উন্মত্ত জনতা এবং বিদ্রোহী বাঙালি সৈন্যরা ময়মনসিংহ শহরের শানকিপাড়া ও ৯টি আবাসিক এলাকার প্রায় সকল অবাঙালি পুরুষকে হত্যা করে। দেড় হাজারের বেশি মহিলা ও শিশুকে গবাদি-পশুর মতো একটি মসজিদ ও স্কুলে জড়ো করে রাখা হয়েছিল। ১৯৭১ সালের ৩১ এপ্রিল পাকিস্তান সেনাবাহিনী ময়মনসিংহ শহর পুনর্দখল করার সময় এসব মহিলা ও শিশুকে উদ্ধার করা হয়। বিদ্রোহীরা আওয়ামী লীগ বিরোধী বহু বাঙালিকে হত্যা করে।

বার্তা সংস্থা রয়টার্সের প্রতিনিধি মরিস কুইন্টান্স মে মাসের গোড়ার দিকে ময়মনসিংহ সফর করেন। ১৯৭১ সালের ১৫ মে সিলোন ডেইলি নিউজে তার প্রেরিত একটি সংবাদে বলা হয়:

> '১৯৪৭ সালে উপমহাদেশ বিভক্তির সময় ভারত থেকে অভিবাসনকারী অবাঙালিদের ওপর জনতার হামলা, তাদের কুপিয়ে হত্যা এবং তাদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেয়ার প্রমাণ পাওয়া গেছে।...
>
> 'প্রত্যক্ষদর্শীরা ময়মনসিংহের উত্তর দিকে একটি মসজিদে আশ্রয়গ্রহণকারী দেড় হাজার বিধবা ও এতিম শিশুর মর্মন্তুদ উপাখ্যান বর্ণনা করেছেন। বিচ্ছিন্নতাবাদী হিসেবে চিহ্নিত সশস্ত্র ব্যক্তিরা তাদের স্বামী ও পিতাকে হত্যা করেছে।'

১৯৭১ সালের ৭ মে নিউইয়র্ক টাইমসে প্রকাশিত ময়মনসিংহ থেকে পাকিস্তানি প্রতিনিধি ম্যালকম ব্রাউন প্রেরিত আরেকটি সংবাদে বলা হয়:

> 'কর্মকর্তারা বলেছেন যে, সরকারি সৈন্যরা শহরের (ময়মনসিংহ) নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করার আগে বাঙালিরা কমপক্ষে এক হাজার বিহারী অথবা অবাঙালিকে হত্যা করেছে।

www.pathagar.com

সেনাবাহিনীর অফিসাররা জনগণের সঙ্গে সাংবাদিকদের পরিচয় করিয়ে দেন। এসব জনগণ সাংবাদিকদের জানিয়েছে, ২৫ মার্চ পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক অভিযান শুরু হওয়ার পরক্ষণে নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালিরা বিহারী হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে।...

'একজন অফিসার বলেছেন, বহু লাশ ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে রয়েছে। এসব লাশ শনাক্ত করা অথবা কবর দেয়া অসম্ভব। তিনি বলেছেন, এসব লাশ ব্রহ্মপুত্র নদে ভাসিয়ে দেয়া হবে।...

'ময়মনসিংহের বাইরে ফসলের মাঠ ও ফলের বাগান এবং গুচ্ছ গুচ্ছ বস্তিঘরে দৃশ্যত প্রাণহানি ঘটেছে সর্বাধিক। বস্তিঘরগুলো পুড়িয়ে ছাই করে দেয়া হয়েছে।'

আমেরিকান বার্তা সংস্থা এপি'র একজন প্রতিনিধি ১৯৭১ সালে মে মাসের শুরুতে ময়মনসিংহ সফর করেন। শহরের পোস্ট মাস্টারের উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি তার রিপোর্টে লিখেছেন:

'যেখানে আমি (পোস্ট মাস্টার) বসবাস করতাম সেখানে ৫ হাজার অবাঙালি ছিল। বর্তমানে সেখানে মাত্র ২৫ জন জীবিত।...'

একই হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে ১৯৭১ সালের ৭ মে বার্তা সংস্থা রয়টার্সের প্রতিনিধি মরিস কুইন্টান্স ময়মনসিংহ থেকে তার প্রেরিত রিপোর্টে বলেছেন:

'সাংবাদিকদের গোলযোগপূর্ণ অঞ্চলগুলোতে দ্বিতীয় দিনের মতো হেলিকপ্টারে বহন করে নিয়ে যাওয়া হয়। সাংবাদিকরা ময়মনসিংহের পোস্ট মাস্টার এসিস্ট্যান্ট হিসেবে পরিচয়দানকারী এক ব্যক্তির সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন। তিনি তার ঘাড়ে একটি দাগ দেখান। তিনি বলেছেন, এ দাগ হচ্ছে তার শরীরে বেয়নেট চার্জের চিহ্ন। লোকটি জানিয়েছেন, তিনি ৫ হাজার অবাঙালির একটি কলোনিতে বাস করতেন। ১৭ এপ্রিলের হত্যাকাণ্ড থেকে এ কলোনির মাত্র ২৫ জন বেঁচে যায়। এ এসিস্ট্যান্ট পোস্ট মাস্টার তার পরিবারের হত্যাকাণ্ড এবং পরিবারের সদস্যদের লাশ ক্ষতবিক্ষত করার উপাখ্যান উল্লেখ করার সময় কান্নায় ভেঙ্গে পড়লে আকস্মিকভাবে সাক্ষাৎকার গ্রহণ শেষ হয়ে যায়।...

'ময়মনসিংহের জেনারেল অফিসার কমান্ডিং বলেছেন, মার্চের শেষাংশে এ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয় এবং শেখ মুজিবুর রহমানের বিচ্ছিন্নতাবাদী আওয়ামী লীগের সশস্ত্র শাখা আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক, ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস ও ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সপক্ষত্যাগী সৈন্যরা এ হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে।'

এ বইটি লেখার জন্য করাচিতে ১৯৭১ সালের মার্চ-এপ্রিলে ময়মনসিংহে অবাঙালি হত্যাকাণ্ডের প্রত্যক্ষদর্শীদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। তারা তাদের সাক্ষ্যে সেখানে রক্তপাত ও বিভীষিকার অভিন্ন বর্ণনা দিয়েছেন।

(১৪৭) **একশো সাতচল্লিশতম সাক্ষীর বিবরণ:** ৫৫ বছরের মুজিবুর রহমান ময়মনসিংহ শহরের শানকিপাড়া কলোনির ১২ নম্বর ব্লকের ৮ নম্বর কোয়ার্টারে বসবাস করতেন। তার কাপড়ের একটি দোকান ছিল। তিনি তার সাক্ষ্যে বলেছেন:

www.pathagar.com

'১৯৭১ সালে মার্চের শেষ সপ্তাহে আমি আমাদের এলাকার মসজিদে আছরের নামাজ পড়ছিলাম। হঠাৎ করে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলসের প্রায় ২০০ বাঙালি সৈন্য এবং আওয়ামী লীগের জঙ্গিরা শানকিপাড়া কলোনি আক্রমণ করে। তারা মসজিদে নামাজ আদায়রত অবাঙালি মুসল্লিদের ওপর মেশিনগানের গুলিবর্ষণ করে। গোলাগুলিতে কমপক্ষে ৮০ জন মুসল্লি নিহত এবং অনেকে আহত হয়। আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলি। আক্রমণকারীরা ধারণা করেছিল, আমি মরে গেছি। গভীর রাতে আমি জ্ঞান ফিরে পাই। চুপি চুপি বাড়িতে ফিরে আসি। আমি দেখতে পাই যে, বাঙালি বিদ্রোহীরা আমার বাড়ি লুট করেছে। আমার পুত্র ও পুত্রবধূ নিখোঁজ। কয়েকটি বাড়িতে আগুন জ্বলছে। বাড়িতে যাবার পথে আমি অসংখ্য লাশ পড়ে থাকতে দেখি। কয়েকজন বৃদ্ধা মহিলা লাশের ওপর পড়ে বিলাপ করছিল। রাতের নীরবতা ভেঙ্গে দূর থেকে গুলির আওয়াজ ভেসে আসছিল। বিদ্রোহীরা কলোনির সকল অবাঙালি পুরুষকে হত্যা করে। তারা দুগ্ধপোষ্য শিশুসহ ক্রন্দনরত মহিলাদের একটি বিশাল মসজিদে তাড়িয়ে নিয়ে যায়। এপ্রিলের তৃতীয় সপ্তাহে এ শহর পুনরুদ্ধার করার পর পাকিস্তান সেনাবাহিনী এসব মহিলাকে উদ্ধার করে। আমাদের এলাকায় কমপক্ষে ৫ হাজার অবাঙালি বসবাস করতো। তাদের মধ্যে ২৫ জনের বেশি রক্ষা পায়নি। জীবিতদের মধ্যে আমিও ছিলাম একজন। আমি চিরদিনের জন্য ময়মনসিংহ ত্যাগ করে করাচিতে এসে পৌঁছি।'

(১৪৮) **একশো আটচল্লিশতম সাক্ষীর বিবরণ:** ৩৮ বছরের নাসিমা খাতুনের স্বামী সৈয়দ তাহির হোসেন আখতার ময়মনসিংহ রেলওয়ে স্টেশনে কেরাণী হিসেবে চাকরি করতেন। বাঙালি বিদ্রোহীরা তাকে হত্যা করে। নাসিমা খাতুন তার বিয়োগান্ত স্মৃতি উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন:

'শানকিপাড়া কলোনির সি-ব্লকে আমাদের একটি ছোট বাড়ি ছিল। বাসিন্দাদের সবাই ছিল অবাঙালি। ১৯৭১ সালে মার্চের মাঝামাঝি থেকে ভীতি ও দুশ্চিন্তার কালো মেঘ ঘনীভূত হতে থাকে। মার্চের শেষদিকে রাইফেল ও মেশিনগান সজ্জিত বিদ্রোহীরা আমাদের এলাকায় বেশকিছু বাড়িঘরে হামলা চালিয়ে পুরুষদের হত্যা এবং মহিলা ও শিশুদের অপহরণ করে। ১৭ এপ্রিল প্রায় ১৫ হাজার রক্তপিপাসু বিদ্রোহী ও দুর্বৃত্ত রাইফেল ও মেশিনগান নিয়ে আমাদের কলোনি আক্রমণ করে। তারা শত শত ঘরে অগ্নিসংযোগ এবং পুরুষ ও ছেলেদের ঘর থেকে টেনে নিয়ে হত্যা করে। আমার স্বামী ও পুত্র আমাদের বাড়ির সামনের দরজায় তালা লাগিয়ে দেয়। আমাদের পালানোর কোনো পথ ছিল না। প্রায় ৫০ জন দুর্বৃত্ত দরজা ভেঙ্গে ভেতরে প্রবেশ করে। আমি আল্লাহ ও পবিত্র কোরআনের দোহাই দিয়ে আমার স্বামী ও পুত্রের প্রাণভিক্ষা চাই। একজন দুর্বৃত্ত রাইফেলের বাট দিয়ে আমার মাথায় আঘাত করলে আমি মাটিতে পড়ে যাই। দুর্বৃত্তরা আমার স্বামী ও পুত্রকে টেনে বাইরে নিয়ে গুলি করে হত্যা করে। আমি তাদের লাশের ওপর বিলাপ করতে চাইলাম। কিন্তু দুর্বৃত্তরা বেয়নেট দিয়ে খোঁচা মেরে আমাকে একটি স্কুল ভবনে নিয়ে যায়। সেখানে আমার মতো শত শত শোকাহত বিধবা ও মা আশ্রয় নিয়েছিল। এ নরকে জীবন ছিল যন্ত্রণা। আমি বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়ি। রাত-দিন প্রলাপ বকতাম। মহিলারা বিলাপ করতো। ক্ষুৎ পিপাসায় শিশুরা কাঁদতো। কয়েকজন মহিলা ও শিশু মারা যায়। কদাচিৎ কিশোরীদের দেখা যেতো। জৈবিক লালসা চরিতার্থ করার জন্য দুর্বৃত্তরা তাদের অপহরণ করেছিল। বন্দিদশার চতুর্থ দিনে

www.pathagar.com

পাকিস্তান সেনাবাহিনী আমাদের উদ্ধার করে। আমাকে ঢাকায় একটি ত্রাণ শিবিরে স্থানান্তর করা হয়। সেখান থেকে আমার পিতা আমাকে চট্টগ্রামে তার বাড়িতে নিয়ে যান। ১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারিতে আমি চট্টগ্রাম থেকে করাচিতে প্রত্যাবাসন করি।'

(১৪৯) **একশো উনপঞ্চাশতম সাক্ষীর বিবরণ:** ৬০ বছরের বৃদ্ধ শেখ হাবিবুল্লাহ ছিলেন একটি বেবিট্যাক্সির মালিক। তিনি নিজেই বেবিট্যাক্সি চালাতেন। শেখ হাবিবুল্লাহ বসবাস করতেন ময়মনসিংহের শানকিপাড়া এলাকার কিস্টোপুরে দৌলতমুন্সী রোডের ১৪ নম্বর বাড়িতে। ১৯৭১ সালের মার্চে আওয়ামী লীগের দুর্বৃত্তরা তার চারটি জওয়ান ছেলেকে হত্যা করে। শেখ হাবিবুল্লাহ জানান, তিনি ও তার ছেলেরা চমৎকার বাংলা বলতে পারতেন। তিনি ১৯৪৭ সালের আগস্টে উপমহাদেশ বিভক্তির অব্যবহিত পরে ভারতের বিহার রাজ্য থেকে পূর্ব পাকিস্তানে অভিবাসন করেন। তাদেরকে 'বিহারী' বলা হতো। তিনি উর্দু ভুলে গিয়েছিলেন। তাই তিনি সাক্ষ্যদানের দলিলে দস্তখত করেন বাংলায়। বেদনা বিধুর কণ্ঠে শেখ হাবিবুল্লাহ তার জীবনের অবিস্মরণীয় স্মৃতির বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন:

'১৯৭১ সালে মার্চের মাঝামাঝি ময়মনসিংহকে উত্তেজনা গ্রাস করে। অবাঙালিদের ভয়ভীতি দেখানো হতো। তাদেরকে উপহাস করা হতো। গুজব শোনা যাচ্ছিল যে, পুলিশের অস্ত্রাগার থেকে লুণ্ঠিত অস্ত্র এবং ভারত থেকে পাচারকৃত অস্ত্র নিয়ে আওয়ামী লীগ অবাঙালিদের ওপর হামলা করবে। ২৩ মার্চ প্রথম আওয়ামী লীগের গুণ্ডারা শানকিপাড়া কলোনিতে হামলা করে। মার্চের শেষ সপ্তাহ এবং এপ্রিলের প্রথমার্ধে আওয়ামী লীগের সশস্ত্র গুণ্ডা এবং বিদ্রোহী বাঙালি সৈন্যরা হাজার হাজার অবাঙালিকে হত্যা করে এবং তাদের বাড়িঘর লুট ও অগ্নিসংযোগ করে। এপ্রিলের শুরুতে ৫০ জন সশস্ত্র বিদ্রোহীর একটি দল আমাদের বাড়িতে প্রবেশ করে। আমার উপযুক্ত ছেলে সানাউল্লাহ, শফি আহমেদ, আলী আহমেদ ও আলী আখতার আক্রমণকারীদের প্রতিরোধ করার চেষ্টা করে। কিন্তু তাদের কাছে কোনো অস্ত্র ছিল না। একজন বন্দুকধারী আমার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে হত্যা করার জন্য বন্দুক তাক করলে আমি তাকে ঝাপটে ধরি। সে আমাকে মাথায় আঘাত করলে আমি মাটিতে পড়ে যাই। আমার জ্ঞান হারানোর ঠিক আগ মুহূর্তে মেশিনগানের গুলি চালানো হয়। গুলিতে আমার ছেলেরা ধরাশায়ী হয়। তারা রক্তে ভাসছিল। আমি সানাউল্লাহ ও শফি আহমেদের স্ত্রীদের চিৎকার দিয়ে একটি রুমের দিকে দৌড়ে যেতে দেখি। সেখানে তাদের স্বামীদের হত্যা করা হচ্ছিল। আমি জ্ঞান হারাই। দুর্বৃত্তরা ভেবেছিল আমি মারা গেছি। পরদিন ভোরে আমি জ্ঞান ফিরে পাই। আমি আমার চার পুত্রের লাশ দেখতে পাই। আমি প্রায় পাগল হয়ে যাই। তাদের রক্তমাখা মুখে চুমো দেই। তাদের হৃদস্পন্দন অনুভব করার চেষ্টা করি। কিন্তু হায়! তাদের সবাই ছিল তখন মৃত। আমার দুই পুত্রবধূর কোনো খোঁজ নেই। আমার বাড়ি লুণ্ঠিত। মূল্যবান কোনো জিনিসপত্র নেই। আমি আমার ছেলেদের লাশ দাফনের জন্য গোরস্তানে নিয়ে যেতে ভয় পাচ্ছিলাম। আমার আশপাশে কোনো জীবিত মানুষ নেই। আমার কানে দূর থেকে গুলির আওয়াজ ভেসে আসছিল। আমাদের ভূতুরে কলোনিতে কুকুরের ঘেউ ঘেউ ছিল একমাত্র জীবনের স্পন্দন। আমার বাড়ির পাশের রাস্তায় লাশের ছড়াছড়ি।...

'এলাকার একটি মসজিদে কয়েকজন ভাগ্যাহত বিহারী আশ্রয় নিয়েছিল। বাঙালিরা এ মসজিদের নাম দিয়েছিল 'বিহারী মসজিদ'। একটি বিশাল সশস্ত্র গ্রুপ মসজিদের দরজা

www.pathagar.com

ভেঙ্গে ভেতরে ঢুকে ১৭৫ জন অবাঙালিকে হত্যা করে। প্রায় তিন শ' অবাঙালি শানকিপাড়ায় তাদের বাড়িঘর ছেড়ে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আশ্রয় নেয়। তাদের কোনো অস্ত্র ছিল না। এপ্রিলের গোড়ার দিকে বিদ্রোহীরা তাদের নিশ্চিহ্ন করে দেয়। পাকিস্তান সেনাবাহিনী ময়মনসিংহ পুনরুদ্ধার করার পর আমি গোরস্তানে আমার ছেলেদের লাশ দাফন করি। আমি নিকটবর্তী চল্লিশবাড়ি, ছত্রিশবাড়ি, ইসলামাবাদ ও আইকা কলোনিতে যাই। আমার মতো দু'একজন বৃদ্ধ ছাড়া সেখানে আর কেউ জীবিত ছিল না। একসময়ের জনবহুল কলোনিগুলোতে জনমানবের কোনো চিহ্ন ছিল না। গোটা এলাকায় পচা লাশের দুর্গন্ধ। অসংখ্য বাড়ি ভস্মীভূত। বাড়িঘরগুলো ছাই ভস্মে পরিণত। আমি জানতে পেরেছিলাম যে, ময়মনসিংহে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ বজায় থাকার সময় বিদ্রোহীরা শানকিপাড়া কলোনিতে দেড় হাজারের বেশি অবাঙালি যুবতী মহিলাকে ধর্ষণ ও অপহরণ করেছে। কয়েকজন বিহারী মহিলা নিজেদের ইজ্জত বাঁচাতে কুয়ায় ঝাঁপিয়ে পড়ে।...

'থানার কাছাকাছি বড় মসজিদের বাঙালি ইমাম ছিলেন একজন ফেরেশতা। তিনি শানকিপাড়া হত্যাযজ্ঞে জীবিত পাঁচ শতাধিক বিহারীকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। ইমাম সাহেব বাঙালি বিদ্রোহীদের কাছে তাদের জীবন ভিক্ষা চান। বাঙালি মোয়াজ্জিনের সহায়তায় তিনি অন্যান্য এলাকায় ধার্মিক বাঙালিদের কাছ থেকে ভাত সংগ্রহ করে মসজিদে আশ্রিত ভীতসন্ত্রস্ত অবাঙালি পুরুষ, মহিলা ও শিশুদের খাইয়েছিলেন। আওয়ামী লীগের গুণ্ডারা তাকে খুন করার পরিকল্পনা করেছিল। কিন্তু ২১ এপ্রিল পাকিস্তান সেনাবাহিনী যথাসময়ে এসে পৌঁছে যাওয়ায় তার জীবন রক্ষা পায় এবং বিহারীরা মসজিদে আশ্রয় লাভের সুযোগ পায়। মার্চে অবাঙালি হত্যাকাণ্ড শুরু হওয়ার আগে বেবিট্যাক্সি ড্রাইভার হিসেবে আমি ভালোভাবে সেনানিবাস চিনতাম। সেখানে অবস্থানরত সৈন্যদের মধ্যে আমার পাঠান ও পাঞ্জাবী বন্ধু ছিল। পাকিস্তান সেনাবাহিনী সেনানিবাস পুনর্দখল করার তিনদিন পর সেখানে গিয়ে আমি ২৬-২৭ মার্চ মধ্যরাতে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের বিদ্রোহী বাঙালি সৈন্যদের হামলায় অবাঙালি সৈন্য ও তাদের পরিবারবর্গের নির্মম হত্যাকাণ্ডের কথা জানতে পারি। আমার পশ্চিম পাকিস্তানি বন্ধু সৈন্যদের কোনো চিহ্ন ছিল না। আমি ১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে করাচিতে ফিরে আসি।'

(১৫০) **একশো পঞ্চাশতম সাক্ষীর বিবরণ:** ৩১ বছরের আনোয়ার হোসেন ময়মনসিংহে একটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে চাকরি করতেন। ১৯৭১ সালের মার্চে একজন বাঙালি বন্ধু তার জীবন রক্ষা করে। শরৎকালে তাকে ও তার পরিবারকে ঢাকায় স্থানান্তর করা হয়। ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে ভারতের কাছে পূর্ব পাকিস্তানের পতন ঘটলে ঢাকার মোহাম্মদপুরে তারা আতঙ্কিত জীবনযাপন করে। ১৯৭৪ সালের জানুয়ারিতে জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে তারা করাচিতে পৌঁছে। আনোয়ার হোসেন ১৯৭১ সালে মার্চের ঘটনাবলীর ব্যাপারে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে বলেছেন:

'১৯৭১ সালের ২৪ মার্চ আওয়ামী লীগ ময়মনসিংহে একটি বিরাট মিছিল বের করে। মিছিলকারীদের অনেকের কাছে ছিল রাইফেল, বর্শা, কুঠার, ছোরা ও লাঠি। আমার স্থানীয় বাঙালি বন্ধু আমাকে জানিয়েছিলেন যে, মিছিলকারীদের মধ্যে ময়মনসিংহের স্থানীয় লোক ছিল কম। মিছিলটি আমাদের এলাকা প্রদক্ষিণ করে এবং বিহারীদের বিরুদ্ধে শ্লোগান দেয়। মিছিলে নেতৃত্বদানকারী আওয়ামী লীগের উগ্রপন্থীরা মাইকে

www.pathagar.com

ঘোষণা করে যে, সকল অবাঙালিকে স্বেচ্ছায় অস্ত্র জমা দিতে হবে। নয়তো তল্লাশি চালানো হবে এবং কারো কাছে অস্ত্র পাওয়া গেলে তাকে গুলি করে হত্যা করা হবে। আমাদের এলাকার বিহারী অধিবাসীরা তাদের অস্ত্র জমা দেয়। অস্ত্রের মধ্যে ছিল কয়েকটি বন্দুক, ছোরা ও বর্শা। যেসব অবাঙালি মিছিলকারীদের কাছে অস্ত্র জমা দিতে গিয়েছিল তাদেরকে একটু দূরে একটি খোলা জায়গায় হেঁটে যেতে বলা হয়। সেখানে তাদেরকে হত্যা করা হয়। কয়েক ঘন্টা পর মিছিলকারীরা আমাদের এলাকায় ফিরে আসে এবং অসংখ্য অবাঙালির বাড়িঘর লুট ও অগ্নিসংযোগ করে। বন্দুকের মুখে বিলাপরত মহিলাদের একটি স্কুল ভবনে নিয়ে যাওয়া হয়। এসব মহিলার অনেকের সঙ্গে ছিল দুগ্ধপোষ্য শিশু। মার্চের মাঝামাঝিতে আমি আশংকা করছিলাম যে, বিহারীদের ওপর বাঙালিদের হামলা আসন্ন। আমি একজন চরিত্রবান ইসলামপ্রিয় বাঙালি বন্ধুর সহায়তা কামনা করি। আমাদের এলাকায় আওয়ামী লীগের হামলা শুরু হওয়ার কয়েক ঘন্টা আগে আমি তার বাড়িতে আমার পরিবার স্থানান্তরিত করি। এভাবে আমি হত্যাকাণ্ড থেকে রেহাই পায়। এপ্রিলের তৃতীয় সপ্তাহে পাকিস্তান সেনাবাহিনী ময়মনসিংহ পুনর্দখল করার পর আমি আমাদের বাড়িতে ফিরে যাই। আমার বাড়ি ছিল আংশিক ভস্মীভূত ও লুণ্ঠিত। আমি একসময়ের হাস্য কোলাহলপূর্ণ জনবহুল বসতিতে খুব কমসংখ্যক অবাঙালিকে জীবিত দেখতে পাই।...

(১৫১) **একশো একান্নতম সাক্ষীর বিবরণঃ** ৩৫ বছরের ফাহিম সিদ্দিকী ময়মনসিংহে একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে চাকরি করতেন এবং দু'ভাইকে নিয়ে সীতারামপুর এলাকায় একটি ভাড়া বাসায় বসবাস করতেন। ১৯৭১ সালের হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে তিনি তার সাক্ষ্যে বলেছেনঃ

'১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে আমি একটি রুশ জাহাজে করাচির উদ্দেশে চট্টগ্রাম ত্যাগ করি। আমি মনস্থির করেছিলাম যে, বিগত সোয়া দু'বছরের দুঃস্বপ্ন ভুলে যাবো। আমি আমার জীবনের সর্বোত্তম সময় ময়মনসিংহে কাটিয়েছি। আমি এ শহরকে অত্যন্ত ভালোবাসতাম এবং বাঙালি ও অবাঙালিদের মধ্যে আমার অত্যন্ত ভালো বন্ধু ছিল। আমি চমৎকার বাংলা বলতে পারতাম। ১৯৭১ সালে মার্চের শেষদিকে বন্দুক ও শাবল নিয়ে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে একটি উন্মত্ত জনতা আমাদের এলাকায় অবাঙালিদের বাড়িঘর ভাঙচুর করে। পুরুষদের হত্যা, বাড়িঘর লুট ও অগ্নিসংযোগ করাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। দুর্বৃত্তরা আমার বাড়ি লুট করে এবং নিকটবর্তী একটি মাঠে আমার উপযুক্ত দুই ভাইকে হত্যা করে। এ মাঠটি ছিল একটি বধ্যভূমি। আমাদের এলাকায় দুর্বৃত্তরা প্রবেশ করার কয়েক মিনিট আগে আমি বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়েছিলাম। আমি একটি জরাজীর্ণ ও পরিত্যক্ত ভবনে আশ্রয় নেই। এপ্রিলের তৃতীয় সপ্তাহে পাকিস্তান সেনাবাহিনী বিদ্রোহীদের নিয়ন্ত্রণ থেকে ময়মনসিংহ পুনর্দখল করা নাগাদ আমি সেখানে অবস্থান করি। আমি আমার এলাকায় হত্যাকাণ্ড থেকে খুব কম লোককে জীবিত থাকতে দেখতে পাই।'

(১৫২) **একশো বায়ান্নতম সাক্ষীর বিবরণঃ** ৩৫ বছরের আনোয়ারী বেগম ময়মনসিংহে রেলওয়ে কলোনির টি-৫৬ নম্বর কোয়ার্টারে বসবাস করতেন। তিনি বাঙালি বিদ্রোহীদের হাতে তার স্বামীর হত্যাকাণ্ড প্রত্যক্ষ করেন। আনোয়ারী বেগম তার সাক্ষ্যে বলেছেনঃ

'এপ্রিলের দ্বিতীয় সপ্তাহে ময়মনসিংহ শহর ছিল বাঙালি বিদ্রোহীদের নিয়ন্ত্রণে। এ সময়

www.pathagar.com

অর্ধ ডজন বাঙালি আমাদের বাসায় এসে আমার স্বামীকে জানায় যে, আমরা আমাদের যাবতীয় নগদ অর্থ ও অলঙ্কার দিয়ে দিলে তারা আমাদের রক্ষা করবে। আমি তৎক্ষণাৎ আমার সব অলঙ্কার খুলে তাদের হাতে তুলে দেই। দ্রুত নগদ অর্থগুলো বাঙালি আগন্তুকদের কাছে হস্তান্তর করি। আমরা আতঙ্কের মধ্যে রাত কাটাই। আমি আমাদের বাড়ি ছেড়ে শহরের অন্য এলাকায় এক বাঙালি বন্ধুর বাড়িতে আশ্রয় নেয়ার জন্য আমার স্বামীকে পরামর্শ দেই। কিন্তু যারা আমাদের কাছ থেকে নগদ অর্থ ও অলঙ্কার নিয়েছিল তাদের নিরাপত্তা প্রদানের আশ্বাসে তিনি আমার প্রস্তাবে দ্বিমত পোষণ করেন। পরদিন এক ডজন সশস্ত্র বিদ্রোহী আমাদের বাড়িতে প্রবেশ করে। তাদের মধ্যে তিনজন তার আগের দিন আমাদের বাড়িতে এসেছিল। তাদের কারো কারো মাথায় ছিল লাল ক্যাপ। তাদেরকে হিন্দু বলে মনে হলো। আমার স্বামী তাদের কাছে দুঃখ প্রকাশ করলে তারা তার বুকে গুলি করে। গুলিতে তার শরীর রক্তে ভেসে যায়। আমার স্বামীর একজন অবাঙালি বন্ধু ও তার ছেলে তাকে উদ্ধারের চেষ্টা করলে গুলিতে তাদের ঝাঝরা করে দেয়া হয়। বিদ্রোহীরা আমার ১৬ বছরের ছেলের খোঁজ করে। আমি তাকে ছাদে এক গাদা মাদুরের নিচে লুকিয়ে রেখেছিলাম। বিদ্রোহীরা সূর্যাস্তের পর ময়মনসিংহকে নিস্প্রদীপ রাখার নির্দেশ দিয়েছিল। আমার বাড়িতে কোনো আলো ছিল না। বারান্দায় আমার স্বামীর গোঙানির শব্দ শুনে পা টিপে টিপে তার কাছে যাই। তাকে পানি খেতে দেই। তার রক্ত মুছে দেই। তিনি খুব ক্ষীণ স্বরে কথা বলছিলেন। বাঙালি বিদ্রোহীদের হামলার আশঙ্কা করে তিনি আমাকে ভয় না পাওয়ার পরামর্শ দিয়ে বললেন, 'আল্লাহর ওপর ভরসা রেখো। তিনি তোমাদের রক্ষা করবেন।' আমার স্বামী আমাদের ১০ মাস বয়সী ছেলের গালে চুমো দেন। তারপর তিনি আমাদের ৯ বছরের দ্বিতীয় ছেলের সঙ্গে কথা বলেন। হামলার সময় আমার দ্বিতীয় ছেলে খাটের নিচে লুকিয়েছিল। আমার স্বামীর মৃত্যু যন্ত্রণা শুরু হয়। তার ক্ষত স্থান থেকে রক্ত বের হচ্ছিল। তবে তিনি ছিলেন সাহসী। তিনি আমাকে তার বন্ধু ও বন্ধুর ছেলের নাড়ি পরীক্ষা করতে বললেন। তাদের শরীর ছিল ঠাণ্ডা। তারা ছিল মৃত। খুব ভোরে আমার স্বামী শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। আমি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারিনি। জোরে চিৎকার করে উঠি। আমার চিৎকার শুনে বিদ্রোহীরা আমাদের বাড়িতে প্রবেশ করে আমার দিকে তাদের বন্দুক তাক করে। তারা আমাকে তাদের সঙ্গে যাবার নির্দেশ দিয়ে বললো, তারা আমার স্বামীকে কবর দেবে। আমি একটি কম্বল দিয়ে তার মুখ ঢেকে দিয়ে তাদের অনুসরণ করি। সঙ্গে ছিল আমার দুই ছেলে। বড় ছেলে ছিল ছাদে লুকানো।...

'আমাদের চলার পথ এবং আশপাশের রাস্তায় ছিল শত শত লাশ। বহু বাড়িঘর ভস্মীভূত। ভ্রাম্যমাণ বিদ্রোহীরা বাড়িঘরে জীবিতদের খুঁজছিল। তারা জ্বলন্ত সিগারেট দিয়ে কয়েকটি লাশে ছ্যাকা দেয়। যেখানে সামান্য কিছু নড়াচড়া করছিল সেখানে ঝাকে ঝাকে গুলি ছোঁড়া হচ্ছিল। আমাদেরকে শহরের একটি মসজিদে নিয়ে যাওয়া হয়। পথে বিদ্রোহীরা আমাদেরকে বললো, কয়েকদিন পর আমরা তাদের বাসায় কাজ করবো। তাই তারা আমাদের হত্যা করছে না। মসজিদের ভেতরের দৃশ্য ছিল ভয়াবহ। শত শত ক্রন্দনরত মহিলা ও শিশু। কোনো পানি ও খাদ্য নেই। আমি আমার শাড়ির একটি অংশ ছিঁড়ে তাতে আমার দুগ্ধপোষ্য শিশুকে শোয়াই। আমরা মসজিদের এক খাদেমকে আমাদের জন্য একটু পানি এনে দিতে বলি। খাদেম আমার অনুরোধ রক্ষা করেন। দু'দিন আমাদের কোনো খাদ্য ছিল না। তৃতীয় দিন মসজিদের ইমাম আমাদেরকে সামান্য খাবার দেন। তিনি বাঙালি হলেও আমাদের কাছে ছিলেন

www.pathagar.com

ফেরেশতা। রাতদিন তিনি দুশ্চিন্তা করতেন। বলতেন, বিদ্রোহীরা আমার বড় ছেলেকে সম্ভবত খুন করেছে। চতুর্থ দিন আমার দোয়া কবুল হয়। সেদিন আমার বড় ছেলে মসজিদে আমাদের সঙ্গে যোগ দেয়। সে জানায় যে, তার প্রতি একজন বাঙালি প্রতিবেশীর দয়া হয়েছিল। তিনি তাকে মসজিদে পৌঁছে দিয়েছেন। ২১ এপ্রিল পাকিস্তান সেনাবাহিনী ময়মনসিংহ পুনর্দখল করে আমাদেরকে উদ্ধার করে। নিহত অবাঙালিদের পচা গলা লাশ দাফনে অনেক দিন লেগেছিল। আমি আমার স্বামীর লাশের খোঁজে আমাদের বাড়িতে ফিরে যাই। কিন্তু তার লাশের কোনো চিহ্ন ছিল না। মেঝেতে রক্তের ছোপ ছোপ দাগ তার নির্মম হত্যাকাণ্ডের সাক্ষ্য বহন করছিল। পাকিস্তান সেনাবাহিনী আমাদেরকে ঢাকায় একটি ত্রাণ শিবিরে স্থানান্তর করে। আমরা সেখানে শান্তিতে বসবাস করেছি। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর ভারতীয় ও মুক্তিবাহিনী পূর্ব পাকিস্তান দখল করে নিলে আবার আমাদের দুর্ভাগ্য শুরু হয়। নির্যাতন ও দুঃখ দুর্দশায় এত অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছিলাম যে, আমরা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত ছিলাম। অবসন্ন শরীর ছাড়া আমাদের হারানোর আর কিছু ছিল না। ১৯৭৪ সালের মার্চে আমি ও আমার তিন সন্তান ঢাকা থেকে বিমানযোগে করাচিতে প্রত্যাবাসন করি।'

(১৫৩) **একশো তিপান্নতম সাক্ষীর বিবরণ:** ১৯৭১ সালে মার্চের শেষদিকে ময়মনসিংহের শানকিপাড়ায় বিদ্রোহীরা ৫০ বছরের কামরুন্নেছার স্বামী মোহাম্মদ কাসিম ও তার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে হত্যা করে। তিনি অশ্রুভেজা চোখে তার সাক্ষ্যে বলেছেন:

'সময়টি ছিল মার্চের শেষ সপ্তাহ, ১৯৭১ সাল। আমরা গুজব শুনছিলাম ছিলাম যে, আওয়ামী লীগ ও বিদ্রোহী সৈন্যরা ময়মনসিংহের সকল উর্দুভাষী লোককে হত্যার পরিকল্পনা করছে। এ গুজব শুনতে পেয়ে আমরা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ি। কয়েকটি জায়গায় অবাঙালি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। প্রতিদিন বিক্ষোভকারীরা 'জয় বাংলা' ধ্বনি দিতো এবং দেশীয় অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে অবাঙালি এলাকা প্রদক্ষিণ করতো। সন্ধ্যায় কয়েকটি বাঙালি ছেলে আমাদের দরজার কড়া নাড়ে এবং আমার স্বামীর সঙ্গে দেখা করতে চায়। তিনি দরজা খুলে দিলে কয়েকজন সশস্ত্র লোক ঘরে প্রবেশ করে। অস্ত্রের মুখে তারা তাকে এবং আমার উঠতি বয়সের ছেলেকে তাদের সঙ্গে যেতে বলে। আমি আমার স্বামী ও ছেলের প্রতি দয়া দেখাতে এবং তাদের জীবন ভিক্ষা দিতে তাদের অনুরোধ করি। কিন্তু তারা ছিল হৃদয়হীন পাষাণ। আমি আমার স্বামী ও ছেলেকে আর কখনো দেখিনি। দুর্বৃত্তরা তাদের হত্যা করে। আমার কাঁধে একটি বেয়নেট দিয়ে খোঁচা দিয়ে তারা আমাকে দ্বিগুণ গতিতে হাঁটতে বাধ্য করে। আমাকে নিকটবর্তী একটি স্কুল ভবনে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে আরো শত শত মহিলা ও শিশুকে আটক রাখা হয়েছিল। আমরা রাস্তায় ও রাস্তার পাশে তাদের হতভাগ্য স্বামী ও পিতার রক্তমাখা লাশ দেখেছিলাম। আমি একজন বিদ্রোহীকে একটি লাশে জ্বলন্ত সিগারেট ঠেসে ধরতে দেখি। জীবিত মনে করে সে সিগারেট চেপে ধরেছিল। কিন্তু লোকটি ছিল পুরোপুরি মৃত। পরদিন স্কুল ঘরে আশ্রিত মহিলা ও শিশুদের একটি বিশাল মসজিদে নিয়ে যাওয়া হয়। এ মসজিদে আরো শত শত বিধবা ও এতিম শিশু ছিল। এসব বিধবা ও এতিম শিশু তাদের প্রিয়জনদের জন্য বিলাপ করছিল। মসজিদের বাঙালি ইমাম ছিলেন দয়ালু ও সহানুভূতিশীল। তিনি আমাদের জন্য খাদ্য ও পানি সংগ্রহ করেন। ইমাম সাহেব আমাদেরকে হত্যা করা থেকে বিদ্রোহীদের বিরত রাখতে সর্বাত্মক চেষ্টা করেন। ২১ এপ্রিল পাকিস্তান সেনাবাহিনী যথাসময়ে পৌঁছে যাওয়ায় আমরা মৃত্যুর ছোবল থেকে

www.pathagar.com

রক্ষা পাই। সেনাবাহিনী আমাদের উদ্ধার করে ঢাকায় একটি ত্রাণ শিবিরে স্থানান্তর করে। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর ভারতীয় সৈন্য ও মুক্তিবাহিনী ঢাকা দখল করে নেয়ার পর আমাকে আরো শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। ১৯৭৪ সালের জানুয়ারিতে আমি ঢাকা থেকে করাচিতে প্রত্যাবাসন করি।'

(১৫৪) **একশো চুয়ান্নতম সাক্ষীর বিবরণঃ** ১৯৭১ সালের মার্চে-এপ্রিলে ৬০ বছরের গাফুরুন্নিসা ময়মনসিংহে দুর্ভোগে পতিত হন। বিদ্রোহীরা তার স্বামী ও পুত্রকে হত্যা করে। তিনি তার সাক্ষ্যে বলেছেনঃ

'১৯৭১ সালে মার্চের শেষ সপ্তাহে আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসী ও ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের বিদ্রোহী সৈন্যরা আমাদের এলাকায় হত্যাযজ্ঞে মেতে উঠে। প্রাথমিকভাবে আমাদের এলাকার পাঞ্জাবী বাসিন্দারা তাদের হামলার শিকার হয়। আমাদের এলাকার প্রায় ৭০টি পাঞ্জাবী পরিবারের সকল যুবক ও মাঝবয়সী পুরুষকে অস্ত্রের মুখে একটি দূরবর্তী জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়। আমরা জানতে পেরেছিলাম যে, জায়গাটি ছিল অবাঙালিদের হত্যার জন্য বিদ্রোহীদের তৈরি একটি কসাইখানা। এপ্রিলের দ্বিতীয় পক্ষকালে এসব সন্ত্রাসী আমাদের এলাকার অন্যান্য অবাঙালির ওপর হামলা চালায়। অবাঙালিদের বাড়িঘর লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ এবং বাসিন্দাদের হত্যা করা হয়। তারা আমার বাড়িতে ঢুকে আমার স্বামী ও বিবাহিত ছেলেকে টেনে হিঁচড়ে অর্ধ ক্রোশ দূরে একটি খোলা মাঠে নিয়ে যায়।...

'আমি এসব বন্দির মধ্যে আমার ভাই ও তার কিশোর পুত্রকে দেখতে পাই। আটককৃত অবাঙালিদের সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে বাংলাদেশের পতাকাকে স্যালুট করার নির্দেশ দেয়া হয়। বন্দুক তাক করে রাখা সত্ত্বেও তাদের অনেকে বাংলাদেশের পতাকার প্রতি সম্মান জানাতে অস্বীকৃতি জানায়। এসময় বিদ্রোহীদের বন্দুক থেকে এক ঝাক বুলেট ছুটে যায় এবং শত শত নির্দোষ মানুষ ঢলে পড়ে। যাদের শেষনিঃশ্বাস ত্যাগে দেরি হচ্ছিল তাদের হৃদপিণ্ডে ফের গুলি করা হয়। কোনো পুরুষ জীবিত নেই একথা নিশ্চিত হয়ে বিদ্রোহীরা আবার অবাঙালিদের বাড়িঘরে চড়াও হয়। তখন বিধবা মহিলারা তাদের স্বামীদের জন্য বিলাপ করছিল। আমি একজন নেতাকে তার সহযোগীদের বলতে শুনেছি যে, চাকরাণী হিসেবে খাটানোর জন্য অবাঙালি মহিলাদের রেহাই দেয়া হচ্ছে। আমার সঙ্গে ছিল আমার বিধবা পুত্রবধূ ও তার এক বছরের পুত্র। আমাদেরকে একটি স্কুল ভবনে নিয়ে যাওয়া হয়। পরদিন আমাদের ঠাঁই হয় একটি বিশাল মসজিদে। যন্ত্রণা ও দুর্ভোগের মধ্যে আমরা ৬ দিন এ মসজিদে অবস্থান করি। অধিকাংশ সময় আমরা আমাদের স্বামী ও ছেলেদের আখেরাতে মুক্তির জন্য দোয়া করতাম। ২১ এপ্রিল পাকিস্তান সেনাবাহিনী ময়মনসিংহ পুনর্দখল করে আমাদেরকে উদ্ধার করে। আমাদেরকে ঢাকায় একটি ত্রাণ শিবিরে স্থানান্তর করা হয়। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর ভারতীয় সেনাবাহিনী ও মুক্তিবাহিনী পূর্ব পাকিস্তান দখল করে নেয়ার পর আমরা ঢাকার মোহাম্মদপুরে একটি বিহারী ক্যাম্পে ভীতির মধ্যে বসবাস করতাম। ১৯৭৩ সালের ডিসেম্বরে জাতিসংঘ আমাকে, আমার পুত্রবধূ ও তার শিশু ছেলেকে করাচিতে প্রত্যাবাসন করলে আমাদের দুর্দশার অবসান ঘটে।...'

(১৫৫) **একশো পঞ্চান্নতম সাক্ষীর বিবরণঃ** ৩০ বছরের জেবুন্নিসার স্বামী মোহাম্মদ ইব্রাহিম ছিলেন ময়মনসিংহ রেলের একজন কর্মচারী। জেবুন্নিসা তার অকাল বৈধব্য বরণের ট্রাজেডি

www.pathagar.com

বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন:

'আমরা দীর্ঘদিন আমাদের বাঙালি প্রতিবেশীদের সঙ্গে শান্তিতে বসবাস করতাম। আমার স্বামী ছিলেন শান্ত প্রকৃতির ও কঠোর পরিশ্রমী। রাজনীতিতে তার কোনো আগ্রহ ছিল না। ১৯৭১ সালে মার্চের শেষ সপ্তাহে বেশ কয়েকজন অপরিচিত সশস্ত্র যুবক আমাদের দরজা ভেঙ্গে আমার স্বামীকে কাবু করে ফেলে। আমার স্বামী ও তিন শিশু সন্তানকে রেহাই দেয়ার জন্য আমি তাদের কাছে কাকুতি মিনতি করি। তারা আমাকে থাপ্পর দিয়ে এবং আমার ক্রন্দনরত শিশুদের লাথি মেরে আমার স্বামীকে ধরে বাড়ির বাইরে নিয়ে যায়। আরেক দল ক্রুদ্ধ জনতা তাকে গণপিটুনি দিয়ে টেনে হিঁচড়ে বধ্যভূমিতে নিয়ে যায়। বিদ্রোহী জনতা আমার বাড়ি লুট করে এবং অস্ত্রের মুখে আমাকে ও আমার শিশু সন্তানদের একটি ছোট ভবনে নিয়ে যায়। আমি জানতে পেরেছিলাম যে, ভবনটি ছিল একটি পুরনো কারাগার। আমরা এ নরকে তিন সপ্তাহের বেশি অবস্থান করি। দুর্ভোগ এত তীব্র ও অসহ্য হয়ে দাঁড়ায় যে, আমি আল্লাহর কাছে মৃত্যু কামনা করতাম। ২১ এপ্রিল পাকিস্তান সেনাবাহিনী আমাদেরকে এ নরক থেকে উদ্ধার করে। তিনদিন আমি আমার স্বামীর খোঁজে গোটা ময়মনসিংহ ঘুরেছি। কিন্তু তার কোনো সন্ধান পাইনি। আমাদের সৈন্যরা আমাকে সান্ত্বনা দেয়। ১৯৭১ সালের মাঝামাঝি আমাকে ও আমার এতিম শিশুদের ঢাকায় স্থানান্তর করা হয়। ১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে জাতিসংঘ আমাদেরকে নিরাপদে করাচিতে প্রত্যাবাসন করলে আমাদের দুঃস্বপ্ন শেষ হয়।'

(১৫৬) **একশো ছাপান্নতম সাক্ষীর বিবরণ:** ২৪ বছরের শাহজাদী বেগমের স্বামী আখতার হোসেন ময়মনসিংহে একজন পোস্টম্যান হিসেবে চাকরি করতেন। ১৯৭১ সালে এপ্রিলের প্রথমার্ধে ময়মনসিংহ শাহজাদী বেগমের স্বামী আখতার হোসেন, শ্বশুর ও দেবরকে হত্যা করা হয়। তিনি তার সাক্ষ্যে বলেছেন:

'ময়মনসিংহ শহরের উপকণ্ঠে আমাদের একটি ছোট্ট বাড়ি ছিল। ১৯৭১ সালে মার্চের মাঝামাঝি থেকে আমরা চরম আতঙ্কের মধ্যে বসবাস করছিলাম। আমরা আতঙ্কজনক খবর পাচ্ছিলাম যে, আওয়ামী লীগের জঙ্গিরা সকল পাঞ্জাবীকে হত্যার পরিকল্পনা করছে। ২৩ মার্চ আমার স্বামী আতঙ্কিত হয়ে বাড়িতে ফিরে এসে জানান যে, আওয়ামী লীগের জঙ্গি, বিদ্রোহী সৈন্য ও পুলিশ তার প্রচুর পাঞ্জাবী বন্ধুকে হত্যা করেছে। এপ্রিলের দ্বিতীয় সপ্তাহে একটি সশস্ত্র বাঙালি জনতা আমাদের বাড়িতে ঢুকে আমার স্বামী, শ্বশুর ও আমার কিশোর দেবরকে টেনে বের করে নিয়ে যায়। বন্দুকের মুখে তারা মহিলাদেরকে ঘরে থাকার নির্দেশ দেয়। আমার স্বামী, শ্বশুর ও দেবরসহ অবাঙালি পুরুষদের একটি খোলা মাঠে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তাদেরকে গুলি করে হত্যা করা হয়।...

'বিদ্রোহীরা আমাকে ও আমার দুই শিশু মেয়েকে তাদের সঙ্গে যেতে বাধ্য করে। আমরা একটি সবুজ মাঠ অতিক্রম করার সময় একটি ভয়াবহ দৃশ্য দেখি। মাঠে শত শত লাশ। ফায়ারিং স্কোয়াডে তাদের হত্যা করা হয়েছিল। মনে হলো কাউকে কাউকে চাকু অথবা ছোরা মেরে হত্যা করা হয়েছে। আমাদের আটককারী একজন বাঙালি বিদ্রোহী একটি শরীর নড়াচড়া করে উঠতে দেখে তৎক্ষণাৎ গুলি করে। আমি আতঙ্কে চোখ বন্ধ করি। আমার দুই মেয়ে ভয়ে কাঁপতে শুরু করে। আমাদের আটককারীদের ক্রুদ্ধ দৃষ্টি এবং চকচকে বেয়নেটের মুখে প্রখর রোদে এগিয়ে যাওয়া ছাড়া আমাদের উপায় ছিল না।

www.pathagar.com

একটি রাস্তা ধরে এগিয়ে যাবার সময় আমরা পুরো রাস্তায় অসংখ্য রক্তাক্ত লাশ দেখতে পাই। কাউকে কাউকে ট্রাকে নিক্ষেপ করা হচ্ছিল। পরবর্তীতে আমি জানতে পারি যে, বহু অবাঙালির মৃতদেহ নিকটবর্তী ব্রহ্মপুত্রে ফেলে দেয়া হয়। পথে আমরা শত শত ভস্মীভূত ঘরবাড়ি ও বস্তিঘর দেখতে পাই।...

'আমরা একটি স্কুল ভবনে এক ঘন্টা অবস্থান করি। স্কুল ভবনের একটি অংশকে দৃশ্যত অবাঙালি হত্যাকাণ্ডের জন্য কসাইখানা হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছিল। সেখানে ছিল মৃতদেহের স্তূপ। আমাদেরকে আরেকটি স্কুল ভবনে নিয়ে যাওয়া হয়। এ স্কুলে শত শত শোকাহত মহিলা ও শিশুকে গাদাগাদি করে রাখা হয়েছিল। আমি একজন মহিলার হাতে একটি পবিত্র কোরআন দেখি। কোরআনের দোহাই দিয়ে মহিলা তার শিশু বাচ্চাদের খোঁজে তাকে বাড়িতে যাবার অনুমতি দিতে আটককারীদের কাছে অনুরোধ করছিলেন। একজন তরুণ আটককারী তার হাত থেকে কোরআন কেড়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তার মুখে আঘাত করে।...

'আমরা এ কারাগারে এক সপ্তাহ নির্যাতিত হই। বহু শিশু পিপাসা ও ক্ষুধায় মারা যায়। ২১ এপ্রিল পাকিস্তান সেনাবাহিনী আমাদেরকে উদ্ধার করে। অধিকাংশ মহিলা ও শিশুকে ঢাকায় স্থানান্তর করা হয়। আমি ময়মনসিংহে ফিরে যাই। ৮ মাস আমরা শান্তিতে বসবাস করছিলাম। ১৯৭১ সালে ডিসেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে ভারতীয় সেনাবাহিনী ও মুক্তিবাহিনী ময়মনসিংহ দখল করে নিলে আবার আমাদের আতঙ্কিত জীবন শুরু হয়। ১৯৭২ সালের গোড়ার দিকে ময়মনসিংহে বিহারীদের জন্য নির্মিত রেডক্রসের একটি শিবিরে স্থানান্তরিত হলে আমাদের জীবনে কিছুটা স্বস্তি ফিরে আসে। ১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে আমি ও আমার দুই সন্তান করাচিতে প্রত্যাবাসন করি। আমি বিশ্বাস করি যে, ১৯৭১ সালের মার্চ-এপ্রিলে ময়মনসিংহে যারা অবাঙালিদের হত্যা করেছিল তাদের অধিকাংশ ছিল ভারতীয় অনুপ্রবেশকারী বাঙালি হিন্দু।'

(১৫৭) **একশো সাতান্নতম সাক্ষীর বিবরণঃ** ৪৫ বছরের আমিনা খাতুনের স্বামী জয়নুল আবেদীন ছিলেন একজন মিস্ত্রি। ১৯৭১ সালে এপ্রিলের মাঝামাঝি ময়মনসিংহের শান-কিপাড়ায় বিদ্রোহীরা জয়নুল আবেদীনকে হত্যা করে। আমিনা খাতুন তার স্বামীর হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে বলেছেনঃ

'১৫ এপ্রিল একটি সশস্ত্র গ্রুপ আমাদের বাড়িতে প্রবেশ করে। তারা আমার বাড়ি লুট করে এবং আমাকে ও আমার স্বামীকে নিকটবর্তী একটি মাঠে নিয়ে যায়। মহিলাদের কাছ থেকে একটু দূরে পুরুষদের লাইনে দাঁড় করানো হয়। বন্দিদের সবাই ছিল অবাঙালি। হঠাৎ করে কঠোর দর্শন এক যুবক গুলি করার নির্দেশ দেয়। তার নির্দেশ দানের সঙ্গে সঙ্গে শতাধিক অবাঙালির বুক বিদীর্ণ হয়ে যায়। আমার হৃদয়ে এখনো সে স্মৃতি গেঁথে রয়েছে। আমি আমার স্বামীকে মাটিতে পড়ে যেতে দেখি। তার বুক থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত বের হচ্ছিল। মৃত্যু যন্ত্রণায় তিনি কাতরাচ্ছিলেন। আমি তার পাশে ছুটে যাবার চেষ্টা করি। এসময় একজন বন্দুকধারী বন্দুক দিয়ে আমার মাথায় আঘাত করে। আমি হোঁচট খেয়ে পড়ে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে যাই। জ্ঞান ফিরে এলে শুরু হয় আমার ওপর অকথ্য নির্যাতন। আমাকে বেয়নেট দিয়ে খোঁচা মারা হতো। লাথি দেয়া হতো। সেই সঙ্গে চলতো অশ্লীল গালিগালাজ। আমাকে একটি মসজিদে নিয়ে যাওয়া

www.pathagar.com

হয়। সেখানে ছিল আরো শত শত বিধবা মহিলা ও শিশু। মসজিদের বন্দি জীবন ছিল নরকতুল্য। আমরা ৬ দিন বন্দি ছিলাম। ৬ দিনের মধ্যে আমরা চারদিন কেবল পানি খেয়ে বেঁচে থাকি। আমাদের কোনো খাবার ছিল না। ক্ষুধায় বহু শিশুর মৃত্যু হয়। আমাদের প্রতি মসজিদের কয়েকজন খাদেমের দয়া হয়। তারা আমাদের জন্য ভাত সংগ্রহ করে। ক্ষুধার্থ শিশুরা এসব ভাত খায়। আমাদেরকে জানানো হয় যে, বিদ্রোহীরা আমাদেরকে হত্যা করবে। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা ছিল অন্যরকম। ২১ এপ্রিল দুপুরের প্রাক্কালে পাকিস্তান সেনাবাহিনী আমাদের উদ্ধার করে। তার আগে মসজিদ থেকে বিদ্রোহীরা পালিয়ে যায়। সকল দুঃস্থ মহিলা ও শিশুকে ঢাকায় একটি ত্রাণ শিবিরে স্থানান্তর করা হয়। ১৯৭৪ সালের জানুয়ারিতে আমি করাচিতে প্রত্যাবাসন করি।'

(১৫৮) **একশো আটান্নতম সাক্ষীর বিবরণ:** ৩২ বছরের সায়রার স্বামী আবদুল হামিদ খান ময়মনসিংহে পুলিশ বাহিনীতে ড্রাইভার হিসেবে চাকরি করতেন। ১৯৭১ সালে এপ্রিলের দ্বিতীয় সপ্তাহে বিদ্রোহীরা তাকে হত্যা করে। সায়রা তার স্বামীকে হত্যা করার দৃশ্য দেখেছেন। তিনি এ ঘটনার সাক্ষ্য দিতে গিয়ে বলেছেন:

'আমার স্বামী অবাঙালি ও পাঠান হওয়ায় ১৯৭১ সালে মার্চের মাঝামাঝি থেকে বাঙালি বিদ্রোহী সৈন্য ও পুলিশ তাকে হত্যা করার জন্য হন্যে হয়ে খুঁজছিল। এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে তাদের একটি গ্রুপ আমাদের বাড়িতে ঢুকে আমার স্বামীকে ঘায়েল করে ফেলে এবং তাকে টেনে হিঁচড়ে নিকটবর্তী একটি ধানক্ষেতে নিয়ে যায়। আমার সন্তানরা কান্নাকাটি করছিল। আমি আমার তিন সন্তানের কান্নাকাটি উপেক্ষা করে বিদ্রোহীদের পিছু নিয়ে ধানক্ষেতে গিয়ে হাজির হই। আল্লাহর নামে আমি আমার স্বামীর জীবন ভিক্ষা দেয়ার জন্য তাদেরকে অনুরোধ করি। কিন্তু তারা আমার স্বামীকে হত্যা করতে ছিল বদ্ধপরিকর। তাদের একজন একটি লম্বা ছোরা দিয়ে আমার স্বামীর গলা কেটে ফেলে। আমি শিহরিত ও বাকরুদ্ধ হয়ে যাই। আমি আমার স্বামীর দিকে ছুটে গেলে ঘাতকরা আমাকে ঝাপটে ধরে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে। আমার স্বামীর মৃত্যু ত্বরান্বিত করার জন্য ঘাতকরা তার পেট ও বুকে ছুরিকাঘাত করে। এ সময় আমি তার গোঙানি শুনতে পাই। ঠিক তখন চারজন বন্দুকধারী ঘটনাস্থলে এসে উপস্থিত হয় এবং আমাকে টানা হ্যাঁচড়া করে আমার বাড়িতে নিয়ে যায়। আমার বাড়ি ছিল লুণ্ঠিত। আমার ভীতসন্ত্রস্ত শিশুরা ছিল ঘরের দরজায় দাঁড়ানো। বন্দুক উঁচিয়ে সন্ত্রাসীরা আমাকে একটি বিশাল মসজিদে নিয়ে যায়। সেখানে যাবার পথে রাস্তায় আমি শত শত লাশ দেখি। বহু ঘরবাড়ি ছিল ভস্মীভূত। মসজিদের অভ্যন্তরে জীবন ছিল মৃত্যু সমতুল্য। শোকে স্তম্ভিত সহস্রাধিক মহিলা ও শিশু ছিল সেখানে আশ্রিত। কিশোরীদের অধিকাংশকে তুলে নিয়ে যাওয়ায় আমি কদাচিৎ তাদের দু'একজনকে দেখতে পাই। মসজিদের খাদেম নিকটবর্তী পুকুর থেকে আমাদের জন্য কিছু পানি নিয়ে আসেন। এ পানি আমাদের জীবন রক্ষায় সহায়ক হয়। ১৯৭১ সালের ২১ এপ্রিল পাকিস্তান সেনাবাহিনী আমাদেরকে এ প্রেতপুরী থেকে উদ্ধার করে। সেনাবাহিনী আমাকে ও আমার এতিম শিশুদের ঢাকায় স্থানান্তর করে। ঢাকায় আমরা একটি ত্রাণ শিবিরে বসবাস করতাম। ১৯৭৩ সালের নভেম্বরে আমরা বিমানে করাচি এসে পৌঁছি।'

(১৫৯) **একশো উনষাটতম সাক্ষীর বিবরণ:** ২৭ বছরের নাসিমা ছিলেন বাঙালি। তবে তার স্বামী আবদুল জলিল ছিলেন বিহারী। ময়মনসিংহে আবদুল জলিলের একটি খুচরা দোকান

www.pathagar.com

ছিল। ১৯৭১ সালের মার্চে বিদ্রোহীরা আবদুল জলিলকে হত্যা করে। নাসিমা তার স্বামী হত্যাকাণ্ডের বিবরণ দিতে গিয়ে বলেছেন:

> 'বিহারীর সঙ্গে বিয়ে হওয়ায় বাঙালিদের কেউ কেউ আমাকে এবং আমার পরিবারকে ঘৃণা করতো। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ একদল দাঙ্গাবাজ দুষ্কৃতকারী ধ্বংসযজ্ঞে মেতে উঠে। তারা আমাদের দোকান লুট করে সেখানে আমার স্বামীকে কুপিয়ে হত্যা করে। তার হত্যাকাণ্ডের দুঃসংবাদ পৌঁছলে আমি তার লাশ উদ্ধারে আমাদের দোকানে ছুটে যাই। তার লাশের কোনো চিহ্ন নেই। তবে তাজা রক্তের দাগ ছিল দৃশ্যমান । আমাকে জানানো হয় যে, হত্যাকারীরা তার লাশ ট্রাকে তুলে অদূরে নদীর দিকে গেছে। ১৯৭১ সালে এপ্রিলের গোড়ার দিকে বিদ্রোহী সৈন্যরা আমাকে তাড়িয়ে দিলে আমি আমার বাঙালি পিতামাতার সঙ্গে বসবাস করতে যাই। আমার পিতামাতা ছিলেন খুবই ধার্মিক। তারা কঠোর ভাষায় অবাঙালি হত্যাকাণ্ডের নিন্দা করেন। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর ভারতীয় সেনাবাহিনী ও মুক্তিবাহিনী পূর্ব পাকিস্তান দখল করে নিলে বিহারী ও পাকিস্তানের প্রতি অনুগত বাঙালি হত্যাকাণ্ড শুরু হয়। ১৮ ডিসেম্বর মুক্তিবাহিনী আমাদের বাড়ি আক্রমণ করে আমার পিতা ও দু'ভাইকে হত্যা করে। আমাদের বাড়িতে হামলার সময় আমি এবং আমার ৫ বছরের তৃতীয় ভাই এক প্রতিবেশীর বাড়িতে অবস্থান করছিলাম। এ প্রতিবেশী আমাদেরকে পাশের একটি গ্রামে পালিয়ে যেতে সহায়তা করেন। সেই গ্রামে আমরা বসবাস করি এবং দু'বছরের বেশি ধানক্ষেতে কাজ করি। জাতিসংঘ অবাঙালিদের প্রত্যাবাসন শুরু করলে আমি পাকিস্তানে আসার জন্য মরিয়া চেষ্টা চালাতে থাকি। বাংলাদেশে আমার কোনো স্থান ছিল না। সেখানে আমার প্রতিটি মুহূর্ত ছিল এক একটি যন্ত্রণা। ১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে আমি বিমান যোগে করাচিতে এসে পৌঁছাই।'

প্রত্যক্ষদর্শীদের সাক্ষ্য থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ময়মনসিংহে অবাঙালি হত্যাকারী আওয়ামী লীগ ও বিদ্রোহী সৈন্যরা ১৯৭১ সালে এপ্রিলের তৃতীয় সপ্তাহে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অগ্রযাত্রার মুখে ভারতে পালিয়ে যায়। ময়মনসিংহে প্রবেশ করার পর পাকিস্তানি সৈন্যরা নিহত অবাঙালিদের গণকবরের ব্যবস্থা করে। ১৯৭১ সালের ৮ মে নিউইয়র্ক টাইমসে প্রকাশিত ময়মনসিংহ থেকে ম্যালকম ব্রাউন প্রেরিত এক সংবাদে বলা হয়:

> 'একটু পরে পরে রাস্তা বরাবর ভস্মীভূত সারি সারি ঘরবাড়ি। লাশগুলো অগভীর গর্তে মাটি চাপা দেয়া হয়েছে এবং কবরের ওপর লাল ইটের স্তূপ। এমনকি বাড়িঘরের বারান্দায় ইটের নিচে লাশ দেখা গেছে। বাড়িগুলো পরিত্যক্ত ও বন্ধ।'

মাটি চাপা দেয়া লাশগুলো ছিল বিদ্রোহীদের হাতে নিহত অবাঙালিদের। কিন্তু ভারত ও আওয়ামী লীগ অপপ্রচার করতো যে, এসব গণকবর পাকিস্তান সেনাবাহিনীর হাতে নিহত বাঙালিদের। ময়মনসিংহের প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, কিশোরগঞ্জ, নরসিংদী, ভৈরব বাজার, বেগুনবাড়ি ও সরিষাবাড়িতে বহু অবাঙালি পরিবারকে ভয়াবহ দুর্ভোগ ও যন্ত্রণা বরণ করতে হয়েছে। ১৯৭১ সালের মার্চে নরসিংদীতে শত শত বিহারী তাঁত কল শ্রমিককে হত্যা করা হয়। ভৈরব বাজারে বহু অবাঙালি পাট ব্যবসায়ে নিয়োজিত ছিল। মুক্তিপণ আদায়ে কোনো কোনো ব্যবসায়ীকে আটক করা হয়। এসব ব্যবসায়ীর বাড়িঘর লুট করা

www.pathagar.com

হয়। আওয়ামী লীগের জঙ্গিরা বহু অবাঙালিকে ঢাকায় পালিয়ে যেতে বাধা দেয় এবং পুরুষ অবাঙালিদের হত্যা করে। ১৯৭১ সালে মার্চের শেষ সপ্তাহে সরিষাবাড়িতে এক ডজন অবাঙালি পরিবারকে হত্যা করা হয়।

www.pathagar.com

আটাইশতম অধ্যায়

রাজশাহী ও নাটোরে যত্যাযজ্ঞ

১৯৭১ সালে মার্চের শেষ সপ্তাহে রাজশাহীতে অবাঙালিদের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগের জঙ্গি ও ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলসের বিদ্রোহীরা রক্তক্ষয়ী উন্মত্ততায় মেতে উঠে। সাড়ে তিন মাইল প্রশস্ত পদ্মার ওপারে ভারতীয় সীমান্ত। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে বিদ্রোহকালে বাঙালি বিদ্রোহীরা এ শহর নিয়ন্ত্রণ করতো। এসব বিদ্রোহীর কাছে ভারত থেকে সামরিক সরবরাহ আসতো। সশস্ত্র ভারতীয় অনুপ্রবেশকারীরা নাশকতা এবং বাঙালি বিদ্রোহীদের সহায়তা করার জন্য রাজশাহী ও তার আশপাশের শহরগুলোতে অনুপ্রবেশ করে। এসব অনুপ্রবেশকারী হাজার হাজার অবাঙালি নারী, পুরুষ ও শিশুকে হত্যা করে। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অগ্রযাত্রা প্রতিরোধে বাঙালি বিদ্রোহীরা ভারত থেকে সরবরাহকৃত বাজুকা ও রকেট লাঞ্চার ব্যবহার করে। পাকিস্তানি সৈন্যরা শহরের কাছাকাছি হতে থাকলে ভারতীয় কামান থেকে রাজশাহীর উপকণ্ঠে গোলাবর্ষণ করা হয়। বাঙালি বিদ্রোহীরা বিশৃঙ্খল অবস্থায় পদ্মার ওপারে ভারতীয় সীমান্তে নিরাপদ ঘাঁটিতে পালিয়ে যায়। ১৯৭১ সালের ১৫ এপ্রিল পাকিস্তান সেনাবাহিনী রাজশাহীতে তাদের নিয়ন্ত্রণ পুনরুদ্ধার করে। পাকিস্তানি সৈন্যদের নিয়ন্ত্রণ পুনঃপ্রতিষ্ঠার ৩ সপ্তাহ পর ৬ জন বিদেশি সাংবাদিকের একটি গ্রুপ রাজশাহী সফর করেন।

১৯৭১ সালের ৯ মে বার্তা সংস্থা রয়টার্সের প্রতিনিধি মরিস কুইন্টান্স রাজশাহী থেকে প্রেরিত তার এক রিপোর্টে বলেন:

> 'একজন প্রত্যক্ষদর্শী জানিয়েছেন, ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলসের সপক্ষত্যাগী সৈন্যরা এ সেক্টরের প্রতিরক্ষার দায়িত্বে ছিল। তার ভাষায় ভারতীয় সামরিক বাহিনী তাদের শক্তিবৃদ্ধি করে। আরেকজন প্রত্যক্ষদর্শী দাবি করেছেন, বাংলাদেশের ভিন্নমতাবলম্বীরা বাজারে অবাঙালি মালিকানাধীন গুদামগুলোতে লুটপাট চালায় এবং অগ্নিসংযোগ করে। নিকটবর্তী গ্রামবাসীরা সাংবাদিকদের একটি কুয়া দেখিয়েছে। এ কুয়ায় এখন লাশ পচতে দেখা গেছে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, সেনাবাহিনী এ এলাকার নিয়ন্ত্রণ লাভের আগে গণহত্যায় নিহতদের লাশ এ কুয়ায় নিক্ষেপ করা হয়। তারা আরো দাবি করেছেন, বাঙালি বিচ্ছিন্নতাবাদীরা অবাঙালি গ্রামগুলোতে ৭শ' লোককে হত্যা করেছে।...'

১৯৭১ সালের ৯ মে নিউইয়র্ক টাইমসের প্রতিনিধি ম্যালকম ব্রাউন রাজশাহী থেকে প্রেরিত তার রিপোর্টে বলেন:

> 'শত শত প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্যের ভিত্তিতে এ ধারণা পাওয়া যাচ্ছে যে, আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসছে এমন একটি সম্ভাবনা দেখা দেয়ায় কোনো কোনো জায়গায় বাঙালিরা বিহারীদের বাড়িঘর লুট, অগ্নিসংযোগ এবং বাসিন্দাদের হত্যা করেছে।...'

www.pathagar.com

২৪ বছরের মোহাম্মদ আমিন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের জিন্নাহ হলের কাছাকাছি বসবাস করতেন। তিনি জানান, ১৯৭১ সালের ২ মার্চ আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ৩ হাজারের বেশি বিচ্ছিন্নতাবাদী জেলা প্রশাসক ও জেলা জজের অফিস ভাঙচুর, পাকিস্তানি পতাকায় অগ্নিসংযোগ এবং অফিসের নথিপত্র ধ্বংস করে। জনতা 'জয় বাংলা' ধ্বনি দিয়ে অবাঙালিদের হুমকি দেয় এবং অবাঙালি মালিকানাধীন কয়েকটি দোকান লুট করে। বিদ্রোহীরা অবাঙালিদের হত্যা, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগে লিপ্ত হলে রাতে মোহাম্মদ আলম আকাশে আগুনের লেলিহান শিখা দেখেছিলেন। ৩ মার্চ আওয়ামী লীগ সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দিলে দুর্বৃত্তরা কারফিউ অমান্য করে এবং ইচ্ছামতো শহরে ঘুরে বেড়ায়। সরকারি কর্মচারীদের তাদের অফিসে যেতে বাধা দেয়া হয়। ব্যবসায়ীদের দোকানপাট বন্ধ করতে বাধ্য করা হয়। দায়িত্ব সচেতন বাঙালি জেলা জজ তার অফিসে পৌঁছতে সক্ষম হন। একদল দুর্বৃত্ত তাকে হত্যার হুমকি দেয় এবং আসবাবপত্রে পেট্রোল ঢেলে তার অফিসে আগুন ধরিয়ে দেয়। আরেকদল রক্তপিপাসু জনতা বাঙালি জেলা প্রশাসক রশীদুল হাসানকে তার অফিসে যেতে বাধা দেয়। ২৬ মার্চ রাজশাহীর পুলিশ বাহিনী বিদ্রোহ করে এবং শহরের সকল অবাঙালিকে হত্যার হুমকি দেয়। বিদ্রোহীদের গুলিতে একজন পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্য আহত হলে ২৯ মার্চ রাজশাহীতে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর একটি ক্ষুদ্র ইউনিট পুলিশ লাইনের শক্তঘাঁটিতে বিদ্রোহী পুলিশের ওপর আক্রমণ চালায়। মাত্র এক ঘণ্টার লড়াইয়ে বিদ্রোহী পুলিশ পরাজিত হয়ে বিশৃঙ্খল অবস্থায় প্রতিবেশী ভারতে পালিয়ে যায়। পুলিশের শক্তঘাঁটিতে ভারত থেকে সরবরাহকৃত বাজুকা ও মেশিনগান উদ্ধার করা হয়। বিদ্রোহী পুলিশের আত্মসমর্পণকারী কয়েকজন সদস্য জানিয়েছে, বিদ্রোহীদের সহায়তা করার জন্য ভারতীয় সৈন্যরা সীমান্ত অতিক্রম করেছিল।

আমিন আরো জানিয়েছেন, ৩১ মার্চ ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলসের একদল বিদ্রোহী বাঙালি সৈন্য রাজশাহী থেকে ৩০ মাইল দূরে নবাবগঞ্জের জেলা প্রশাসককে অপহরণ করে স্থানীয় কারাগারে আটক রাখে। ১৫ এপ্রিল ২০ জন সশস্ত্র লোকের একটি গ্রুপ এ কারাগারে আটক মহিলা ও শিশুসহ প্রায় ১৭৫ জন অবাঙালিকে হত্যা করে। তাদের লাশ নদীর পাশে একটি বধ্যভূমিতে ফেলে দেয়া হয়। পাকিস্তান সেনাবাহিনী নবাবগঞ্জ পুনরুদ্ধার করলে পশ্চাদপসরণকারী বিদ্রোহীরা রাজশাহীর বাঙালি জেলা প্রশাসককে অপহরণ করে ভারতের মালদহে তাদের ঘাঁটিতে নিয়ে যায় এবং তাকে কারাগারে নিক্ষেপ করে। মালদহে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনী পশ্চাদপসরণকারী বিদ্রোহীদের অভ্যর্থনা জানায়। ৬ মে জেলা প্রশাসক পালানোর একটি দুঃসাহসী উদ্যোগ নেন এবং পদ্মা সাঁতরে পূর্ব পাকিস্তানে পৌঁছান। সশস্ত্র বিদ্রোহীরা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অবাঙালি শিক্ষকদের ভীতি প্রদর্শন এবং তাদের বাড়ি ভাঙচুর করে। কিন্তু বাঙালি সহকর্মীরা বিদ্রোহের পুরো সময়ে ক্যাম্পাসে তাদের আগলে রাখেন। বাংলায় অনর্গল কথা বলতে পারায় আমিন বাঙালি সেজে বিদ্রোহীদের ফাঁকি দিতে সক্ষম হন।

(১৬০) **একশো ষাটতম সাক্ষীর বিবরণ:** ৩৫ বছরের আফসার আলী রেডিও পাকিস্তান রাজশাহী শাখায় চাকরি করতেন। তিনি রাজশাহীর সাহেব বাজার এলাকায় বাস করতেন। তাকে একজন বাঙালি বন্ধু আশ্রয় দিয়েছিল। আফসার আলী জানান, ১৯৭১ সালে এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে বিদ্রোহীরা রেডিও পাকিস্তান রাজশাহী সম্প্রচার কেন্দ্রে গোলাবর্ষণ করলে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়। তিনি তার সাক্ষ্যে বলেছেন:

www.pathagar.com

'আমি আমার ভাইয়ের কাছ থেকে জানতে পারি যে, ৭ এপ্রিল ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলসের বিদ্রোহী সশস্ত্র সৈন্যরা রেডিও পাকিস্তানের বাঙালি আঞ্চলিক পরিচালকে ধরে ফেলে এবং 'জয় বাংলা রেডিও' নামে সম্প্রচার শুরু করতে তাকে নির্দেশ দেয়। আঞ্চলিক পরিচালক জানান, গোলাবর্ষণে সম্প্রচার যন্ত্রপাতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তাই একটি নয়া ক্রিস্টাল প্রয়োজন। পরদিন কলকাতা থেকে অল ইন্ডিয়া রেডিও'র একজন প্রকৌশলী ক্রিস্টাল সঙ্গে নিয়ে আসেন। কিন্তু ক্রিস্টাল সংযোজন করা সম্ভব না হওয়ায় সম্প্রচার করা যায়নি। ভারতীয় প্রকৌশলী ট্রান্সমিটারের যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করে ফিরে যান এবং কলকাতা থেকে এক সেট ক্রিস্টাল পাঠানোর প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু প্রতিশ্রুত ক্রিস্টাল এসে পৌঁছেনি। ১৯৭১ সালের ১৪ এপ্রিল পাকিস্তান সেনাবাহিনী রাজশাহীর ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে।'

আফসার আলী দাবি করেছেন, ১৯৭১ সালের এপ্রিলে রাজশাহীতে বিদ্রোহীদের নিয়ন্ত্রণকালে তিনি শহরে প্রচুর ভারতীয় সৈন্য দেখেছেন। তারা হিন্দিতে কথা বলতো এবং স্টেনগান বহন করতো। তাদের দু'জন ফায়ারিং স্কোয়াডকে নির্দেশনা দিতো। এ ফায়ারিং স্কোয়াডে পুলিশের স্থানীয় সুপারিনটেনডেন্টসহ শত শত অবাঙালি ও কয়েকজন পাকিস্তানপন্থী বাঙালির মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলসের বিদ্রোহীদের সঙ্গে কর্মরত ভারতীয় সৈন্যরা পদ্মার ওপার থেকে এ এলাকায় পাকিস্তানি সৈন্যদের অবস্থানে গোলাবর্ষণে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনীকে দিকনির্দেশনা দিতো। আফসার আলী আরো জানান, আওয়ামী লীগের সশস্ত্র জঙ্গিরা অবাঙালিদের সকল দোকানপাট ও বাড়িঘর লুট করে। নদীর তীরবর্তী বধ্যভূমিতে শত শত অবাঙালি পুরুষকে হত্যা করে। আওয়ামী লীগ ক্যাডাররা প্রতিটি আত্মগোপনকারী অবাঙালির অবস্থান শনাক্তকারী যে কোনো অনুচরকে ২০ রুপি করে প্রদান করতো। বহু পাকিস্তানপন্থী বাঙালি অবাঙালিদের আশ্রয় দিয়েছিল। বিদ্রোহীরা এসব পাকিস্তানপন্থী বাঙালির ওপর নির্যাচন চালায় এবং মারধর করে। বাঙালি জেলা প্রশাসকের স্ত্রী এক ডজন অবাঙালি পরিবারকে আশ্রয় দেয়ায় তাকে হত্যা করার হুমকি দেয়া হয়। তার কাছে আশ্রয়গ্রহণকারী অবাঙালি পরিবারের পুরুষ সদস্যদের হত্যা করা হয়েছিল। আফসার আলী জানান, নাটোরে বাঙালি মহকুমা প্রশাসক বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগদান করেন এবং তিনি ছিলেন অবাঙালি হত্যাকাণ্ডের অন্যতম সংগঠক। বাঙালি মহকুমা প্রশাসক সকল অবাঙালিকে হত্যার নির্দেশ দিয়েছিলেন। স্থানীয় হিন্দু গোমাসা চৌধুরী ছিলেন নাটোরে অবাঙালি হত্যাকাণ্ডের আরেকজন সংগঠক। তিনি অবাঙালি মুসলমান বিশেষ করে বিহারীদের ঘৃণা করতেন। গোমাসা চৌধুরী ও তার লোকেরা নাটোর কারাগার ও আলাপুর জামিয়া মসজিদে অসংখ্য বিহারীকে হত্যা করেছিলেন। নাটোরে পাকিস্তান সেনাবাহিনী প্রায় ৫শ' জীবিত অবাঙালিকে উদ্ধার করে। বিদ্রোহীরা তাদের হত্যা করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল। তাদের অধিকাংশই ছিল মহিলা ও শিশু। সারদা ও নবাবগঞ্জের মতো রাজশাহী জেলার অন্যান্য শহরেও আওয়ামী লীগ ও তাদের সহযোগীরা চরম বর্বরতার সঙ্গে অবাঙালিদের বিরুদ্ধে গণহত্যা পরিচালনা করে। ১৯৭১ সালের মার্চ-এপ্রিলে রাজশাহী জেলায় অবাঙালিদের মৃত্যুর সংখ্যা ছিল ৫ থেকে ১০ হাজার। বাঙালি বিদ্রোহীরা শত শত লাশ পদ্মা নদী, পরিত্যক্ত কূপ ও পুকুরে নিক্ষেপ করে।

(১৬১) **একশো একষট্টিতম সাক্ষীর বিবরণঃ** ৩০ বছরের আবদুল বারী নাটোরে একটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে চাকরি করতেন। ১৯৭১ সালে মার্চের শেষদিকে অবাঙালি হত্যাযজ্ঞে

www.pathagar.com

তিনি তার পরিবারের ৬ জন সদস্যকে হারান। তাদের মধ্যে ছিল তার বৃদ্ধ পিতা ও যুবতী স্ত্রী। তিনি তার দুর্ভাগ্যের সাক্ষ্য দিতে গিয়ে বলেছেন:

> '১৯৫০ সালে আমার পিতা তার গোটা পরিবার নিয়ে বিহার রাজ্যের পাটনা ত্যাগ করেন এবং পূর্ব পাকিস্তানে অভিবাসন করেন। তখন আমি ছিলাম খুব ছোট। আমরা যশোরে চার বছর বসবাস করি এবং পরে নাটোরে স্থানান্তরিত হই। আমরা বীরগঞ্জে আমাদের নিজস্ব বাড়ি নির্মাণ করি। সেখানে বহু অবাঙালি বসবাস করতো। আমাদের কলোনির আশপাশের বাঙালিদের সঙ্গে আমাদের আন্তরিক সম্পর্ক ছিল। ২৫ মার্চ আওয়ামী লীগ আমাদের এলাকায় একটি জনসমাবেশ করে। এ সমাবেশে অবাঙালিদের গালিগালাজ করা হয় এবং আমাদেরকে নির্মূল করার জন্য বাঙালিদের উসকানি দেয়া হয়। কয়েকজন ভদ্র বাঙালি লোকজনকে সহিংসতায় উসকানি না দিতে জঙ্গিদের অনুরোধ করে। কিন্তু তাদের শান্তির আবেদনে তারা কান দেয়নি। আওয়ামী লীগের সশস্ত্র জঙ্গিরা মাইকে অবাঙালিদের নামের একটি দীর্ঘ তালিকা পাঠ করে। এসব অবাঙালির নামের তালিকা পাঠ করে তারা বললো, বাঙালিদের শোষণ করার জন্য তাদের বিচার করা হবে। এ তালিকায় বেশ কয়েকজন সম্মানিত ও ধর্মভীরু বিহারী ছিলেন। তাদের কয়েকজন সাহসের সঙ্গে বাঙালি জনতার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে নিজেদের পক্ষে যুক্তি তুলে ধরেন। দুর্বৃত্তদের তাদের যুক্তি শোনার সময় ছিল না। রক্তপিপাসুরা হত্যার নেশায় ছিল উন্মাদ। কয়েক মিনিটের মধ্যে বাঙালি বন্দুকধারীরা প্রহসনের আদালতে উপস্থিত অবাঙালিদের সকলকে হত্যা করে।...
>
> 'আধা ঘন্টা পর রক্তের পিপাসায় উন্মাদ জনতা হত্যাযজ্ঞে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং সহস্রাধিক অবাঙালিকে হত্যা করে। আমার বাড়িতে তারা আমার ৫৭ বছরের বৃদ্ধ পিতা, আমার স্ত্রী, আমার দুই ভাই, আমার ভগ্নিপতি ও আমার বৃদ্ধা ফুফুকে হত্যা করে। আমার পিতা আল্লাহর ওয়াস্তে মহিলা ও শিশুদের রেহাই দেয়ার জন্য তাদের অনুরোধ করা সত্ত্বেও তারা তাকে নির্যাতন করে গুলি করে হত্যা করে। দুর্বৃত্তরা আমাদের এলাকার অধিকাংশ তরুণীকে অপহরণ করে। বিদ্রোহীরা দল বেধে ধর্ষণ করার পর তাদের গলা টিপে হত্যা করে। আমার পিঠে গুলি লাগে। বিদ্রোহীরা ভেবেছিল আমি মারা গেছি। আমি নিকটবর্তী একটি জরাজীর্ণ বাড়িতে কয়েকদিন আত্মগোপন করে থাকি। ১৯৭১ সালের মধ্য এপ্রিলে পাকিস্তান সেনাবাহিনী নাটোর পুনরুদ্ধার করার পর আমি আমার আপনজনদের দাফন করি। ১৯৭১ সালের মাঝামাঝি আমি ঢাকায় স্থানান্তরিত হই। ১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে করাচিতে প্রত্যাবাসন করি।'

১৯৭১ সালে মার্চের শেষপ্রান্তে এবং এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে সারদায় অবাঙালি হত্যাকাণ্ড ঘটে। এ হত্যাকাণ্ডে ৫ হাজারের বেশি নিরাপরাধ মানুষ প্রাণ হারায়। মার্চের তৃতীয় সপ্তাহে আওয়ামী লীগের জঙ্গি, ইপিআরের বিদ্রোহী সৈন্য এবং ভারতীয় অনুপ্রবেশকারীরা স্থানীয় কারাগার ভেঙ্গে অপরাধীদের মুক্ত করে এবং তাদেরকে নিজেদের দলভুক্ত করে নেয়। অবাঙালি তরুণদের রাস্তায় ধরে নির্যাতন এবং তাদেরকে 'জয় বাংলা' বলতে বাধ্য করা হয়। 'জয় বাংলা' বলতে অস্বীকার করলে গণপিটুনিতে হত্যা করা হতো। একজন অবাঙালি কেরাণী আওয়ামী লীগের এ শ্লোগান দিতে অস্বীকার করায় তাকে কোমর সমান একটি গর্তে পুঁতে লাঠি দিয়ে পিটিয়ে হত্যা করা হয়। নবাবগঞ্জে মার্চ-এপ্রিলে সহস্রাধিক অবাঙালিকে হত্যা করা হয়।

www.pathagar.com

ঊনত্রিশতম অধ্যায়

পাবনা ও সিরাজগঞ্জে রক্তগঙ্গা

পাবনা শহরে অবাঙালিদের সংখ্যা বেশি না হলেও আওয়ামী লীগের জঙ্গিরা ১৯৭১ সালে মার্চের প্রথম সপ্তাহ থেকে তাদের জীবন দুর্বিষহ করে তোলে। পুরো মার্চ জুড়ে প্রতিদিন আওয়ামী লীগ শহরে মিটিং, মিছিল ও বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে রাজপথে তাদের শক্তিপ্রদর্শন করতো। আসন্ন হত্যাযজ্ঞের জন্য অবাঙালিদের বাড়িঘর চিহ্নিত করা হয়। অবাঙালি যুবকদের রাস্তায় লাঞ্ছিত করা হতো এবং বিহারী ও অন্যান্য অবাঙালির কাছে খাদ্য বিক্রি না করার জন্য আওয়ামী লীগের জঙ্গিরা খুচরা ব্যবসায়ীদের নিষেধ করতো।

২৩ মার্চ পাবনায় আওয়ামী লীগের পাকিস্তান বিরোধী আন্দোলনের গতি তুঙ্গে পৌঁছে। সেদিন আওয়ামী লীগ হাইকমান্ডের নির্দেশে 'প্রতিরোধ দিবস' পালন করা হয় এবং বহু অবাঙালির বাড়িঘর লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ করা হয়। আওয়ামী লীগ পাকিস্তানের পতাকায় অগ্নিসংযোগ করে এবং সকল সরকারি ও বেসরকারি ভবনে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করে। বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলনে অস্বীকার করা হলে বিদ্রোহীরা হয়তো গুলি করে হত্যা করতো নয়তো ছুরিকাঘাত করতো। মার্চের শেষদিনগুলোয় এবং এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে শহরে আওয়ামী লীগের বিদ্রোহকালে আরো অবাঙালির বাড়িতে অগ্নিসংযোগ ও হত্যাকাণ্ড ঘটানো হয়। মার্চের শেষ সপ্তাহ এবং এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত বিদ্রোহীরা টেলিফোন একচেঞ্জ ও সরকারি টেলিগ্রাফ নিয়ন্ত্রণ করতো।

প্রত্যক্ষদর্শীদের হিসেব অনুযায়ী পাবনায় অবাঙালিদের মৃত্যুর সংখ্যা ২ হাজার। বিদ্রোহীরা বেশকিছু অবাঙালি যুবতী মহিলাকে অপহরণ করে এবং হত্যা করার আগে ধর্ষণ করে। ১০ এপ্রিল সেনাবাহিনী বিদ্রোহীদের নিয়ন্ত্রণ থেকে পাবনা মুক্ত করার পর বহু বিধ্বস্ত বাড়িঘরে অবাঙালিদের মৃতদেহ পাওয়া যায়। বিদ্রোহীরা বহু মহিলা ও শিশুকে পরিত্যক্ত ভবনগুলোতে তাড়িয়ে নিয়ে যায় এবং সেনাবাহিনী এসে পৌঁছানোর আগে ভবনগুলোয় আগুন দেয়। বিদ্রোহীরা অবরুদ্ধ অবাঙালিদের পালানোর পথগুলো বন্ধ করে দেয়। অবাঙালিদের মৃতদেহ ট্রাকে স্তূপ করে রাখা হয় এবং নিকটবর্তী পদ্মা নদীতে ভাসিয়ে দেয়া হয়। কয়েকজন ধার্মিক বাঙালি নির্দোষ অবাঙালিদের হত্যা না করার জন্য বিদ্রোহীদের বিরত রাখার চেষ্টা করায় তাদেরকে ভয়ভীতি দেখানো হয় এবং মারধর করা হয়। দুলাই, সুজানগর, সাঁথিয়া, কিসমত, ভেরা ও শাহজাদপুরেও অবাঙালিদের বিরুদ্ধে সহিংসতা ঘটে।

www.pathagar.com

সিরাজগঞ্জ

১৯৭১ সালে মার্চের প্রথম সপ্তাহে আওয়ামী লীগ অবাঙালিদের ভীতসন্ত্রস্ত করে তোলে এবং অস্ত্র সমর্পণে তাদের নির্দেশ দেয়। মুক্তিপণের জন্য কয়েকজন পশ্চিম পাকিস্তানি ও বিহারী ব্যবসায়ীকে অপহরণ করা হয়। আওয়ামী লীগের জঙ্গিরা পুলিশের অস্ত্রাগার থেকে অস্ত্র লুট করে। মার্চের দ্বিতীয় সপ্তাহে আওয়ামী লীগের জঙ্গিরা আরো বেপরোয়া ও দুঃসাহসী হয়ে উঠে এবং অবাঙালিদের বিরুদ্ধে বিচ্ছিন্ন সহিংসতায় লিপ্ত হয়। তার আগের সপ্তাহে লাল দাগ দিয়ে অবাঙালিদের বাড়িঘর চিহ্নিত করা হয়। মার্চের তৃতীয় সপ্তাহে বাঙালি বিদ্রোহীরা ক্ষুদ্র অবাঙালি জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সর্বাত্মক সন্ত্রাস ও সহিংসতায় মেতে উঠে। ২৩ মার্চ আওয়ামী লীগ পাকিস্তান দিবসকে 'প্রতিরোধ দিবস' হিসেবে পালন করে। সেদিন রাতে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে উন্মত্ত জনতা অবাঙালিদের বাড়িঘর ভাঙচুর এবং অবাঙালি পুরুষদের নির্বিচারে হত্যা করে। ১৯৭১ সালে মার্চের শেষ সপ্তাহ জুড়ে হত্যাকাণ্ড চালানো হয় এবং ২৭ এপ্রিল বিদ্রোহীদের কবল থেকে পাকিস্তান সেনাবাহিনী সিরাজগঞ্জ পুনরুদ্ধার করা নাগাদ চরম বর্বরতার সঙ্গে হত্যাযজ্ঞ অব্যাহত থাকে।

৩৫০ জন বৃদ্ধ পুরুষ, মহিলা ও শিশুকে পুড়িয়ে হত্যা করার ঘটনা ছিল অবাঙালিদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে ঘৃণ্য সহিংসতা। ১৯৭১ সালে মার্চের শেষদিকে বিদ্রোহীরা তাদেরকে একটি স্কুল ভবনে আটক রেখেছিল। দুর্বৃত্তরা অস্ত্র উঁচিয়ে অবাঙালিদের বাড়িঘর তছনছ করে এবং সকল প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষকে গুলি করে হত্যা করে। বন্দুকের মুখে এসব শোকসন্তপ্ত মহিলা ও শিশুকে এ স্কুলে আটক করা হয়। ২৭ এপ্রিল সেনাবাহিনী সিরাজগঞ্জ পুনরুদ্ধার করার আগে বিদ্রোহীরা স্কুল ভবনে আগুন দেয় এবং এ ভবনে আটক সকল অবাঙালিকে জীবন্ত পুড়িয়ে হত্যা করে। এ নির্মম উপাখ্যানের বর্ণনা দেয়ার জন্য কেউ জীবিত থাকার সুযোগ পায়নি।

ব্রহ্মপুত্রে শত শত লাশ ভাসিয়ে দেয়ায় ১৯৭১ সালের মার্চ-এপ্রিলে সিরাজগঞ্জে অবাঙালিদের মৃত্যুর সংখ্যা কখনো জানা যাবে না। বিদ্রোহীরা বহু অবাঙালি বন্দিকে নদীর তীরে হত্যা করে তাদের লাশ পানিতে ভাসিয়ে দেয়। সেনাবাহিনী সিরাজগঞ্জ পুনর্দখল করার পর বহু বাড়িঘরে আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসের শিকার অবাঙালিদের স্তূপীকৃত ক্ষতবিক্ষত লাশ পাওয়া যায়। বহু দুঃস্থ ও এতিম শিশু এবং তাদের বিধবা মায়েদের ঢাকায় স্থানান্তর করা হয় এবং তাদেরকে কয়েকটি শিবিরে আশ্রয় দেয়া হয়। কয়েকজনকে খুলনায় পাঠানো হয়। সেখানে অবাঙালিরা তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে।

www.pathagar.com

ত্রিশতম অধ্যায়

কুমিল্লায় দুর্ভোগ

১৯৭১ সালে মার্চের মাঝামাঝি কুমিল্লায় বাঙালি ও অবাঙালিদের মধ্যে উত্তেজনা আতঙ্কজনক পর্যায়ে পৌঁছে। এ উত্তেজনার মূলে ছিল আওয়ামী লীগের কাল্পনিক গুজব এবং অল ইন্ডিয়া রেডিও'র বৈরি প্রচারণা। ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলসের বিদ্রোহী সৈন্যরা আওয়ামী লীগের ক্যাডারদের সঙ্গে যোগসাজশে কাজ করতে থাকে। আওয়ামী লীগের ভ্রাম্যমাণ সশস্ত্র কর্মীরা অবাঙালিদের বাড়িঘর চিহ্নিত করে। মার্চের তৃতীয় সপ্তাহে বিদ্রোহীরা অবাঙালিদের বাড়িঘর ভাঙচুর ও লুটতরাজ করে এবং বাধাদানকারীদের নির্মূল করার অভিযান চালায়। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন যে, এপ্রিলের গোড়ার দিকে পাকিস্তান সেনাবাহিনী নিয়ন্ত্রণ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার আগে কুমিল্লায় বিদ্রোহী ও তাদের সহযোগীরা কমপক্ষে ৪ হাজার অবাঙালিকে হত্যা করে।

(১৬২) **একশো বাষট্টিতম সাক্ষীর বিবরণ:** ২৯ বছরের আবু সাঈদ কুমিল্লায় নজরুল ইসলাম রোডে তার ভাই কামরদ্দিনের সুসজ্জিত বাড়িতে বসবাস করতেন। ১৯৭১ সালে মার্চের তৃতীয় সপ্তাহে আবু সাঈদের পরিবারের পাঁচ সদস্যকে হত্যা করা হয়। এ নির্মম ঘটনার সাক্ষ্য দিতে গিয়ে আবু সাঈদ বলেছেন:

> 'আমার বড় ভাই কামরুদ্দিন ছিলেন অত্যন্ত স্বচ্ছল ব্যবসায়ী। ১৯৪৮ সালের গোড়ার দিকে আমরা ভারত থেকে পূর্ব পাকিস্তানে অভিবাসন করেছিলাম। আমাদের সবাই বাংলা ভাষা শিখেছিলাম। আমরা অনর্গল বাংলায় কথা বলতে পারতাম। বাঙালি প্রতিবেশীদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক ছিল চমৎকার। ঢাকার রাজনৈতিক উত্তেজনা কুমিল্লায় অনুভূত হয় এবং অবাঙালিরা অস্বস্তি বোধ করতে থাকে। কামরুদ্দিনের পরিবারে ছিল তার স্ত্রী, তার দুই কলেজগামী পুত্র ও তার কিশোরী কন্যা। বৃদ্ধা মা আমাদের সঙ্গে বসবাস করতেন। ২৩ মার্চ গোলাগুলির আওয়াজ শুনে আমরা বিস্মিত হই। আমরা একটু দূরে একটি সশস্ত্র গ্রুপকে আমাদের বাড়ির দিকে অগ্রসর হতে দেখি। কয়েকটি দোকান ও বাড়িতে আগুন জ্বলছিল। বাঙালি বন্দুকধারীরা আমাদের বাড়ির বাইরে এসে চিৎকার করে উঠে। আমার ভাই কামরুদ্দিন তাদের সঙ্গে বাংলায় কথা বলেন এবং তাদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। এক ঝাঁক গুলি ছুঁড়ে তার কথার জবাব দেয়া হয়। বিদ্রোহীরা আমাদের বাড়ির দরজা ভেঙ্গে ফের গুলিবর্ষণ করে। আমার ভাই রক্তে ভেসে যাচ্ছিলেন। আমার দুই ভাতিজা আক্রমণকারীদের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করতে গিয়ে নিহত হয়। তাদের শোকাহত মা তাদের রক্তরঞ্জিত নিথর দেহের ওপর বিলাপ করার সময় একজন বন্দুকধারী রাইফেল দিয়ে তাকে গুলি করে। বাঙালি বিদ্রোহীরা আমাদের বাড়ি লুটপাটে ব্যস্ত হয়ে পড়ায় আমি একটি জানালা দিয়ে পালিয়ে

www.pathagar.com

যাই এবং একটি জঙ্গলে লুকিয়ে থাকি। আমি আমার ভাতিজির চিৎকার শুনছিলাম। সে তখনো বাড়িতে ছিল। কিন্তু আমি তাকে রক্ষায় এগিয়ে যাবার সাহস পাচ্ছিলাম না। আমি গুলির আওয়াজ শুনতে পাই। মাঝ রাতে পা টিপে টিপে বাড়িতে প্রবেশ করি। বাড়ির পরিবেশ ছিল ভৌতিক। আমার মা ছাড়া আর কেউ জীবিত নেই। তিনি অজ্ঞান। সকালে তিনি জ্ঞান ফিরে পান। আমার ভাইয়ের শয়নকক্ষে আমার ভাতিজির লাশ। একটি দড়ি দিয়ে তার হাত বাঁধা। তার পরনের কাপড় ছিন্ন ভিন্ন। আমি আমার মায়ের কাছ থেকে জানতে পারি যে, আমার ভাতিজি ধর্ষণকারীদের বাধা দেয়ার চেষ্টা করছিল। ধর্ষণকারীরা পালাক্রমে তাকে ধর্ষণ করে। বিদায় নেয়ার আগে ধর্ষণকারীরা শ্বাসরোধ করে তাকে হত্যা করে।...

'১৯৭১ সালে পুরো মার্চ জুড়ে কুমিল্লা ছিল সন্ত্রাসের রাজত্ব। হাজার হাজার অবাঙালিকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হয়। ১৯৭০ সালে ডিসেম্বরের সাধারণ নির্বাচনে যেসব বাঙালি আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছিল তাদেরকে চিহ্নিত করা হয়। এপ্রিলের গোড়ার দিকে পাকিস্তান সেনাবাহিনী কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার পর কুমিল্লায় শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরে আসে। কিন্তু ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে ভারতীয় ও মুক্তিবাহিনী বিজয়ী হওয়ার পর মার্চের হত্যাকাণ্ড থেকে যেসব অবাঙালি রক্ষা পেয়েছিল তাদেরকে হত্যা করা হয়। মুক্তিবাহিনীকে ঘুষ দিয়ে আমি ১৯৭২ সালের শেষদিকে নেপালে পালিয়ে যাই। ১৯৭৩ সালের এপ্রিলে করাচিতে ফিরে আসতে সক্ষম হই।...'

(১৬৩) **একশো তিষট্টিতম সাক্ষীর বিবরণঃ** ২৩ বছরের আখতার রশীদের অভিজ্ঞতাও অনুরূপ লোমহর্ষক। ১৯৭১ সালের মার্চে কুমিল্লায় সংঘটিত অবাঙালি হত্যাকাণ্ডের তিনিও একজন প্রত্যক্ষদর্শী। আখতার রশীদ তার নির্মম অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন:

'আমার আব্বা আবদুর রশীদ কুমিল্লা সেনানিবাসে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কাছে খাদ্য সরবরাহের একটি ঠিকাদারী পেয়েছিলেন। আমরা নিউ মার্কেটে বসবাস করতাম। আমি ছিলাম তখন ছাত্র। আমাদের অধিকাংশ প্রতিবেশী ছিল অবাঙালি। বাঙালিদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক ছিল বন্ধুত্বপূর্ণ। ২২ মার্চ কুমিল্লায় উত্তেজনার বিস্ফোরণ ঘটে। সেদিন রক্তপিপাসু আওয়ামী লীগ ও ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলসের বিদ্রোহীরা সূর্যাস্তের পর পরই হত্যাযজ্ঞে মেতে উঠে। আমাদের এলাকায় তারা অবাঙালিদের সব বাড়িঘর তছনছ করে। নির্বিচারে পুরুষদের হত্যা করে। এ হত্যাযজ্ঞের দিন আমার পিতা ছিলেন শহরের বাইরে। কলেজ থেকে আমি বাড়িতে ফিরে না গিয়ে সন্ধ্যায় একটি জরাজীর্ণ বাড়িতে লুকিয়ে থাকি। মাঝরাতের কাছাকাছি আমি বাড়িতে পৌঁছে স্তম্ভিত হয়ে যাই। আমার কিশোরী বোন শিরিন নিখোঁজ। আমাদের বাড়ি লুণ্ঠিত। আশপাশে কারো কোনো সাড়া শব্দ নেই। আমি কয়েকটি জায়গায় রক্তমাখা লাশ ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকতে দেখি। আমি আতঙ্কিত হয়ে উঠি। পাকিস্তান সেনাবাহিনী কুমিল্লায় নিজেদের নিয়ন্ত্রণ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার পর আমার পিতা বাড়িতে ফিরে আসেন। আমার বোনের অপহরণের সংবাদ ছিল তার কাছে একটি গুরুতর আঘাত। আমরা শিরিনের খোঁজে ১৯৭১ সালের এপ্রিল ও মে'তে গোটা কুমিল্লা জেলা চষে বেড়াই। ১৯৭২ সালের শেষদিকে আমি পূর্ব পাকিস্তান পরিত্যাগের সিদ্ধান্ত নেই এবং আমার পিতাকে আমার সঙ্গী হতে রাজি করানোর চেষ্টা করি। কিন্তু তিনি অস্বীকৃতি জানিয়ে বললেন, শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করা নাগাদ তিনি তার নিখোঁজ মেয়েকে খুঁজে বেড়াবেন। আমি নেপালে পালিয়ে যাই এবং

www.pathagar.com

> ১৯৭৩ সালের জুনে করাচিতে ফিরে আসি। কাঠমন্ডুতে আমি জানতে পেরেছিলাম যে, বাঙালি বিদ্রোহীরা কুমিল্লা থেকে যেসব অবাঙালি মেয়েকে অপহরণ করেছিল তাদেরকে ভারতে নিয়ে গেছে। ভারতে তাদেরকে পতিতাবৃত্তির জন্য পতিতালয়ে বিক্রি করা হয়েছে। শিরিনের এই সম্ভাব্য পরিণতি আমাকে কুরে কুরে খায়। আমার আত্মাকে ক্ষত-বিক্ষত করে।...'

কুমিল্লার প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, আওয়ামী লীগের জঙ্গিদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ছিল বাঙালি হিন্দু। এপ্রিলের গোড়ার দিকে পাকিস্তান সেনাবাহিনী কুমিল্লায় নিয়ন্ত্রণ পুনঃপ্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে আওয়ামী লীগের কর্মী ও আধা-সামরিক বাঙালি বিদ্রোহীরা প্রতিবেশী ভারতে পালিয়ে যায়। বিদ্রোহীরা অবাঙালিদের বাড়িঘর ও সরকারি কোষাগার থেকে লুণ্ঠিত মালামাল ভারতে নিয়ে যায়। পাকিস্তান সেনাবাহিনী অবাঙালিদের শত শত পচা গলা লাশ গণকবর দেয়। কিন্তু ভারত ও আওয়ামী লীগ অপপ্রচার চালিয়ে সারা পৃথিবীকে বিভ্রান্ত করেছিল যে, এসব গণকবর পাকিস্তান সেনাবাহিনীর হাতে নিহত বাঙালিদের। কুমিল্লা ছিল পাকিস্তান সেনাবাহিনীর নবম ডিভিশনের সদর দপ্তর। এ ডিভিশনের সৈন্য ও অফিসাররা ছিল সুশৃঙ্খল। তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যে, আক্রান্ত না হলে তারা গুলিবর্ষণ করবে না। কুমিল্লায় যেসব বাঙালি বিদ্রোহী অবাঙালিদের হত্যা এবং তাদের সম্পদ লুণ্ঠন করেছিল তাদের অধিকাংশ ফেনীতে পিছু হটে। কুমিল্লা থেকে সেনাবাহিনীর একটি ব্রিগেড ফেনী থেকে বিদ্রোহীদের তাড়িয়ে দেয়। বিদ্রোহীদের কেউ কেউ তাদের অস্ত্র নিয়ে ভারত সীমান্ত অতিক্রম করে।

কুমিল্লার প্রত্যক্ষদর্শীরা আরো জানিয়েছেন যে, ১৯৭১ সালের ৩ মার্চ আওয়ামী লীগের বিদ্রোহীরা কুমিল্লার টেলিফোন একচেঞ্জ দখল করেছিল এবং কুমিলার সঙ্গে সারা দেশের টেলিযোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল। একইদিন বিদ্রোহীরা কুমিল্লায় ভৈরব থেকে লাকসাম অভিমুখী একটি ট্রেন থামিয়ে অগ্নিসংযোগের চেষ্টা করে। কিন্তু কর্তব্যরত রেলওয়ে স্টাফের উপস্থিত বুদ্ধি ও সাহসের জন্য ট্রেনটি এ বিপর্যয় থেকে রক্ষা পায়। ১২ মার্চ কুমিল্লা কারাগারে আটক প্রায় ৩শ' বন্দি পালিয়ে যাবার চেষ্টা করে। অনুগত কারারক্ষী তাদের ওপর গুলিবর্ষণ করলে কারাগার ভেঙ্গে পালানোর চেষ্টা নস্যাৎ হয়ে যায়। একদল সশস্ত্র জনতা কুমিল্লার কাছে ফেনীতে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর একটি ইউনিটের ওপর হামলা চালায়। সৈন্যরা এ হামলা ব্যর্থ করে দেয়। ১৯৭১ সালের মাঝামাঝি কুমিল্লা জেলার কয়েকটি চা বাগানে দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে। আওয়ামী লীগের উসকানিতে চা বাগানের বাঙালি শ্রমিকরা পশ্চিম পাকিস্তানি, বিহারী ও অন্যান্য অবাঙালি স্টাফ ও তাদের পরিবারবর্গের ওপর হামলা চালায়। ১৩ মার্চ আওয়ামী লীগের একদল লোক শমসেরনগরে পাকিস্তানের জাতীয় পতাকা পুড়িয়ে দেয়। পুলিশের অনুগত একটি ইউনিট এসব দুর্বৃত্তকে গ্রেফতার করে। আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ তাদের দলীয় লোকজনকে মুক্ত করতে কারাগার ভেঙ্গে ভেতরে প্রবেশ করার চেষ্টা চালান।

www.pathagar.com

আখাউড়া

গুরুত্বপূর্ণ রেলওয়ে স্টেশন আখাউড়ায় বিপুল সংখ্যক অবাঙালির প্রাণহানি ঘটে। ১৯৭১ সালে মার্চের শেষ সপ্তাহে একদল বাঙালি বিদ্রোহী রেলওয়ে স্টেশন এবং অবাঙালি কর্মচারীদের কোয়ার্টারে হামলা চালিয়ে বেশ কিছু অবাঙালি পুরুষকে হত্যা করে। আওয়ামী লীগের জঙ্গি এবং ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলসের বিদ্রোহীরা যেসব অবাঙালিকে হত্যা করেছিল, আখাউড়ার স্টেশন মাস্টার লায়িক আখতার ছিলেন তাদের অন্যতম। স্টেশন মাস্টার লায়িক আখতার মার্চের পুরো গোলযোগপূর্ণ সময়ে রেলওয়ে স্টেশন চালু রেখেছিলেন। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, তারা শুনেছেন স্টেশন মাস্টার সাহসিকতার সঙ্গে আক্রমণকারীদের প্রতিহত করার চেষ্টা এবং বীরত্বপূর্ণ লড়াই করেছিলেন। আওয়ামী লীগের বিদ্রোহীরা আখাউড়ায় প্রচুর স্বচ্ছল অবাঙালি ব্যবসায়ীকে হত্যা করে। বিদ্রোহীরা বহু অবাঙালি কিশোরীকে অপহরণ ও ধর্ষণ করে। আখাউড়া ভারত সীমান্তের কাছাকাছি হওয়ায় পাকিস্তান সেনাবাহিনী নিজেদের নিয়ন্ত্রণ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার পর বাঙালি বিদ্রোহী ও তাদের সহযোগী আওয়ামী লীগের জঙ্গিরা আগরতলায় পালিয়ে যায়। ১৯৭১ সালে আখাউড়ায় এত বেশি অবাঙালি নিহত হয় যে, এ হত্যাকাণ্ডের বর্ণনা দেয়ার জন্য খুব সংখ্যক লোকই জীবিত ছিল।

www.pathagar.com

একত্রিশতম অধ্যায়

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় দুর্দশা

ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরে অবাঙালিদের সংখ্যা ছিল খুবই কম। তাদের অধিকাংশই ১৯৪৭ সালে উপমহাদেশ বিভক্তিকালে ভারতের বিহার রাজ্য থেকে এখানে এসে বসতি স্থাপন করে। তারা বাংলা ভাষা শিখেছিল। তাদের অধিকাংশই ছিল ব্যবসায়ী। কেউ কেউ ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে চাকরি করতো। ১৯৭১ সালে মার্চের তৃতীয় সপ্তাহে আওয়ামী লীগের জঙ্গি, ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস ও ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের বিদ্রোহীরা অবাঙালিদের ভীতি প্রদর্শন করছিল। ২৩ মার্চ একদল উন্মত্ত জনতা অবাঙালিদের কয়েকটি দোকান লুট ও অগ্নিসংযোগ করে। স্থানীয় পুলিশ অবাঙালিদের রক্ষায় কোনো উদ্যোগ নেয়নি। ২৬ মার্চ বাঙালি বিদ্রোহীরা অবাঙালিদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক আক্রমণ শুরু করে। সশস্ত্র দুর্বৃত্তরা তাদের দোকানপাট তছনছ করে। যেসব অবাঙালি বাধা দেয়ার চেষ্টা করেছিল তাদেরকে গুলি করে হত্যা করা হয়। আক্রমণকারীদের মধ্যে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের বিদ্রোহী সৈন্যরাও ছিল। বিদ্রোহী সৈন্যরা ছিল মেশিনগান ও বাজুকা সজ্জিত। তারা নির্বিচারে অবাঙালিদের সম্পত্তি ধ্বংস করে।

বিদ্রোহীরা অস্ত্রের মুখে পুরুষ, মহিলা ও শিশুসহ প্রায় ৫শ' বিহারীকে তাদের বাড়িঘর থেকে উচ্ছেদ করে এবং তাদেরকে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বিবর্ণ কারাগারে ঠেলে দেয়। বিদ্রোহীরা অধিকাংশ তরুণ বিহারীকে হত্যা করে। কারাগারের অভ্যন্তরে বিহারী বন্দিরা অমানবিক নির্যাতনের শিকার হয়। ট্রিগার হ্যাপি কারারক্ষীরা ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত শিশুদের গুলি করে হত্যা করে। বিচ্ছিন্নতাবাদী বন্দুকধারীরা রাতের অন্ধকারে অসংখ্য বিহারী মেয়েকে অপহরণ করে এবং তাদের আশ্রয়দানকারীদের রাইফেলের বাট ও লাঠি দিয়ে পেটায়। দিনের পর দিন বিহারী বন্দিদের কোনো খাবার দেয়া হয়নি। ক্ষুৎ পিপাসায় কারাগারের অভ্যন্তরে বেশ কয়েকজন বন্দি মারা যায়।

১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল পাকিস্তান সেনাবাহিনীর একটি বহর ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কাছাকাছি পৌঁছে গেলে বাঙালি বিদ্রোহীরা পিছু হটে। এসময় বিদ্রোহীরা ব্রাহ্মণবাড়িয়া কারাগারকে একটি কসাইখানায় পরিণত করে। ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের বিদ্রোহী কোম্পানি কমান্ডার কারাগারে আটক সকল অবাঙালিকে হত্যার নির্দেশ দেন। সূর্যোদয়ের ঠিক পূর্বক্ষণে এক ডজন বাঙালি মেশিনগান চালক কারাগারের অভ্যন্তরে প্রতিটি অবাঙালিকে হত্যা করে। নির্দোষ মানুষের হত্যাকাণ্ড সম্পন্ন হওয়ার পর ঘাতকরা অদূরে ভারত সীমান্তের দিকে যাত্রা করে। পরদিন পাকিস্তানি সৈন্যরা নিহত বিহারীদের দাফন করে। দাফনে অংশগ্রহণকারী কয়েকজন পাকিস্তানি সৈন্য মন্তব্য করেছিল, 'আমরা কখনো এ ধরনের নৃশংসতার কথা ভাবিনি।'

www.pathagar.com

লন্ডনের সানডে টাইমসে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় অবাঙালি হত্যাকাণ্ডের নিষ্ঠুর উপাখ্যান প্রকাশিত হয়। এ পত্রিকার পাকিস্তানি প্রতিনিধি এন্থনি মাসকারেনহাস তার আগের মাসে এ শহর সফর করেছিলেন। ১৯৭১ সালের ২ মে প্রকাশিত তার রিপোর্টে বলা হয়:

> 'ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের সীমান্তের এপারে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় আমি ৮২টি শিশুর লাশ দেখেছি। এসব শিশুকে লাইনে দাঁড় করিয়ে গুলি করে হত্যা করা হয়। কারাগারের এখানে সেখানে প্রায় তিন শ' অবাঙালির লাশ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। বাঙালি অপরাধীদের মুক্ত করে দেয়ার পর তাদেরকে সেখানে আটক করা হয়েছিল। পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যদের অগ্রযাত্রার মুখে পালানোর আগে বিদ্রোহীরা তাদের গুলি করে হত্যা করে।'

(১৬৪) **একশো চৌষট্টিতম সাক্ষীর বিবরণ:** ৪৫ বছরের কালু মিয়া ব্রাহ্মণবাড়িয়া রেলওয়ে স্টেশনে মুটে হিসেবে কাজ করতেন। ১৯৭৩ সালের নভেম্বরে তিনি করাচিতে প্রত্যাবাসন করেন। ১৯৭১ সালে এপ্রিলের শুরুর দিকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া রেলওয়ে স্টেশনে একটি পরিত্যক্ত মালবাহী ওয়াগনে এক সপ্তাহ লুকিয়ে থেকে তিনি হত্যাকাণ্ড থেকে রক্ষা পান। ১৯৭১ সালের মার্চ-এপ্রিলে ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কুমিল্লা ও ভৈরব বাজারে কালু মিয়ার সব আত্মীয়-স্বজনকে হত্যা করা হয়। নিহতদের মধ্যে ছিল তার পুত্র ও ছোট ভাই। কালু মিয়া তার সাক্ষ্যে বলেছেন:

> 'আমি আগরতলা থেকে ভারতীয়দের ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় আওয়ামী লীগের বিদ্রোহীদের কাছে অস্ত্র ও গোলাবারুদ পৌঁছে দিতে দেখেছি। আমি ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় আওয়ামী লীগের বিদ্রোহীদের সঙ্গে বহু ভারতীয়কে খোলাখুলি অস্ত্র নিয়ে ঘোরাফেরা করতে দেখেছি। আওয়ামী লীগের সঙ্গে আগরতলায় ভারতীয় সামরিক বাহিনীর লোকদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। তাদের বিদ্রোহের পুরো সময়ে তারা আগরতলা থেকে অস্ত্র ও গোলাবারুদ সরবরাহ লাভ করতো। দুর্বৃত্তরা রেলওয়ের অধিকাংশ অবাঙালি কর্মচারী ও তাদের পরিবারকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়। মার্চের পুরো সময়ে রেলে ভ্রমণকারী অবাঙালিদের ওপর হামলা করা হয়। অনেকে নিহত হয়। কাউকে কাউকে চলন্ত ট্রেন থেকে বাইরে ফেলে দেয়া হয়।'

www.pathagar.com

বত্রিশতম অধ্যায়

বগুড়া ও নওগাঁয় গোলযোগ

১৯৭১ সালে মার্চের দ্বিতীয় সপ্তাহে আওয়ামী লীগের জঙ্গি এবং ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলসের বিদ্রোহীরা বগুড়া শহরের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে। তারা অবাঙালিদের দোকানপাট লুট করে এবং বন্দুকের মুখে মালিকদের কাছ থেকে অর্থ আদায় করে। কারাগার ভেঙ্গে কয়েদীদের মুক্ত করে দেয়া ছিল তাদের অন্যতম দুঃসাহসী কাজ। তারা সব বন্দিদের মুক্ত করে দেয়। কারাগার ভেঙ্গে পলায়নকারী অনেক দুর্বৃত্ত বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দেয়। বন্দিরা বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দেয়ায় আওয়ামী লীগের সহিংসতার বিস্তার এবং জাতিগত বিদ্বেষ চরম মাত্রায় পৌঁছে।

কয়েকজন অবাঙালি তরুণকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়। তাদের পিতামাতাকে প্রহার করা হয়। ২৬ মার্চ উন্মাদ আবেগে উত্তাল আওয়ামী লীগের দুর্বৃত্ত ও বিদ্রোহী সৈন্যরা পুরুষ, মহিলা ও শিশুসহ বহু অবাঙালিকে হত্যা করে। লুট করার পর অবাঙালিদের বাড়িঘরে আগুন দেয়া হয়। শত শত কিশোরীকে অপহরণ করা হয়। অপহৃত কিশোরীদের অনেককে নির্যাতন ও ধর্ষণ করা হয়। আওয়ামী লীগের বন্দুকধারীরা প্রায় ৭শ' অবাঙালি পুরুষ, মহিলা ও শিশুকে বাড়ি থেকে বিতাড়িত করে। ১৯৭১ সালে এপ্রিলের গোড়ার দিকে এসব উদ্বাস্তু অবাঙালিদের বগুড়া কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। পাকিস্তানি সৈন্যদের অগ্রযাত্রার মুখে লড়াইয়ে পরাজিত বাঙালি বিদ্রোহীরা শহর পরিত্যাগের আগে ডিনামাইট দিয়ে এ কারাগার উড়িয়ে দেয়ার পরিকল্পনা করেছিল। কিন্তু যথাসময়ে পাকিস্তান সেনাবাহিনী পৌঁছে যাওয়ায় হতভাগ্য বন্দিরা উড়ে যাবার হাত থেকে রক্ষা পায়।

(১৬৫) **একশো পঁয়ষট্টিতম সাক্ষীর বিবরণ:** ৫৯ বছরের হাকিম আশরাফুল্লাহ ১৯৫১ সাল থেকে বগুড়ায় আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা করতেন। ১৯৭১ সালে মার্চের শেষদিকে বিদ্রোহীরা তার ছেলেকে হত্যা করে। হাকিম আশরাফুল্লাহ তার সাক্ষ্যে বলেছেন:

> 'আমার পূর্বপুরুষের আবাসভূমি লক্ষ্ণৌতে। আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসায় গভীর জ্ঞান থাকায় সেখানে আমার পিতা হাকিম বরকতুল্লাহ অত্যন্ত সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন। আমি আমার যৌবনের একটি অংশ কাটিয়েছি কলকাতায়। ১৯৪৭ সালে উপমহাদেশ বিভক্তির পর আমি ঢাকায় অভিবাসন করি। ১৯৫১ সাল থেকে বগুড়া ছিল আমার আবাসস্থল। আমি এ শহর এবং এ শহরের লোকদের ভালোবাসতাম। আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসায় আমি উল্লেখযোগ্য সফলতা অর্জন করি। আমি 'চাচা' হিসেবে সুপরিচিত ছিলাম। আমার শত শত বাঙালি ও অবাঙালি বন্ধু ছিল। প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের আমলে আমি মৌলিক গণতন্ত্রের আওয়ায় মেম্বার হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলাম। নির্বাচনে বাঙালিরা আমাকে বিপুল ভোটে বিজয়ী করে।...

www.pathagar.com

'মার্চের শেষ সপ্তাহে বগুড়া হাজার হাজার অবাঙালির জন্য একটি নরকে পরিণত হয়। এপ্রিলের প্রথমার্ধ পর্যন্ত হত্যাকাণ্ড অব্যাহত ছিল। আমার ছেলে স্থানীয় একটি সাবানের কারখানায় চাকরি করতো। তাকে এবং অন্যান্য সকল অবাঙালিকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। আমি কখনো তার লাশ খুঁজে পাইনি। আমি জানতে পারি যে, তার লাশ জ্বলন্ত একটি বাড়িতে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। স্তূপ করে রাখার ঝামেলা থেকে মুক্ত থাকার জন্য লাশ আগুনে নিক্ষেপ করা ছিল বিদ্রোহীদের অনুসৃত একটি সাধারণ রীতি। অন্তঃসত্ত্বা মহিলাদের বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করা হয়। কিশোরীদের ওপর যৌন নির্যাতন চালানো হয়। বাধাদানকারীদের হয়তো শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয় নয়তো পরিত্যক্ত কূপে নিক্ষেপ করা হয়। একজন বাঙালি প্রতিবেশী আমাকে আশ্রয় দিয়ে রক্ষা করেছিলেন। এই বাঙালিকে কয়েক বছর আগে আমি চিকিৎসা করেছিলাম। তার দেশবাসীকে যে উন্মত্ততা গ্রাস করেছিল তিনি সেজন্য দুঃখ করেছিলেন। তবে তিনি ছিলেন বিদ্রোহী জনতার উন্মত্ততা ও নিষ্ঠুরতার সামনে অসহায়। উন্মত্ত জনতা অবাঙালিদের রক্তপাত ঘটাতে উন্মাদ হয়ে গিয়েছিল। বিপুল সংখ্যক দয়ালু বাঙালিও ছিল আমার প্রতিবেশীর মতো অসহায় ও অক্ষম। এসব বাঙালি অবাঙালি হত্যাকাণ্ডে ব্যথিত ও মর্মাহত হয়েছিল। ভারতীয় সেনাবাহিনী পূর্ব পাকিস্তান দখল করে নেয়ার কিছুদিন পর ১৯৭২ সালে আমি নেপালে পালিয়ে যাই। ১৯৭৩ সালের জুনে আমি করাচি পৌঁছি। ১৯৭১ সালের মার্চ-এপ্রিলে বগুড়া শহরে অবাঙালিদের মৃত্যুর সংখ্যা ছিল ৩ হাজারের কাছাকাছি।'

বগুড়া জেলার কাছাকাছি নওগাঁয়ে অবাঙালিদের সংখ্যা ছিল প্রায় চার হাজার। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ থেকে ২০ এপ্রিল পর্যন্ত নওগাঁয়ের অধিকাংশ অবাঙালি নিহত হয়। আওয়ামী লীগের জঙ্গি ও বিদ্রোহী সৈন্যরা অবাঙালি অধ্যুষিত এলাকা অভিমুখী রাস্তাগুলোয় ব্যারিকেড দেয়। ২৬ মার্চ বিদ্রোহীরা অবাঙালিদের বাড়িঘর লুট ও অগ্নিসংযোগ করে এবং গুলি করে তাদের হত্যা করে। ৫০ জন যুবতী মহিলা এ হত্যাকাণ্ড থেকে রক্ষা পায়। এসব যুবতী মহিলাকে প্রায় উলঙ্গ অবস্থায় বাজারে ঘোরানো হয়। তাদেরকে সুরক্ষিত কয়েকটি বাড়িতে রাখা হয়। সেখানে বিদ্রোহী সৈন্যরা পালাক্রমে তাদের ধর্ষণ করতো। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অগ্রযাত্রার মুখে পিছু হটার পূর্বক্ষণে বিদ্রোহীরা এসব হতভাগ্য মহিলাকে হত্যা করে। লাশ দাফনে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বেশ কয়েকদিন লেগেছিল। শহরের সর্বত্র লাশ ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। আক্ষরিকভাবে লাশের স্তূপ থেকে আহত কয়েকজন বেঁচে যায়। এসব সৌভাগ্যবান লোক বলেছেন, তারা নিশ্চিত যে, ঘাতকদের কেউ কেউ ছিল ভারতীয় অনুপ্রবেশকারী বাঙালি হিন্দু।

www.pathagar.com

তেত্রিশতম অধ্যায়

সান্তাহারে বীভৎসতা

বগুড়া জেলার রেলওয়ে জংশন শহর সান্তাহারে ১৯৭১ সালে মার্চের শুরুর দিনগুলোতে ঢাকায় আওয়ামী লীগের বিদ্রোহের কম্পন অনুভূত হয়। আওয়ামী লীগের উগ্রপন্থীরা অতিরঞ্জিত গুজব ছড়ায় যে, পাকিস্তান সেনাবাহিনী ও পশ্চিম পাকিস্তানিরা ঢাকা ও অন্যান্য শহরে বাঙালিদের হত্যা করছে। সান্তাহারে অবাঙালিদের বিরুদ্ধে বাঙালিদের ক্ষেপিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে এ গুজব ছড়ানো হয়। ২৫ মার্চ উত্তেজনার আগ্নেয়গিরিতে বিস্ফোরণ ঘটে। সেদিন সশস্ত্র আওয়ামী লীগ এবং ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস ও ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের বিদ্রোহী সৈন্যরা অবাঙালিদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। ১৯৭১ সালের ২৭ এপ্রিল সান্তাহারে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বহর এসে পৌঁছানো নাগাদ এ শহরের প্রায় ২২ হাজার অবাঙালির মধ্যে ১৫ হাজারের বেশি লোককে হত্যা করা হয়। সান্তাহার রেলওয়ে স্টেশনে বিদ্রোহীরা কয়েক শ' অবাঙালি কর্মচারী ও তাদের পরিবারকে হত্যা করে। ২৬ মার্চ দুর্বৃত্তরা একটি মসজিদে নামাজ আদায়রত ৬৫ জন অবাঙালিকে গুলি করে হত্যা করে। আরেকটি মসজিদে দুর্বৃত্তরা প্রায় ৭০ জন অবাঙালি মহিলাকে ধর্ষণ করে। এসব মহিলার স্বামী কিংবা পিতাকে হত্যা করা হয়েছিল। ধর্ষণকারীরা ভারতীয় অনুপ্রবেশকারী হিন্দু বাঙালি ছিল বলে জানা গেছে। ১৯৭১ সালে এপ্রিলের দ্বিতীয় সপ্তাহে বিদ্রোহীরা ৬০ জন অবাঙালি মহিলাকে উলঙ্গ অবস্থায় ঘোরায়। এসব হতভাগ্য মহিলার কয়েকজনকে পশ্চাদপসরণকারী বিদ্রোহীরা ভারতে নিয়ে যায়। ১৯৭১ সালে মার্চ-এপ্রিলের হত্যাকাণ্ড থেকে যেসব ভাগ্যবতী অবাঙালি মহিলা রক্ষা পেয়েছিল, ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পূর্ব রণাঙ্গনে ভারতীয় বাহিনীর বিজয় লাভের পর মুক্তিবাহিনী তাদের হত্যা করে।

(১৬৬) **একশো ছিষট্টিতম সাক্ষীর বিবরণ:** ৩০ বছরের নাফিসা খাতুনের স্বামী মোহাম্মদ জহিরুদ্দিন সান্তাহারে একটি কাপড়ের দোকানের মালিক ছিলেন। বিদ্রোহীরা তাকে হত্যা করে। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর ভারতীয় সেনাবাহিনী ও মুক্তিবাহিনী ঢাকা প্রবেশ করলে নাফিসা খাতুন ও তার সন্তানদের জীবনে আবার দুঃস্বপ্ন নেমে আসে। মোহাম্মদপুরের ত্রাণ শিবিরের অবস্থা ছিল শোচনীয়। নাফিসা ও তার সন্তানদের যে খাদ্য দেয়া হতো তার পরিমাণ ছিল খুবই সামান্য। ১৯৭৪ সালের ২ ফেব্রুয়ারি জাতিসংঘের একটি বিমানে তারা করাচিতে প্রত্যাবাসন করে। সাড়ে তিন বছরের ভীতি ও দুর্ভোগ নাফিসাকে বার্ধক্যে পৌঁছে দেয়। তার চুলে পাক ধরে। পাকিস্তানে পৌঁছতে পেরে তিনি সন্তুষ্ট। নাফিসা মনে করেন, আল্লাহ তার প্রার্থনা মঞ্জুর করেছেন। তিনি তার দুঃখজনক বৈধব্য বরণের ট্রাজেডির বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন:

www.pathagar.com

'সময়টি ছিল ২৫ মার্চের পূর্বাহ্ন। সান্তাহারে বিরাজিত উত্তেজনায় ভীত হয়ে আমার স্বামী কাপড়ের দোকানে যাননি। দোকানটি ছিল শহরের বাণিজ্যিক এলাকার কেন্দ্রস্থলে। আমাদের কাছে খবর আসে যে, বিদ্রোহীরা আমাদের দোকান লুট করেছে। হঠাৎ করে এক ডজন বাঙালি বিদ্রোহী আমাদের বাড়িতে প্রবেশ করে। আমার স্বামী তাদের অনুনয় বিনয় করেন এবং আমাদের সকল নগদ অর্থ ও অলঙ্কার তাদের দিয়ে দিতে বলেন। আমি জোরে চিৎকার দিয়ে উঠি। তাদের কাছে প্রাণভিক্ষা চাই। আমার দুই শিশু সন্তান ভয়ে সাদা হয়ে যায়। তারা একটি টেবিলের নিচে লুকায়। বিদ্রোহীরা আমার স্বামীকে টেনে হিঁচড়ে বাড়ির উঠানে নিয়ে গুলি করে হত্যা করে। আমার মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ে। আমার পৃথিবী অন্ধকার হয়ে আসছিল। আমি তাকে মাটিতে পড়ে যেতে দেখি। তার বুক ও মাথা থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত বের হচ্ছিল। আমি অজ্ঞান হয়ে যাই। জ্ঞান ফিরে এলে দেখি আমার এতিম সন্তানরা তাদের পিতার মৃত্যুতে কান্নাকাটি করছে। তারা তার মৃতদেহ দেখেছিল।...

'বিদ্রোহীরা আমাদের বাড়ি তছনছ করে। সব নগদ অর্থ ও মূল্যবান সামগ্রী উধাও হয়ে যায়। তারা আমার বিয়ের আংটি চুরি করে। গভীর রাতে আমি বিছানার চাদর দিয়ে আমার স্বামীর মৃতদেহ ঢেকে দেই। একজন প্রতিবেশী দাফনের জন্য লাশ গোরস্তানে নিয়ে যায়। পরদিন একজন গ্রাম্য মহিলার পোশাক পরে আমি আমার দু'সন্তান নিয়ে বাড়ি থেকে বের হয়ে যাই। পার্বতীপুরের উদ্দেশে যাত্রা করি। সেখানে আমার স্বামীর কয়েকজন আত্মীয় বাস করতো। আমাদের যাত্রাপথ ছিল কষ্টদায়ক। আমার পায়ে ফোঁসকা পড়ে। তাতে ভীষণ যন্ত্রণা করছিল। আমার সন্তানরা ছিল ক্ষুধার্ত। আমরা রাস্তার পাশে ও নদীতে অসংখ্য লাশ দেখি। আওয়ামী লীগের ভ্রাম্যমাণ ক্যাডাররা ঘোরাফেরা করছিল। তারা ছিল অবাঙালিদের রক্তের নেশায় উন্মাদ। আমরা পার্বতীপুরে পৌঁছি। আমাদের অবস্থা ছিল তখন মরণাপন্ন। ক্ষুধা ও পিপাসায় আমরা ছিলাম অবসন্ন। আমরা আমাদের আত্মীয়-স্বজনকে খুঁজে বের করতে পারছিলাম না। পার্বতীপুরেও অবাঙালি হত্যাকাণ্ড ঘটেছিল। আমরা খবর পাই যে, পাকিস্তানি সৈন্যরা শহরের উপকণ্ঠে প্রবেশ করেছে। এ খবরে আমাদের মনে স্বস্তি ফিরে আসে। আওয়ামী লীগের বিদ্রোহীরা পালিয়ে যায়। পাকিস্তানি সৈন্যরা দু'দিন আমাদের দেখাশোনা করে। পরে আমাদেরকে ঢাকা পাঠিয়ে দেয়া হয়। ঢাকার মোহাম্মদপুর এলাকায় একটি ত্রাণ শিবিরে আমরা বসবাস করতাম।...'

(১৬৭) **একশো সাতষটিতম সাক্ষীর বিবরণঃ** ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ আওয়ামী লীগের একদল দুর্বৃত্ত ১৫ বছরের মোহাম্মদ শাকুরের পিতা মোহাম্মদ শফিককে নির্মমভাবে হত্যা করে। সাক্ষ্যদানের সময় শাকুরের চোখে মুখে ছিল বিগত তিন বছরের ভীতির ছাপ। পাকিস্তান সেনাবাহিনী তাকে একটি গোরস্তান থেকে উদ্ধার করে। গোরস্তানে লুকিয়ে থাকার ভয়াবহ স্মৃতি এবং পিতার নির্মম হত্যাকাণ্ডের ট্রাজেডি বর্ণনা করার সময় তার হাঁটু কাঁপছিল। শাকুর তার সাক্ষ্যে বলেছেঃ

'আমার পিতা সান্তাহারে ট্রাক ড্রাইভার হিসেবে চাকরি করতেন। তিনি চমৎকার বাংলা বলতে পারতেন। আমার পিতা আমাকে একটি স্কুলে ভর্তি করে দেন। আমার স্কুলে শিক্ষার মাধ্যম ছিল বাংলা। বাঙালি প্রতিবেশীদের সঙ্গে আমাদের কোনো ঝগড়া ছিল না। শহরের উপকণ্ঠে ছিল আমাদের বাড়ি। পাশে ছিল একটি গোরস্তান। ২৫ মার্চ

www.pathagar.com

সকালে আমি স্কুলে যাই এবং আমার ক্লাসগুলো শেষ করি। আমার সহপাঠীদের মতো আমি বিশুদ্ধ করে বাংলা বলতে পারলেও তারা আমাকে 'বিহারী' বলতো। দুপুর ২টায় আমি স্কুল ত্যাগ করে বাড়ির উদ্দেশে রওনা দেই। গোরস্তানে পৌঁছে দেখতে পাই যে, বন্দুক ও ছোরা সজ্জিত একদল দুর্বৃত্ত আমাদের মাটির দেয়াল ঘরে হামলা চালাচ্ছে। আমি ভীত হয়ে একটি কবরের দেয়ালের আড়ালে লুকাই। কয়েক মিনিট পর আমি আমার পিতার আর্তচিৎকার শুনতে পাই। আমি দেয়ালের ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে দেখতে পেলাম যে, ঘাতকরা তাকে বাড়ি থেকে টেনে হিঁচড়ে বের করে নিয়ে যাচ্ছে। তার প্রচুর রক্তক্ষরণ হচ্ছিল। তারা তাকে একটি গাছে দড়ি দিয়ে বেঁধে তার বুক ও পেটে ছুরিকাঘাত করে। তিনি ঘটনাস্থলে মারা যান। দুর্বৃত্তরা আমাদের বাড়ি লুট করে। বন্দুকের মুখে তারা আমার মা ও ছোট বোনকে তাদের সঙ্গে নিকটবর্তী একটি গ্রামের দিকে যেতে বাধ্য করে। আমার মা ও ছোট বোনের সঙ্গে এটাই ছিল আমার শেষ দেখা। এক মাস চরম আতঙ্ক ও ভয়ের মধ্যে গোরস্তানে অবস্থান করি। আমি সর্বত্র মৃত্যুর ছায়া দেখতাম। বন্য ফলমূল খেতাম। তৃষ্ণা মেটাতে নিকটবর্তী একটি জলাশয়ের ময়লা পানি পান করতাম। আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি। আমি প্রায়ই বন্দুকের গর্জন এবং বুলেটের হিস হিস শব্দ শোনতাম। এপ্রিলের শেষদিকে পাকিস্তানি সৈন্যরা সান্তাহারে প্রবেশ করে। তারা গোরস্তানে আমার পিতার লাশ দাফন করে আমাকে ঢাকায় পাঠায়। ঢাকার মোহাম্মদপুরে একটি ত্রাণ শিবিরে আমি বাস করতাম। পাকিস্তান সেনাবাহিনী আমার মা ও বোনকে উদ্ধারে গোটা এলাকা তল্লাশি করে। কিন্তু তাদের কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর ভারতীয় সেনাবাহিনী ও মুক্তিবাহিনী ঢাকা দখল করে নিলে আমার কাছে জীবন আবার একটি যন্ত্রণা হয়ে দাঁড়ায়। আমি ছিলাম কপর্দকহীন। আমার কোনো আত্মীয় অথবা বন্ধু ছিল না। আল্লাহ ছিলেন আমার একমাত্র আশার আলো। আমি প্রতি রাতে প্রার্থনা করতাম। ১৯৭৪ সালের জানুয়ারিতে আমি জাতিসংঘের একটি ফ্লাইটে নিরাপদে করাচিতে প্রত্যাবাসন করি।'

(১৬৮) **একশো আটষটিতম সাক্ষীর বিবরণঃ** ১৯৭১ সালে মার্চের শেষ সপ্তাহে বাঙালি বিদ্রোহীরা সান্তাহারে ২৭ বছরের কামরুন্নিসার স্বামী আবদুল মজিদকে হত্যা করে। ১৯৭১ সালের মাঝামাঝি তাকে চট্টগ্রামে স্থানান্তর করা হয়। সেখানে তিনি তার পিতামাতার সঙ্গে বসবাস করতেন। ১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে তাকে করাচিতে প্রত্যাবাসন করা হয়। কামরুন্নিসা তার সাক্ষ্যে বলেছেনঃ

'মার্চের তৃতীয় সপ্তাহে আওয়ামী লীগের কর্মী ও তাদের সমর্থকরা সান্তাহারে তথাকথিত একটি শান্তি কমিটি গঠন করে। শান্তি কমিটির নামে তারা আগ্নেয়াস্ত্র ও অন্যান্য অস্ত্র সমর্পণে অবাঙালিদের প্রতি আহ্বান জানায়। নিরাপত্তা প্রদানে আওয়ামী লীগের আশ্বাসে আস্থা রেখে অবাঙালিরা সব অস্ত্র তাদের কাছে হস্তান্তর করে। ২৫ মার্চ এক বিরাট বিদ্রোহী জনতা আমাদের এলাকা আক্রমণ করে। তারা কয়েকটি বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয় এবং আমাদেরকে ভীতসন্ত্রস্ত করে তোলার জন্য এলোপাতাড়ি গুলি ছুঁড়ে। রাইফেল, ছোরা, বর্শা ও লাঠি সজ্জিত প্রায় ৫০ জন সশস্ত্র লোক আমাদের বাড়িতে প্রবেশ করে এবং আমার স্বামী, আমার তিন দেবর, আমার শ্বশুর এবং আমার কিশোরী ভাগিনীকে হত্যা করে। আমরা আমাদের প্রিয়জনদের জীবন ভিক্ষা দেয়ার জন্য তাদের কাছে অনুরোধ করি। আমি আমার স্বামীর মৃতদেহ জড়িয়ে ধরে বিলাপ করতে থাকি।

www.pathagar.com

নিষ্ঠুর ঘাতকরা রাইফেলের বাট দিয়ে আমাকে আঘাত করে। তাতে আমার হাত প্রায় ভেঙ্গে যায়। তারা আমাকে চুলের মুঠি ধরে টেনে হিঁচড়ে বাড়ির বাইরে নিয়ে যায়। আমার পায়ে ফোঁসকা পড়ে। আমি হাঁটতে পারছিলাম না। এক পর্যায়ে বন্দুকের মুখে তারা আমাকে এবং আরো বহু বিহারী ও পাঞ্জাবী মহিলাকে হাঁটিয়ে রেলওয়ে স্টেশনে নিয়ে যায়। তারা তাদের কাছে আমাদের পরিধেয় অলঙ্কার হস্তান্তরে বাধ্য করে। পাষণ্ডরা বহু মহিলাকে ধর্ষণ করে।...

'এপ্রিলের শেষ সপ্তাহে আমি এবং আরো কয়েকজন মহিলা এসব নিষ্ঠুর ঘাতকের বন্দিশালা থেকে পালিয়ে যাই। আমার পা চলছিল না। তবু আমরা একটি নদীর তীরে ছায়াবহুল এক গুচ্ছ গাছের আড়ালে পৌঁছতে সক্ষম হই। আটককারীরা আমাদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করে। কিন্তু হঠাৎ করে সেখানে একটি দমকা বাতাস বয়ে যাওয়ায় তারা আমাদের খুঁজে বের করতে পারেনি। পরদিন সর্বশক্তিমান আল্লাহ আমাদের দোয়া কবুল করেন। পাকিস্তান সেনাবাহিনী সান্তাহারে প্রবেশ করে। পাকিস্তানি সৈন্যরা আমাদের উদ্ধার করে। তারা আমাদেরকে নওগাঁ নিয়ে যায়। সেখানে আমার ক্ষতস্থানের চিকিৎসা করা হয়। পরে আমাকে ঢাকায় একটি ত্রাণ শিবিরে আশ্রয় দেয়া হয়।

'এখনো আমাকে সেই দুঃস্বপ্ন তাড়া করে ফিরে। আমি দেখতে পাই দুর্বৃত্তরা আমার প্রিয় স্বামীকে হত্যা করছে। আমি দেখতে পাচ্ছি এখনো যেন তারা আমাকে উদ্যত বন্দুক নিয়ে তাড়া করছে।'

(১৬৯) **একশো উনসত্তরতম সাক্ষীর বিবরণ:** ২৬ বছরের আমানুল্লাহ খান সান্তাহারে রেলওয়ে কলোনির ১৯৫ নম্বর কোয়ার্টারে বাস করতেন। ১৯৭১ সালের মার্চে অবাঙালি গণহত্যা সম্পর্কে তিনি তার সাক্ষ্যে বলেছেন:

'২৬ মার্চ সন্ধ্যায় আওয়ামী লীগের একটি বিশাল সশস্ত্র গ্রুপ আমাদের আবাসিক কলোনি আক্রমণ করে। আমাদের কলোনিতে অবাঙালিরা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। কয়েকজন অবাঙালির কাছে অস্ত্র ছিল এবং সারারাত আমরা আক্রমণকারীদের সঙ্গে গুলিবিনিময় করি। পরদিন ভোরে অবাঙালিরা রেলওয়ে স্টেশনে স্থানান্তরিত হয় এবং কয়েকজন বৃদ্ধ পুরুষ, মহিলা ও শিশু রেলওয়ে স্টেশন থেকে ২শ' গজ দূরে একটি মসজিদে আশ্রয় নেয়। আমাদের মধ্যে যাদের অস্ত্র ছিল তাদের কোনো গুলি অবশিষ্ট ছিল না। গুলি নিঃশেষ হয়ে যাওয়ায় আমরা প্রতিরক্ষায় অক্ষম হয়ে পড়ি। পূর্বাহ্নে ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলসের একশো বাঙালি বিদ্রোহী রেলওয়ে স্টেশনে এসে আমাদের কাছ থেকে অস্ত্র কেড়ে নেয়। দুপুরে আমরা খবর পাই যে, বিদ্রোহীরা রাণীপুর থানা লুট করেছে এবং সেখানকার সকল অবাঙালিকে হত্যা করেছে। এ সংবাদ পেয়ে আমরা আতঙ্কিত হয়ে উঠি। ২৭ মার্চ বিকালে আওয়ামী লীগের প্রায় ৭শ' সশস্ত্র ক্যাডার ও বিদ্রোহী সৈন্য রেলওয়ে স্টেশনের নিকটবর্তী মসজিদে হামলা চালিয়ে সেখানে আশ্রয়গ্রহণকারী সকল অবাঙালিকে হত্যা করে। পাকিস্তান সেনাবাহিনী সান্তাহার পুনর্দখল করার পর মসজিদে ৫৩ জন অবাঙালি পুরুষ, মহিলা ও শিশুর লাশ খুঁজে পাওয়া যায়। অবাঙালিদের বাড়িঘর লুট ও অগ্নিসংযোগ করা হয়। জীবিতদের সংখ্যা ছিল কদাচিৎ। আমি রেলওয়ে স্টেশনে একটি স্টোর রুমের জানালার ফাঁক দিয়ে মসজিদে অবাঙালি হত্যাকাণ্ডের নির্মম দৃশ্য প্রত্যক্ষ করি। ভারত পূর্ব পাকিস্তান দখল

www.pathagar.com

করে নিলে আমি নেপালে পালিয়ে যাই। ১৯৭৩ সালের সেপ্টেম্বরে করাচিতে প্রত্যাবাসন করি। আমি বিশ্বাস করি যে, মসজিদে অবাঙালি হত্যাকাণ্ডে জড়িত বিদ্রোহী সৈন্যদের বেশির ভাগ ছিল সশস্ত্র ভারতীয় অনুপ্রবেশকারী।'

(১৭০) **একশো সত্তরতম সাক্ষীর বিবরণ:** ৫৫ বছরের গোলাম রসুল ছিলেন পার্বতীপুরে রেলওয়ের একজন কর্মচারী। সান্তাহারে অবাঙালি হত্যাকাণ্ডের দিন তিনি ডিউটিতে ছিলেন। গোলাম রসুল ১৯৭১ সালের মার্চে পার্বতীপুরে অবাঙালি হত্যাকাণ্ড থেকে বেঁচে যান। কিন্তু ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে মুক্তিবাহিনীর হাতে তার জন্য দুর্ভোগ অপেক্ষা করছিল। ১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে তিনি করাচিতে প্রত্যাবাসন করেন। গোলাম রসুল তার সাক্ষ্যে বলেছেন:

'১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর ভারতীয় বাহিনীর কাছে ঢাকার পতন ঘটার পর মুক্তিবাহিনী সকল প্রাপ্তবয়স্ক অবাঙালি পুরুষকে হত্যা করার জন্য সান্তাহারে তাদের অনুসারীদের নির্দেশ দেয়। ভারতীয় সেনাবাহিনী মুক্তিবাহিনীকে নির্বিচার হত্যাকাণ্ড থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করে। আমি ভারতীয় সৈন্যদের কাছে আত্মসমর্পণকারী পাকিস্তানি সৈন্যদের ভারতের বন্দি শিবিরে নিয়ে যাবার দৃশ্য দেখে মর্ম যাতনা বোধ করি। তখন ছিল শীতকাল। পাকিস্তানি সৈন্যদের খালি পায়ে মার্চ করিয়ে ভারতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। তাদের কারো কারো গায়ে গরম কাপড় ছিল না। কয়েকজন বিহারী নিরাপত্তা বেষ্টনী ভেঙ্গে আমাদের সৈন্যদের পশমী সুয়েটার প্রদান করে। দাতাদের জীবন বিপন্ন হতে পারে এ উপলব্ধি থেকে পাকিস্তানি সৈন্যরা তাদের এ ধরনের কাজ না করার জন্য সতর্ক করে দেয়। আমি একজন পাকিস্তানি সৈন্যকে একটি সুয়েটার দিয়েছিলাম। পরবর্তী মুহূর্তে ৬ জন বাঙালি বিদ্রোহী আমাকে ধরে একটি অন্ধকার কারাগারে নিক্ষেপ করে। সেখানে ছিল লাশ আর লাশ আর মানুষের বিচ্ছিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। মেঝের সর্বত্র ছিল ময়লা আবর্জনা। মুক্তিবাহিনী এ অন্ধকার কারাগারকে বন্দিদের হত্যায় একটি কসাইখানা হিসেবে ব্যবহার করে। এখানে আরো কয়েকজন অবাঙালি বন্দি ছিল। মুক্তিবাহিনীর গার্ড আমাকে থাপ্পর ও লাথি মারে এবং গুলি করার হুমকি দেয়। সন্ধ্যায় একদল ভারতীয় সৈন্য এ কারাগার পরিদর্শনে এসে অবাঙালি বন্দিদের মুক্তি দেয়। সান্তাহারে আমার কোনো বাড়ি অথবা জায়গা না থাকায় আমি বিহারী ও পাকিস্তানপন্থী বাঙালি বন্দিতে পরিপূর্ণ স্থানীয় কারাগারে রাত কাটানোর অনুমতি চাই। পরদিন আমি পার্বতীপুরের উদ্দেশে যাত্রা করি। বিপজ্জনক পথ অতিক্রম করে সেখানে পৌঁছি।'

১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তানে নিম্নোক্ত ১১০টি শহরে আওয়ামী লীগের ক্যাডার ও তাদের সমর্থকরা পশ্চিম পাকিস্তানি, বিহারী, অন্যান্য অবাঙালি ও পাকিস্তানপন্থী বাঙালিদের হত্যা করেছে:

(১) ঢাকা	(২) নারায়ণগঞ্জ	(৩) চট্টগ্রাম
(৪) চন্দ্রঘোনা	(৫) রাঙ্গামাটি	(৬) খুলনা
(৭) দৌলতপুর	(৮) খালিশপুর	(৯) ফুলতলা
(১০) বাগেরহাট	(১১) সাতক্ষীরা	(১২) দিনাজপুর

www.pathagar.com

(১৩) বোচাগঞ্জ (১৪) পীরগঞ্জ (১৫) রানীশংকৈল
(১৬) কাহারুল (১৭) বীরগঞ্জ (১৮) চিরিরবন্দর
(১৯) পার্বতীপুর (২০) ঠাকুরগাঁও (২১) হিলি
(২২) লাকসাম (২৩) রাজবাড়ি (২৪) গোয়ালন্দ
(২৫) ফরিদপুর (২৬) কুষ্টিয়া (২৭) চুয়াডাঙ্গা
(২৮) মেহেরপুর (২৯) জাফরকান্দি (৩০) ঈশ্বরদী
(৩১) পাকসি (৩২) নোয়াখালী (৩৩) টঙ্গিবাড়ি
(৩৪) জয়দেবপুর (৩৫) রূপগঞ্জ (৩৬) কিশোরগঞ্জ
(৩৭) জামালগঞ্জ (৩৮) সিলেট (৩৯) লালবাজার
(৪০) ফেঞ্চুগঞ্জ (৪১) গোপালগঞ্জ (৪২) বালাগঞ্জ
(৪৩) জগন্নাথপুর (৪৪) মৌলভীবাজার (৪৫) ভেড়ামারা
(৪৬) রংপুর (৪৭) নীলফামারি (৪৮) সৈয়দপুর
(৪৯) লালমনিরহাট (৫০) যশোর (৫১) মোবারকগঞ্জ
(৫২) কালিগঞ্জ (৫৩) কোটচাঁদপুর (৫৪) নড়াইল
(৫৫) বজরডাঙ্গা (৫৬) ঝিনাইদহ (৫৭) নোয়াপাড়া
(৫৮) দর্শনা (৫৯) বরিশাল (৬০) পিরোজপুর
(৬১) ঝালকাঠি (৬২) ময়মনসিংহ (৬৩) রাজশাহী
(৬৪) নাটোর (৬৫) সারদা (৬৬) নবাবগঞ্জ
(৬৭) পাবনা (৬৮) সিরাজগঞ্জ (৬৯) নারকেলডাঙ্গা
(৭০) রাইতা (৭১) বদরগঞ্জ (৭২) মহীগঞ্জ
(৭৩) পীরগাছা (৭৪) ধলাই (৭৫) গুজানগর
(৭৬) সাঁথিয়া (৭৭) কিসমত (৭৮) বেড়া
(৭৯) শাহজাদপুর (৮০) কুমিল্লা (৮১) ফেনী
(৮২) বগুড়া (৮৩) নওগাঁ (৮৪) সাস্তাহার
(৮৫) মাইজদী (৮৬) বেগমগঞ্জ (৮৭) চৌমুহনী
(৮৮) হাতিয়া (৮৯) সন্দীপ (৯০) দ. হাতিয়া
(৯১) দ. শাহবাজপুর (৯২) আখাউড়া (৯৩) নরসিংদী
(৯৪) ভৈরব বাজার (৯৫) সরিষাবাড়ি (৯৬) মুন্সীগঞ্জ
(৯৭) চাঁদপুর (৯৮) বৈদ্যের বাজার (৯৯) মতলব
(১০০) পূবাইল (১০১) আনোয়ারা (১০২) ব্রাহ্মণবাড়িয়া
(১০৩) বেগুনবাড়ি (১০৪) হাজীগঞ্জ (১০৫) কেরাণীগঞ্জ
(১০৬) কাউনিয়া (১০৭) দোহাজারী (১০৮) কুমিরা
(১০৯) নাজিরহাট (১১০) গোবিন্দগঞ্জ

www.pathagar.com

শেষ কথা

এ বইয়ে সন্নিবেশিত প্রত্যক্ষদর্শীদের সাক্ষ্য থেকে একথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হচ্ছে যে, ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ গভীর রাতে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর শান্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের অনেক আগে পূর্ব পাকিস্তানে পশ্চিম পাকিস্তানি, বিহারী ও অন্যান্য অবাঙালি হত্যাকাণ্ড শুরু হয়েছিল। এটাও দিবালোকের স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে যে, আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসী বাহিনীই ছিল অবাঙালি গণহত্যার সূচনাকারী ও বাস্তবায়নকারী। ভীতি ও বিভীষিকাময় দু'মাসের কম সময়ে অবাঙালি গণহত্যায় কমপক্ষ ৫ লাখ লোক নিহত হয়। বহু প্রত্যক্ষদর্শী এ অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, কেন্দ্রীয় সরকার বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে যথেষ্ট বিলম্ব করেছে। সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণের প্রাথমিক সাফল্য সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ৩৮ হাজার ৭১৭ জন সৈন্য ও অফিসারের সমন্বয়ে গঠিত ইস্টার্ন কমান্ড মাত্র ৩০দিনে প্রদেশব্যাপী মার্চ-এপ্রিলে আওয়ামী লীগের বিদ্রোহ দমনে সক্ষম হয়।

আওয়ামী লীগের কট্টর ভারতপন্থী নেতৃত্ব ছিল এ বিদ্রোহের মূল পরিকল্পনাকারী। এ আঞ্চলিক দল প্রাথমিকভাবে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের জন্য আন্দোলন করেছিল। কিন্তু পরবর্তীতে দলটি কেন্দ্র থেকে পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশকে বিচ্ছিন্ন করার পথে অগ্রসর হয়। ১৯৭০ সালের ডিসেম্বরে দেশব্যাপী সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জাতীয় পরিষদে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য সংরক্ষিত অধিকাংশ আসন এবং পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদে বিজয়ী হয়। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের চারটি প্রদেশে তারা কোনো আসন পায়নি। নির্বাচনের আগে পূর্ব পাকিস্তানের ভোটারদের সমর্থন লাভে আওয়ামী লীগ একটি একক পাকিস্তানি জাতিসত্তার প্রতি তাদের অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছিল। তাদের নির্বাচনী ইশতেহারে ঘোষণা করা হয়েছিল, 'পাকিস্তান হবে একটি ফেডারেশন এবং এ ফেডারেশনের প্রতিটি ইউনিট পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন ভোগ করবে।' ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তানের কাঠামোর আওতায় স্বায়ত্তশাসনের প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটারের আস্থা নিশ্চিত করার পর আওয়ামী লীগের ক্ষমতাশালী ক্ষুদ্র অংশ বিদ্রোহ এবং ইসলামী প্রজাতন্ত্র পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার পথ বেছে নেয়। তারা জাতিগত সংখ্যালঘু অবাঙালিদের ভয়াবহ রক্তপাত ও ধ্বংসযজ্ঞে মেতে উঠে। পাকিস্তান সেনাবাহিনী আওয়ামী লীগের বিদ্রোহ নস্যাৎ করে দেয়ার পর দলটির অধিকাংশ কট্টর নেতা ও অনুসারী ভারতের নিরাপদ ঘাঁটিতে আশ্রয় নেয় এবং তাদের বিচ্ছিন্নতাবাদী তৎপরতায় ভারতের ব্যাপক সামরিক ও অর্থনৈতিক সহায়তা কামনা করে।

পাকিস্তানকে দ্বিখণ্ডিত করার শতাব্দীর সুবর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে ভারত পূর্বাঞ্চলে প্রায় ৯ মাস দেশটির বিরুদ্ধে যুদ্ধে তাদের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও তাদের অস্ত্রে সজ্জিত বাঙালি বিদ্রোহীদের ব্যবহার করে। পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তানি প্রতিরক্ষাকে দুর্বল করার উদ্দেশ্যে বাঙালি গেরিলাদের কামানের খোরাক হিসেবে ব্যবহার করে সশস্ত্র উপায়ে পূর্ব পাকিস্তান দখল এবং বাংলাদেশ নামে একটি আশ্রিত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় ১৯৭১ সালের ২১ নভেম্বর ভারতীয় ট্যাংক ও সৈন্য সীমান্ত অতিক্রম করে। বিজয়ী ভারতীয় সেনাবাহিনী কলকাতাভিত্তিক প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারকে ১৯৭১ সালের ১৭ ডিসেম্বর ঢাকায় বাংলাদেশের নয়া শাসক হিসেবে অভিষিক্ত করে। ১৯৭২ সালের ৮ জানুয়ারি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলী ভুটো শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তি দেন এবং তাকে

www.pathagar.com

রাওয়ালপিন্ডি থেকে পিআইএ'র একটি বোয়িংয়ে লন্ডন হয়ে ঢাকা পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। ঢাকায় তিনি নয়া বাংলাদেশ রাষ্ট্রের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। দেশে ফিরে যাবার কিছুদিনের মধ্যে শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষণা করেন যে, বিগত ২৫ বছর তিনি পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলকে পৃথক ও স্বাধীন করার জন্য কাজ করছিলেন।

পাকিস্তান সরকার বিলম্বে ১৯৭১ সালের আগস্টে পূর্ব পাকিস্তান সংকটের ওপর একটি শ্বেতপত্র প্রকাশ করে। এ শ্বেতপত্রে ১৯৭১ সালের মার্চ ও এপ্রিলে পূর্ব পাকিস্তানে সংঘটিত ভয়াবহ ঘটনাবলীর সময়ানুক্রমিক বর্ণনা দেয়া হয়। শ্বেতপত্রে বিচ্ছিন্নতাবাদী আওয়ামী লীগ ও তাদের সহযোগী বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণের নিম্নোক্ত যৌক্তিকতা তুলে ধরা হয়:

> 'সশস্ত্র অভ্যুত্থান ঘটিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রজাতন্ত্র গঠনে আওয়ামী লীগের পরিকল্পনা কার্যকর করার কয়েক ঘণ্টা আগে ২৫/২৬ মার্চ রাতে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট সশস্ত্র বাহিনীকে তাদের কর্তব্য পালন এবং পূর্ব পাকিস্তানে সরকারের পূর্ণ কর্তৃত্ব পুনরুদ্ধারে তাদের নির্দেশ দেন।...
>
> 'কেন্দ্রীয় বাহিনী দায়িত্ব গ্রহণ করেছে এবং ভারতের সশস্ত্র অনুপ্রবেশকারীদের সহায়তায় সশস্ত্র উপায়ে পূর্ব পাকিস্তানের ক্ষমতা দখলে আওয়ামী লীগের পরিকল্পনা নস্যাৎ এবং ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস, পুলিশ এবং আধা-সামরিক বাহিনীর বিদ্রোহীদের ধ্বংস করে দিয়েছে।...'

শ্বেতপত্রে পূর্ব পাকিস্তানে সশস্ত্র অভ্যুত্থান অনুষ্ঠানে আওয়ামী লীগের পরিকল্পনার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য অংশ উল্লেখ করা হয়:

> (১) পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ইউনিটগুলোকে আকাশ অথবা সমুদ্র পথে অবতরণে বাধাদানে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈন্যরা ঢাকা ও চট্টগ্রাম দখল করবে।
>
> (২) ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস, পুলিশ ও সশস্ত্র স্বেচ্ছাসেবকদের সহায়তায় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অবশিষ্ট সৈন্যরা বিভিন্ন সেনানিবাস ও সেনা স্টেশনগুলোতে মোতায়েন পাকিস্তানের সশস্ত্র বাহিনীকে নিশ্চিহ্ন করে দেবে।
>
> (৩) ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস সীমান্তের সকল গুরুত্বপূর্ণ চৌকি দখল করবে এবং বাইরে থেকে সহায়তা লাভের জন্য চৌকিগুলো উন্মুক্ত রাখবে।
>
> (৪) ভারত থেকে সরবরাহ লাভের মাধ্যমে অতিরিক্ত অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদের চাহিদা পূরণ করা হবে এবং
>
> (৫) আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী বাহিনী প্রথম পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রগুলো দখল এবং পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে নিষ্ক্রিয় করে দিতে সক্ষম হলে ভারতীয় সৈন্যরা তাদের সহযোগিতায় এগিয়ে আসবে।

পাকিস্তানি সৈন্যদের সাহসী ও পূর্বাহ্নে ব্যবস্থা গ্রহণে শেখ মুজিবুর রহমান এবং তার আওয়ামী লীগের ভারতপন্থী অংশ মার্চে যা অর্জন করতে পারেনি, ১৯৭১ সালে ডিসেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে ভারতীয় পৃষ্ঠপোষকদের সহযোগিতায় তারা তা অর্জন করে। ১৯৬৪ সালের জুনে পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার পরিকল্পনা করা হয়। ঢাকায় তাজউদ্দিন আহমদের বাসভবনে শেখ মুজিবুর রহমান ও তার সহযোগীরা প্রথম এ পরিকল্পনা করেছিলেন। ১৯৬৮ সালে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার চার্জশীটে রাষ্ট্রপক্ষ তা প্রকাশ করেছিল। চার্জশীটে বলা হয়, এ বৈঠকে ষড়যন্ত্রকারীরা স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের নাম বাংলাদেশ ব্যবহার করে এবং

www.pathagar.com

সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, ভারতীয় তহবিল ও অস্ত্রের সহায়তায় পূর্ব পাকিস্তানে বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা হবে। একই বৈঠকে বাংলাদেশের পতাকার ডিজাইন অনুমোদন করা হয়। এ পতাকা শেখ মুজিবুর রহমান আনুষ্ঠানিকভাবে ১৯৭১ সালের ২৩ মার্চ ঢাকায় উত্তোলন করেছিলেন। তাজউদ্দিন ছিলেন ভারতপন্থী। ১৯৭১ সালের এপ্রিলে তাকে ভারতে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছিল। শেখ মুজিবুর রহমানকে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়নি। বিরোধী দলগুলোর রাজনৈতিক চাপের মুখে আইউব সরকার ১৯৬৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে এ মামলার বিচার কার্যক্রম স্থগিত করেছিল। ১৯৭০ সালে নির্বাচনের বছরে ভারত গোপনে আওয়ামী লীগকে অর্থনৈতিক সাহায্য দেয়ায় দলটি স্বাচ্ছন্দ্য ফিরে পায় এবং তাদের সাংগঠনিক ভিত্তি মজবুত হয়।

রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলে আওয়ামী লীগ ফ্যাসিবাদী কলাকৌশল অবলম্বন করে। দলটির নেতৃবৃন্দ ও তাদের অনুসারীরা প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দলগুলোকে ভীতসন্ত্রস্ত করে তুলতে আক্রমণাত্মক পথ বেছে নেয়। পত্র-পত্রিকায় ১৯৭০ সালের নির্বাচনী বছরে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের ওপর আওয়ামী লীগের হামলার বহু সংবাদ প্রকাশিত হয়। ক্ষমতায় গেলে দ্রুত পদোন্নতি দান এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির উদার প্রতিশ্রুতি দিয়ে দলটি পূর্ব পাকিস্তানে আমলাদের একটি অংশের সমর্থন লাভ করে। প্রতিপক্ষ দলগুলোর তহবিল ঘাটতি থাকলেও আওয়ামী লীগের কোনো তহবিল ঘাটতি ছিল না। ভারত উদারহস্তে তাদের তহবিল সমৃদ্ধ করে। যেসব পশ্চিম পাকিস্তানি শিল্পপতির পূর্ব পাকিস্তানে শিল্প কারখানা ছিল তাদের কাছ থেকেও তারা বিপুল অঙ্কের অর্থ পেয়েছিল। সম্ভাব্য শ্রমিক আন্দোলন ঠেকাতে একটি ইন্স্যুরেন্স হিসেবে পশ্চিম পাকিস্তানি শিল্পপতিরা আওয়ামী লীগকে অর্থ সরবরাহ করে। গুণ্ডা প্রকৃতির তরুণদের দলে ভেড়াতে একজন দক্ষ সংগঠক হিসেবে শেখ মুজিবুর রহমানকে বেশি বেগ পেতে হয়নি। এসব মারদাঙ্গা তরুণের অন্যের সভা-সমাবেশ পণ্ড, রাজনৈতিক প্রতিপক্ষদের মারধর এবং রাজনৈতিক মারামারিতে জুড়ি ছিল না। বিরোধী দলের প্রতি আওয়ামী লীগের কোনো শ্রদ্ধা ছিল না। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষদের নির্মূলে দলটির বিবেকে বাধেনি। শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশে দলটির একসময়ের সভানেত্রী আমেনা বেগমকে সংগঠন থেকে বহিষ্কার করার ঘটনা হচ্ছে তাদের নাৎসি স্টাইলের অসংখ্য উদাহরণের একটি। নাৎসি স্টাইলে মুজিব দল পরিচালনা করতেন। দু'দশকব্যাপী দলের সাংগঠনিক কাঠামোতে আওয়ামী লীগ গণতন্ত্রের প্রতি তাদের প্রতিশ্রুতি প্রমাণ করেনি। বিপুল শক্তিপ্রদর্শনে ঢাকায় আওয়ামী লীগ সভা-সমাবেশের আয়োজন করতো। দলের ক্যাডাররা এসব সভা-সমাবেশে শ্রোতাদের সংখ্যা বৃদ্ধিতে শত শত ট্রাক ভাড়া করে এমনকি ট্রেন রিজার্ভ করে গ্রামের লোকদের ঢাকায় নিয়ে আসতো। পশ্চিম পাকিস্তানিরা পূর্ব পাকিস্তানিদের শোষণ করছে, এটাই ছিল শেখ মুজিবুর রহমান ও তার দলের মূল প্রচারণা। ১৯৭০ সালের ১১ মার্চ হাজারীবাগ পার্কে এক জনসমাবেশে তিনি পূর্ব পাকিস্তানের সম্পদ লুণ্ঠনের জন্য পশ্চিম পাকিস্তানকে অভিযুক্ত করেন। অতি জ্বালাময়ী ও উসকানিমূলক ভাষণে তিনি পশ্চিম পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে বাঙালিদের মন বিষিয়ে তোলেন। পশ্চিম পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে ঘৃণা বিদ্বেষ ছড়ানো ছাড়াও আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিটি কার্যকলাপ সম্পর্কে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে ভুল ধারণা দিতেন এবং স্বায়ত্তশাসন বা কার্যত স্বাধীনতা আদায়ে বিকৃত তথ্য

www.pathagar.com

উপস্থাপন করতেন। ১৯৭০ সালের ১২ নভেম্বর পূর্ব পাকিস্তানের উপকূলীয় অঞ্চলে প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড়ের পর আওয়ামী লীগ ও তাদের সমর্থক পত্র-পত্রিকাগুলো প্রদেশে কর্মরত কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ঘূর্ণিদুর্গতদের জন্য প্রদত্ত বিদেশি সাহায্য আত্মসাৎ এবং কেন্দ্রীয় সরকারের উদাসীনতার অসংখ্য মিথ্যা অভিযোগ উত্থাপন করে।

স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে আওয়ামী লীগ ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে অবতীর্ণ হয়। নির্বাচনে জয়লাভের পরই তাদের সুর পাল্টে যায়। স্বায়ত্তশাসনের পরিবর্তে তাদের কণ্ঠে কার্যত বাংলাদেশের স্বাধীনতার দাবি উচ্চারিত হতে থাকে। আওয়ামী লীগের ৬-দফার প্রথম দাবিতে দ্ব্যর্থহীনকণ্ঠে বলা হয়েছিল যে, 'কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকৃতি হবে ফেডারেল ও সংসদীয়।' তার মানে পাকিস্তান হবে একটি ফেডারেশন, কনফেডারেশন নয়। ১৯৭০ সালে নির্বাচনী ভাষণে শেখ মুজিবুর রহমান তার ভোটারদের এই বলে আশ্বস্ত করতেন যে, তিনি কেবলমাত্র প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন চান, পাকিস্তানের ভাঙন চান না অথবা দেশটির ইসলামী চরিত্র বিনষ্ট করতে চান না। ১৯৭০ সালের ২১ সেপ্টেম্বর নারায়ণগঞ্জে এক জনসমাবেশে শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন:

'৬-দফা বাস্তবায়ন করা হবে। তবে একইসঙ্গে পাকিস্তানের সংহতি অথবা ইসলামী চরিত্র বিনষ্ট করা হবে না।'

১৯৭০ সালের ডিসেম্বরে পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী বিজয়ের পর শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণে স্বায়ত্তশাসনের দাবি থেকে তার বিচ্যুতির লক্ষণ স্পষ্ট হয়ে উঠে। তিনি স্পষ্টাক্ষরে ঘোষণা করেন যে, তার ৬-দফা আলোচনাযোগ্য নয়। মনে হচ্ছিল তিনি বাংলাদেশকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠার ধারণা ব্যক্ত করতে শুরু করেছেন। ১৯৭১ সালের শুরুতে তার সংবিধান বিশেষজ্ঞগণ জাতীয় পরিষদে উত্থাপনের জন্য একটি খসড়া সংবিধান প্রণয়ন করে। এ খসড়া সংবিধানে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা এত হ্রাস করা হয় যে, তাতে পাকিস্তান হতো কয়েকটি স্বাধীন রাষ্ট্রের সমন্বয়ে একটি কনফেডারেশন, ফেডারেশন নয়।

খসড়া সংবিধানে দু'টি সুপরিচিত ধারা সংযোজন করা হয়েছিল যা ছিল ফেডারশেনের পরিপন্থী। ধারা দু'টি হলো (১) কেন্দ্রীয় সরকার বৈদেশিক বাণিজ্য ও সহায়তা ছাড়া পররাষ্ট্র বিষয়ক কার্যবিলী পরিচালনা করবে, (২) কেন্দ্রীয় সরকারের সকল রাজস্ব প্রাদেশিক সরকারগুলো সংগ্রহ করবে, কেন্দ্রীয় সরকার নয়। এ ধরনের ধারা ফেডারেল পদ্ধতির ধারণার সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ এবং সত্যিকারভাবে কোনো ফেডারেল রাষ্ট্রের সংবিধানে এ ধরনের ধারার অস্তিত্ব থাকতে পারে না। আওয়ামী লীগ বলেছিল, 'বাংলাদেশ এবং পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য সংবিধান প্রণয়নে গণপরিষদের পৃথক অধিবেশন আহ্বান করতে হবে।' দু'টি পৃথক গণপরিষদের অধিবেশন আহ্বানে আওয়ামী লীগের এ দাবি ছিল নিঃসন্দেহে কেন্দ্র থেকে পর্যায়ক্রমে পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার একটি সাংবিধানিক ফর্মুলা। এ সাংবিধানিক ফর্মুলার আওতায় আওয়ামী লীগ বৈদেশিক বাণিজ্য ও সহায়তায় বৈদেশিক চুক্তি স্বাক্ষর এবং বিদেশে বাণিজ্যিক প্রতিনিধি প্রেরণে বাংলাদেশকে ক্ষমতা দেয়ার দাবি করেছিল। আওয়ামী লীগের এ দাবি ছিল স্বাধীনতা অর্জনের প্রচেষ্টা, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন নয়। আওয়ামী লীগ ও তাদের নেতৃবৃন্দ নিজেদের দাবি থেকে এক ইঞ্চি পিছু না হটায় ১৯৭১ সালে মার্চের তৃতীয় সপ্তাহে ঢাকায় সাংবাধিক আলোচনা ভেঙ্গে যায়।

www.pathagar.com

জেনারেল ইয়াহিয়া খান ১৯৭১ সালের ৩ মার্চ জাতীয় পরিষদের নির্ধারিত অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করেন। তার এ ঘোষণা ছিল একটি সাময়িক পদক্ষেপ মাত্র। জাতীয় পরিষদে খোলাখুলি বাদানুবাদ করার পরিবর্তে প্রস্তাবিত সংবিধানের কাঠামো ও গঠন প্রশ্নে একটি সমঝোতায় উপনীত হতে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে আরো সময় দেয়ার জন্য ইয়াহিয়া খান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করেছিলেন। কিন্তু জাতীয় পরিষদের অধিবেশন সাময়িকভাবে স্থগিত করায় শেখ মুজিবুর রহমান অস্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া দেখান এবং কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে দ্রুত বিদ্রোহের পথ বেছে নেন এবং পূর্ব পাকিস্তানে আইন-গতভাবে প্রতিষ্ঠিত সরকারের কর্তৃত্ব কেড়ে নেন। এটা হচ্ছে এক নির্মম ট্রাজেডি যে, আওয়ামী লীগের উগ্র স্বাদেশিকতা এবং ক্ষমতার লোভে পূর্ব পাকিস্তানের কোটি কোটি নির্দোষ মানুষকে দুর্ভোগের শিকার হতে হয়েছে। উপমহাদেশের ইতিহাসে দুর্ভোগের এ উপাখ্যান নজিরবিহীন।

আওয়ামী লীগের প্রতি ভারতের সমর্থন শক্তি ও সন্ত্রাসের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে পূর্ব পাকিস্তানের ক্ষমতা দখলে শেখ মুজিবুর রহমানকে দুঃসাহসী করে তোলে। ভারতের শাসক গোষ্ঠী কখনো পাকিস্তানকে একটি সার্বভৌম ও পৃথক রাষ্ট্র হিসেবে মেনে নিতে পারেনি। মুসলিমপ্রধান পাকিস্তান ছিল হিন্দুপ্রধান ভারতের জন্য একটি সার্বক্ষণিক চক্ষুশূল। শেখ মুজিবুর রহমান ও তার বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনে ভারতের সর্বাত্মক সমর্থন প্রদানের মূল কারণ ছিল উপমহাদেশ থেকে দ্বিজাতি তত্ত্বের বীজ উপড়ে ফেলা। ভারতের পাবলিক এফেয়ার্স ইন্সটিটিউটের চেয়ারম্যান ও ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের অবসরপ্রাপ্ত উর্ধ্বতন কর্মকর্তা আর. আর. কাপুরের বক্তব্য তার প্রমাণ। ১৯৭১ সালের মাঝামাঝি তিনি মন্তব্য করেছিলেন:

> 'এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, পাকিস্তানের প্রতি আমাদের অবচেতন মনে ঘৃণা হচ্ছে শেখ মুজিবুর রহমানকে আমাদের সমর্থন দানের কারণ। তত্ত্বগতভাবে আমরা অনেক যুক্তি দিতে পারি। তবে রূঢ় বাস্তবতা হচ্ছে যে, আমাদের কাছ থেকে পাকিস্তান ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে এবং দেশটির দ্বিজাতি তত্ত্ব কখনো আমাদের জন্য স্বস্তিদায়ক নয়। কখনো এ তত্ত্বের বিপরীত কোনো ঘটনা ঘটলে তা হবে আমাদের জন্য মনস্তাত্ত্বিকভাবে সন্তুষ্টির একটি বিষয়। বলতে গেলে এটাই হচ্ছে আমাদের মনস্তত্ত্ব এবং সেই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আমরা এমন একটি ঘটনায় প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করছি যা পাকিস্তানকে নস্যাৎ করে দিতে পারে বলে আমরা মনে করি।'

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সামরিক অভিযানের বহু আগে আওয়ামী লীগের ক্যাডারদের সহায়তায় পূর্ব পাকিস্তানে ভারতের অস্ত্র ও গোলাবারুদ এবং সশস্ত্র অনুপ্রবেশকারী পাঠানোর প্রচুর উদাহরণ খুঁজে পাওয়া যায়। ১৯৭১ সালে মার্চের গোড়ার দিকে রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার অজুহাতে ভারত পশ্চিমবঙ্গে এক লাখ সৈন্য মোতায়েন করে। মার্চের মাঝামাঝি আওয়ামী লীগের বিদ্রোহীদের মনোবল চাঙ্গা করতে পশ্চিমবঙ্গে আরো সৈন্য পাঠানো হয় এবং পূর্ব পাকিস্তান সীমান্তে সৈন্য মোতায়েন করা হয়। ১৯৭১ সালে মার্চের শেষদিকে সীমান্ত এলাকায় ৮ ব্যাটালিয়ন ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনী বা বিএসএফ আওয়ামী লীগের বিদ্রোহে সক্রিয় সমর্থন দেয়। ভারতই এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে তাদের সীমান্তবর্তী একটি গ্রামে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার প্রতিষ্ঠার প্রহসন করে। বাংলাদেশ সরকারের কার্যক্রম পরিচালনায় ভারতীয় কর্তৃপক্ষ মুষ্টিমেয় সপক্ষত্যাগীর সহায়তায় কলকাতায় পাকিস্তানের কূটনৈতিক ও কন্স্যুলার মিশন

www.pathagar.com

দখলের কারসাজি করে এবং পূর্ব পাকিস্তান থেকে পলাতক বিচ্ছিন্নতাবাদীদের কাছে তা হস্তান্তর করে।

ভারত ১৯৭১ সালের এপ্রিলে শক্তিপ্রয়োগে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় পূর্ব পাকিস্তান আক্রমণ করতো। কিন্তু ভারতীয় জেনারেলগণ তাদের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে এ ধরনের উদ্যোগ গ্রহণের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলেছিলেন, সে সময় পূর্ব পাকিস্তানে অভিযান চালানো হলে তা হবে বিপর্যয়কর ও অসময়োচিত। তারা শীতকালে পূর্ব পাকিস্তানে ঝটিকা অভিযান পরিচালনা করার পরামর্শ দেন। জেনারেলগণ বলেন, শীতকালে চীনের সঙ্গে পাকিস্তানের যোগাযোগের পথগুলো বরফাচ্ছাদিত থাকবে। তারা পাকিস্তানের সঙ্গে সর্বাত্মক যুদ্ধ এবং ভারতের প্রকৃত হামলা শুরু হওয়ার আগে গেরিলা যুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তানি প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে দুর্বল করার জন্য বাঙালি সপক্ষত্যাগীদের প্রশিক্ষণ দানের জন্য সময় চান। মেজর জেনারেল ডি. কে. পালিতের লেখা 'লাইটনিং ক্যাম্পেইন'-এ বলা হয়েছে যে, ভারতীয় জেনারেলগণ পাকিস্তানের সমর্থনে চীন অথবা আমেরিকার হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা নস্যাৎ করতে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন। আট মাস বেপরোয়া প্রস্তুতি গ্রহণের পর ভারতীয় শাসকগণ পূর্ব পাকিস্তানে ত্বরিত গতিতে হামলা চালাতে তাদের সশস্ত্র বাহিনীকে তৈরি করতে সক্ষম হন। তারা উপমহাদেশের যুদ্ধে চীনা হুমকি মোকাবিলায় ১৯৭১ সালের আগস্টে ২৫ বছর মেয়াদি ইন্দো-সোভিয়েত মৈত্রী চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। ভারতীয়রা শরণার্থী আগমনের সংখ্যা অতিরঞ্জিত করে আমেরিকার জনমতকে বিভ্রান্ত করে এবং পাকিস্তানে আমেরিকার অস্ত্র সরবরাহ বন্ধে দেশটির বিরুদ্ধে মার্কিন জনমতকে প্রভাবিত করে।

ভারত গেরিলা যুদ্ধের জন্য এক লাখ পূর্ব পাকিস্তানি বাঙালি গেরিলাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করে। বিদ্রোহীদের হয়রানিমূলক হামলা, নাশকতা এবং গেরিলা যুদ্ধে পাকিস্তান অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। গেরিলা যুদ্ধ বিরোধী তৎপরতা চালাতে গিয়ে দেশটি দুর্বল হয়ে পড়ে। ভারতে আশ্রিত শরণার্থীদের গ্রহণে পাকিস্তানের উপর্যুপরি প্রস্তাব সত্ত্বেও ভারতীয় শাসকগোষ্ঠী পরিকল্পিতভাবে তাদেরকে পূর্ব পাকিস্তানে ফিরে আসার অনুমতি দেয়নি। কেননা তাতে কৃত্রিম মানবিক সংকটের অজুহাতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছ থেকে কোটি কোটি ডলার সহায়তা লাভ এবং পূর্ব পাকিস্তানে হামলা চালানোর সুযোগ থেকে দেশটি বঞ্চিত হতো।

> মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধে শরণার্থীরা ছিল ভারতের কাছে সবচেয়ে বড় অস্ত্র। মে মাসে শরণার্থীদের সংখ্যা বলা হয়েছিল ১০ লাখ। নভেম্বরে তাদের সংখ্যা ৯০ লাখের বেশি দাবি করে ভারত বিশ্ব জনমতকে বিভ্রান্ত করেছিল এবং বিশ্বের কাছে পাকিস্তানের ভাবমর্যাদা ক্ষুণ্ন করে। পাকিস্তান জাতিসংঘের মতো আন্তর্জাতিক সংস্থার সহায়তায় নিরপেক্ষভাবে ভারতে আশ্রয়গ্রহণকারী শরণার্থীদের সংখ্যা গণনার প্রস্তাব দিয়েছিল। কিন্তু দিল্লি এ প্রস্তাব নাকচ করে দেয়। পাকিস্তান দাবি করেছিল যে, অভ্যন্তরীণ গোলাযোগে ২০ লাখ ২ হাজার লোক পূর্ব পাকিস্তান ত্যাগ করেছে। কিন্তু ভারত এ হিসেব মেনে নেয়নি।

ভারতীয় কর্তৃপক্ষ কলকাতা ও তার আশপাশে সমবেত বিপুল সংখ্যক বেকার বাঙালিকে শরণার্থী শিবিরে যেতে উৎসাহিত করে। বিদেশি প্রতিনিধি ও জাতিসংঘ কর্মকর্তাদের কাছে শরণার্থীদের সংখ্য অতিরঞ্জিত করে দেখানোই ছিল এসব লোককে

www.pathagar.com

শরণার্থী শিবিরে ঠেলে দেয়ার উদ্দেশ্য। ভারত সরকার সত্যি সত্যি শরণার্থীদের বোঝা বহনে অক্ষম হলে পূর্ব পাকিস্তানে দ্রুত তাদের নিজ নিজ বাড়িঘরে ফিরে যেতে পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে এ সমস্যার নিষ্পত্তি করতো। পাকিস্তান সরকার শরণার্থীদের ফিরিয়ে নিতে উদগ্রীব ছিল এবং বিদ্রোহীদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেছিল। ভারত সরকার তখন বিশ্বকে জানিয়েছিল যে, আওয়ামী লীগের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হলে তারা শরণার্থীদের পূর্ব পাকিস্তানে ফেরার অনুমতি দেবে। শরণার্থীদের সংখ্যা ফুলিয়ে ফাপিয়ে প্রচার করে বিদেশি সাহায্য ও সহানুভূতি আকর্ষণে ভারতের গোয়েবলসীয় স্টাইলের প্রচারযন্ত্রের বিবেকে বাধেনি। ভারতের প্রচার মাধ্যম ১৯৭১ সালের মার্চেও একই ধরনের অপপ্রচার চালিয়েছিল। ভারতের জনগণ কয়েক সপ্তাহ পর্যন্ত বিশ্বাস করতো যে, মার্চের শেষ দিনগুলোতে পাকিস্তান ইস্টার্ন কমান্ডের কমান্ডার লে. জেনারেল টিক্কা খান নিহত হয়েছেন।

১৯৭১ সালের শরৎকালে পাক-ভারত সীমান্তে জাতিসংঘ পর্যবেক্ষক নিয়োগে সংস্থার মহাসচিব উথান্টের প্রস্তাবে পাকিস্তান সম্মত হয়েছিল। কিন্তু ভারত সরকার ঘৃণার সঙ্গে এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। জাতিসংঘ পর্যবেক্ষক মোতায়েন করা হলে তারা বাঙালি গেরিলাদের প্রতি ভারতের সামরিক পৃষ্ঠপোষকতা, ভারতে তাদের ঘাঁটি ও ভারতের বৈষয়িক সহায়তা এবং পূর্ব পাকিস্তান আক্রমণে ভারতের সামরিক প্রস্তুতি দেখতে পেতেন। ভারত দাবি করছিল যে, তাদের কাছে শরণার্থীদের পূর্ণাঙ্গ হিসাব ছিল। কিন্তু তাদের এ দাবির ব্যাপারে গুরুতর সন্দেহ দেখা দেয়। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পাকিস্তান সেনাবাহিনী বাঙালি বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ করার পর ভারত পূর্ব পাকিস্তান থেকে পলায়নকারী বিদ্রোহীদের নিরাপদ আশ্রয়দানে তাদের সীমান্ত উন্মুক্ত করে দেয়। ভারতে পলায়নকারী বিদ্রোহীরা আধুনিককালের জঘন্যতম গণহত্যার জন্য দায়ী। পরবর্তীকালে ভারত পূর্ব পাকিস্তানের আরো বাঙালি বিশেষ করে হিন্দুদের সীমান্ত অতিক্রমে উৎসাহিত করে। ১৯৭১ সালের জুনে জাতিসংঘ কর্মকর্তারা শরণার্থীদের সংখ্যা সম্পর্কে ভারতের হিসেবের সত্যতা যাচাই করতে চেয়েছিলেন। ভারতীয় কর্তৃপক্ষ তখন তড়িঘড়ি করে কিছু জাল কাগজপত্র ও তালিকা তৈরি করে। এসব দলিলপত্রের সঙ্গে ভারতের দাবি অসঙ্গতিপূর্ণ হওয়ায় ভারতীয় কর্মকর্তারা বলেন যে, কয়েক মিলিয়ন শরণার্থী ভারতের এখানে সেখানে তাদের আত্মীয়-স্বজন অথবা বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে বসবাস করতে গেছে। ভারতের শাসকগোষ্ঠী শরণার্থী সমস্যাকে আন্তর্জাতিক সহানুভূতি, মনোযোগ এবং সহায়তা লাভ এবং পাকিস্তান ও পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে দোষারোপ করার একটি মোক্ষম সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করে।

১৯৪৭ সালের আগস্টে স্বাধীনতা লাভের প্রাক্কালে ভারত ও পাকিস্তানে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা বেধে যাওয়ায় ৮০ লাখ মুসলমান ভারত থেকে পাকিস্তানে এবং ৬০ লাখ হিন্দু পাকিস্তান থেকে ভারতে অভিবাসন করে। ১ কোটি ৪০ লাখ লোকের উদ্বাস্তু হওয়ার ঘটনা ছিল মানব ইতিহাসে বৃহত্তম। ভারত ও পাকিস্তান বাইরের সহায়তা ছাড়া নিজ নিজ দেশে অভিবাসনকারীদের পুনর্বাসন ও পুনরাঃয় বসবাসের ব্যবস্থা করে। কিন্তু ১৯৭১ সালে তার ব্যতিক্রম ঘটে। ভারত শরণার্থী সমস্যাকে পূর্ব পাকিস্তান গ্রাস ও দখল করার একটি ছুঁতা হিসেবে ব্যবহার করে। ভারত দাবি করেছিল, ৯০ লাখ বাঙালি শরণার্থী ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও ত্রিপুরা রাজ্যে আশ্রয় নিয়েছে। কিন্তু এসব শরণার্থী ১৬ ডিসেম্বর পূর্ব পাকিস্তানের

www.pathagar.com

পতন ঘটার পর কিভাবে এক মাসের কম সময়ে দেশে ফিরে গেল তা মানবীয় ধারণায় বোধগম্য নয়। মাত্র তিন সপ্তাহে মাইন পুঁতে রাখা সীমান্ত, গোলাবর্ষণে বিধ্বস্ত সড়ক ও হাজার হাজার গলিত লাশ এবং অসংখ্য নদ-নদী ডিঙ্গিয়ে ৯০ লাখ শরণার্থীর বাংলাদেশে নিজ নিজ বাড়িঘরে পৌঁছনো মানবীয় সাধ্যের অতীত। কিন্তু ভারত বিশ্ববাসীকে তাও বিশ্বাস করতে বাধ্য করে।

শেখ মুজিবুর রহমান ক্ষমতায় আসার পর প্রায়ই অভিযোগ করতেন যে, ১৯৭১ সালে পাকিস্তান সেনাবাহিনী ৩০ লাখ বাঙালিকে হত্যা করেছে। নিঃসন্দেহে যুদ্ধে উভয়পক্ষে হতাহতের ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু একথা বিশ্বাস করা অসম্ভব যে, মাত্র ৯ মাস সময়ে ভারতের সঙ্গে ১ হাজার ৮শ' মাইল দীর্ঘ বিস্ফোরণোন্মুখ সীমান্তে বিক্ষিপ্তভাবে মোতায়েন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর তিন ডিভিশন সৈন্য সব কাজ বাদ দিয়ে কেবল প্রতিদিন এক হাজার তিন শ' করে বাঙালি হত্যা করছে। ১৯৭২ সালের প্রথম তিন মাসের কোনো এক সময় লস এঞ্জেলেস টাইমসের সাংবাদিক উইলিয়াম জে. ড্রাসন্ড বাংলাদেশ সফর করেন। তিনি শেখ মুজিবুর রহমানের অভিযোগের অসারতা প্রমাণ করেন। শেখ মুজিবুর রহমান একইভাবে অভিযোগ করতেন যে, ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি সৈন্যরা ২ লাখ বাঙালি মহিলাকে ধর্ষণ করেছে। তিনি ধর্ষিতাদের গর্ভপাত ঘটানোর জন্য একটি ব্রিটিশ টিম নিয়োগ করেছিলেন। এ টিম ১৯৭২ সালের গোড়ার দিকে মাত্র শতাধিক মহিলার গর্ভপাত ঘটায়।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

মোহাম্মদ কুতুবউদ্দিন আজিজ বিএ. (অনার্স), এমএ. (মাদ্রাজ) লন্ডনের স্কুল অব ইকনমিকসে ইন্টারন্যাশনাল রিলেশন্সে পড়াশোনা করেছেন। লন্ডনের ফ্লীট স্ট্রীট থেকে সাংবাদিকতায় প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন ইউনাইটেড প্রেস অব পাকিস্তান বা ইউপিপি'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক। ১৯৪৯ সালে তিনি এবং তাঁর পিতা এ বার্তা সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ১৯৫৪ সাল থেকে তিনি আন্তর্জাতিক ও জাতীয় বিষয়ে রেডিও ভাষ্যকার হিসেবে কাজ করেন। ১৯৬৫ সাল থেকে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের দৈনিক ক্রিশ্চিয়ান সায়েন্স মনিটরের পাকিস্তানের বিশেষ প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করেন।

কুতুবউদ্দিন আজিজ হলেন পাকিস্তান নিউজপেপার এডিটরস কাউন্সিলের স্থায়ী কমিটির সদস্য, করাচি সাংবাদিক ইউনিয়নের সাবেক ভাইস-প্রেসিডেন্ট। 'ফরেন পলিসি অব পাকিস্তান: অ্যান এনালাইসিস'-এর সহ-লেখক। এছাড়া তিনি 'মিশন টু ওয়াশিংটন' নামে একটি বইয়ের লেখক। বইটিতে বাংলাদেশ সৃষ্টিতে ভারতের 'বিশেষ' ভূমিকা সবিস্তারে উল্লেখ করা হয়েছে।। এছাড়া বহু পররাষ্ট্র নীতি বিষয়ক প্রবন্ধ ও পুস্তিকা লিখেছেন।

কুতুবউদ্দিন আজিজ ১৫ বছর বয়সে দাক্ষিণাত্যের হায়দ্রাবাদ বুলেটিনে সাপ্তাহিক কলাম লিখতেন। হায়দ্রাবাদ বুলেটিন ছিল ওই রাজ্যের একটি ইংরেজি দৈনিক। হায়দ্রাবাদে তাঁর পিতা আবদুল আজিজ ভারতীয় বার্তা সংস্থা ইউনাইটেড প্রেস অব ইন্ডিয়ার ব্যুরো ম্যানেজার হিসেবে দায়িত্ব পালন করতেন। তাঁর মা ছিলেন হায়দ্রাবাদ রাজ্যের আইন সভার সদস্য। ১৯২৯ সালে ভারতের উত্তর প্রদেশের লক্ষ্ণৌতে তাঁর জন্ম। সেখানে তাঁর দাদা নবাব আবদুল্লাহ খান ছিলেন উর্দু দৈনিক হামদাম-এর মালিক ও সম্পাদক। কুতুবউদ্দিন আজিজ নয়াদিল্লি, সিমলা ও হায়দ্রাবাদে শিক্ষা লাভ করেন। তিনি সেন্ট জর্জ গ্রামার স্কুল স্টুডেন্টস সোসাইটি এবং হায়দ্রাবাদের নিজাম কলেজ ছাত্র ইউনিয়নের সহ-সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

কুতুবউদ্দিন আজিজ ১৯৪৮ সালে লন্ডনে আন্তর্জাতিক যুব সম্মেলনে যোগদান করেন। তিনি প্যারিস ও নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশন, ১৯৫৫ সালে ইন্দোনেশিয়ার বান্দুংয়ে জোট নিরপেক্ষ শীর্ষ সম্মেলন, ইন্দোনেশিয়ার সাধারণ নির্বাচন, ১৯৫৮ সালে লেবাননের গৃহযুদ্ধ, ১৯৬৪ সালে কঙ্গোর গৃহযুদ্ধ, ইন্দোনেশিয়ার ২০তম স্বাধীনতা বার্ষিকী এবং ইসলামী সম্মেলন সংস্থার (ওআইসি) পররাষ্ট্র ও শীর্ষ সম্মেলনসহ বহু আন্তর্জাতিক সম্মেলনের সংবাদ সংগ্রহ করেন। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট হ্যারি এস. ট্রুম্যান, চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই, জাপানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইউশিদা হাতোয়ামা এবং ফিলিপাইনের সাবেক প্রেসিডেন্ট গার্সিয়ার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন। ১৯৫৬ সালে টেলিফোনে সাবেক সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী বুলগানিনের সাক্ষাৎকারও গ্রহণ করেন।

কুতুবউদ্দিন আজিজ সম্পাদক প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসেবে ১৯৫৬ সালে চীন, ১৯৫৭ সালে লিডার এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রামের আওতায় যুক্তরাষ্ট্রসহ ৬০টি দেশ ভ্রমণ করেছেন। তিনি পিএএফ স্টাফ কলেজ, কোয়েটায় আর্মি স্টাফ কলেজ, করাচি বিশ্ববিদ্যালয়, করাচিতে মার্কিন দূতাবাস, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেস ক্লাব এবং আরো বহু দেশে সুধী সমাবেশে বক্তৃতা করেছেন। ১৯৭১ সালের এপ্রিল থেকে নভেম্বর পর্যন্ত ওয়াশিংটনে পাকিস্তান দূতাবাসে সরকারি দায়িত্ব পালন করেন তিনি। পাকিস্তানের জন্য অসামান্য অবদান রাখায় ১৯৭১ সালে তাঁকে পাকিস্তান সরকার তমগা-ই-পাকিস্তান খেতাবে ভূষিত করে। ১৯৭২ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি তিনি ১৯৭১ সালের যুদ্ধে পাকিস্তানের বিপর্যয়ের কারণ অনুসন্ধানে গঠিত ওয়ার এনকোয়্যারি কমিশনে সাক্ষ্য দেন। পাকিস্তান সরকারের সোশাল ওয়েলফেয়ার ন্যাশনাল কাউন্সিল, সিন্ধু সরকারের সাইন্ড সোশাল ওয়েলফেয়ার কাউন্সিলের সদস্য এবং আরো বহু সংস্থায় সমাজ কল্যাণমূলক দায়িত্ব পালন করেন। তিনি সমাজ কল্যাণ বিষয়ক বহু বই, পুস্তিকা ও নিবন্ধ রচনা করেন। ১৯৫৮ সালে করাচি পৌর কর্পোরেশনের নির্বাচিত সদস্য হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন।

মূল্য : ৩০০.০০ টাকা